তাসাওউফ

তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

তাসাওউফ
তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

[দু'টি বইয়ের সমষ্টি]

তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী
উস্তায, দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

(১১-৪৮ পৃঃ)

তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
প্রধান, উচ্চতর উলূমুল হাদীস অনুষদ
মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা
তত্ত্বাবধায়ক, মাসিক আল কাউসার

(৪৯-৩০৪ পৃঃ)

অনুবাদ
মাওলানা মুতীউর রহমান
উস্তায, মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পূর্ব কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى

'তাসাওউফের মূল তত্ত্ব' সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তিকা। তাসাওউফ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে এটি লিখেছেন বিখ্যাত জামিআ দারুল উলূম করাচীর সুযোগ্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী। বন্ধুবর জনাব সরওয়ার হোসাইন মুফতী সাহেবের একনিষ্ট একজন ভক্ত। তাঁরই অনুরোধে মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়ার পক্ষে এটি অনুবাদ করেন উচ্চতর গবেষণামূলক উলূমুল হাদীস বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র (বর্তমানে একই বিভাগের সহযোগী উস্তাদ) স্নেহাস্পদ মাওলানা মুতীউর রহমান।

পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে মারকাযের প্রকাশনা বিভাগ থেকে তা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেহেতু পুস্তিকাটি কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লিখিত তাই তথ্য সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গত কারণেই এটি সংক্ষিপ্ত। তাসাওউফের বহু মৌলিক বিষয়াবলী এতে স্থান পায়নি।

অন্য দিকে তাসাওউফের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সমাজে দু'ধরনের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে স্পষ্ট ভাবে। এক দিকে কেউ কেউ বিষয়টিকে শরীয়তের কোন অঙ্গ হিসেবে মেনে না নিয়ে তা সরাসরি উড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার কতক ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছেন। অর্থাৎ চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা দু'টিই এক্ষেত্রে বিরাজমান যা আদৌ কাম্য হওয়া উচিত নয়। অথচ বাংলা ভাষায় বিষয়টির সঠিক পর্যালোচনা ভিত্তিক মৌলিক গ্রন্থ প্রায় অনুপস্থিত। এশূন্যতাকে অনুভব করেই মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়ার উচ্চতর উলূমুল হাদীস অনুষদের মুশরেফ (প্রধান) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবকে মারকায কর্তৃপক্ষ তাসাওউফ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করার অনুরোধ করে। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব উপমহাদেশ এবং আরব বিশ্বের হাদীস ও ফিক্হের সমকালীন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সাহচর্যে ধন্য, আল্লাহ প্রদত্ত অস্বাভাবিক মেধার অধিকারী। হাদীস, ফিক্হ তথা উলূমে শরীয়ার উপর রয়েছে তার সুপ্রসস্থ বিচরণ। তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ।

এ সকল বিবেচনাতেই তাসাওউফের মত জটিল বিষয়ের একটি **মৌলিক গ্রন্থ লেখার** গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাঁরই হাতে। আল্লাহ তাআলার **রহমতে মাওলানা** তাঁর নামের প্রতি সু–বিচার করেছেন। তাসাওউফ বিষয়ের **একটি অসাধারণ** কিতাব তৈরী করে ফেলেছেন তিনি।

এ কিতাবে রয়েছে চরমপন্থা ও শিথিল পন্থার মোকাবেলায় কুরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে তাসাওউফের সঠিক শরয়ী হাকীকত, পীর সাহেবের জন্যে শর্তাবলী, শরীয়ত ও তরীকতের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক, পীর–মুরীদীর নামে ভণ্ডামী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়াদীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ। আমাদের জানা মতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় এ ধরনের বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্য গ্রন্থ এটিই প্রথম। অতএব আশা করি বইটি পাঠকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, তাসাওউফ বিষয়ের উপরোক্ত দু'টি কিতাবই মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়ার দারুত তাসনীফ–এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এরই মাঝে মাকবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মুহতারাম মাওলানা হাবীবুর রহমান খান কিতাব দু'টি প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। জামিআ ইসলামিয়া তাঁতী বাজার–এর উস্তাযুল হাদীস মাওলানা হাবীবুর রহমান খান একজন বিশিষ্ট লেখক ও রুচিশীল প্রকাশক। তিনি মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়ার একজন অন্যতম হিতাকাংখী। এসকল বিবেচনায় কিতাব দু'টির প্রকাশের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়।

বই দু'টির ভাষাগত দিকের সম্পাদনা করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক। ছাপা ও মুদ্রণ যেন নির্ভুল হয় সে ব্যাপারে সম্ভাব্য প্রযেষ্টা করা হয়েছে নিরলস ভাবে। তথাপি কিছু ভুল–ভ্রান্তি থেকেও যেতে পারে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাআলা কিতাব দু'টির লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকবৃন্দ এবং প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। কিতাব দু'টিকে মুসলমানদের জন্যে হিদায়াতের ওসীলা করুন এবং আমাদের সকলের নাজাতের জরীয়া করুন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ১০/০৮/১৪২১ হি ঃ
০৭/১১/২০০০ ইং

আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
পরিচালক
মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

অনুবাদকের আরজ

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকর আদায় করছি, যিনি অধমকে তাসাওউফ সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কিতাব ঃ (তাসাওউফ কী হাকীকত) 'তাসাওউফের মূলতত্ত্ব', (তাসাওউফ ঃ এক ইলমী জায়েযা) 'তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা' অনুবাদ সম্পাদনের তাওফীক দান করেছেন।

অনুবাদটি মানগত দিক থেকে কতটুকু উন্নত হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল করার আবেদন রইল সম্মানিত পাঠদের প্রতি। কারণ দু'টি কিতাবের লেখকই যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের অন্যতম। পক্ষান্তরে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার সবে হাতে খড়ি।

আশা করি পুস্তক দু'টি সাধারণ পাঠকদের তাসাওউফ সংক্রান্ত পিপাসা নিবারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে এবং এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করবে ইনশাআল্লাহ।

'তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা'–এর গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা যাবে না, তিনি অনুবাদটি অক্ষরে অক্ষরে শোনেছেন, পড়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। তাই আর কিছু না হোক, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, লেখকের ভাব ও উদ্দেশ্য এখানে পুরোপুরি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর উস্তাদে মুহতারামের ওসীলায় অনুবাদটি সম্পাদন করেছেন বেশ

কয়েকজন আকাবির উলামায়ে কেরাম। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার **কারণে** অনুবাদটি এখনও যথাযথ মান লাভ করতে পারেনি হয়ত। যদিও **আমার** পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বই দু'টিতে যা **কিছু ভাল** পাবেন তার সকল কৃতিত্ব লেখক দ্বয়ের, আর কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা নিছক আমারই। কোন স-হৃদয় পাঠক ভুল সম্পর্কে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে আসাতিযায়ে কেরাম, মুরুব্বিয়ানে ই'যাম ও বন্ধু বান্ধবদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তাঁদের নেক দুআ, সুদৃষ্টি ও সর্বাত্মক সহযোগিতা না হলে বই দু'টি আদৌ প্রকাশনার উপযুক্ত হত কি না সন্দেহ।

আল্লাহ তাআলা এ কাজের সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

বিনীত

১২ই শাবান ১৪২১হিঃ
০৯/১১/২০০০ইং

মুতীউর রহমান
মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা

সূচীপত্র
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

শিরকের প্রকারভেদ ঃ

তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

তাসাওউফ, তাসাওউফ সংক্রান্ত শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী,
সিলসিলা, যিকির ও ওযীফা ইত্যাদির হাকীকত
এবং অন্যান্য পরিভাষাসমূহ।

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী
জামিআ দারুল উলূম, করাচী-১৪
পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা মুতীউর রহমান
মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

বক্ষমান পুস্তিকাটি মূলতঃ জামি'আ দারুল উলূম, করাচীর দারুল ইফতায় প্রেরিত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব। আল–হাম্দুলিল্লাহ্, এ জবাবগুলো আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আলেমে দ্বীন, শাইখুল ইসলাম মাওলানা তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম আগ্রহের সাথে দেখেছেন এবং দু'আ করেছেন। সত্যায়নে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। মুহতারামের নির্দেশক্রমে জবাবের কিছু অংশ 'আল–বালাগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে তা সমাদৃত হয়।

যেহেতু অন্যান্য কতিপয় মাসআলার ন্যায় বর্তমানে তাসাওউফের বিষয়টিও চরম বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার। তাই একে পৃথকভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে তাসাওউফের হাকীকত বা মূলতত্ত্ব এবং তা অর্জনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ এক বৈঠকে তা বুঝতে চায়, তাহলে সহজেই যেন তা বুঝতে পারে।

পুস্তিকা প্রকাশের সময় হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দেদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)–এর কতিপয় অতি মূল্যবান বাণী শেষাংশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এ পুস্তিকা প্রকাশকে অধমের জন্যে উপকারী এবং পরকালে মুক্তির যরীয়া বানান! আমীন!! وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

আহ্কার

মাহমূদ আশরাফ

প্রশ্নসমূহ

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ। বর্তমানে আমি **আত্মিক** প্রশান্তি এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে কোন এক সিল্‌সিলার সাথে সম্পৃক্ত **হওয়ার** চিন্তা–ভাবনা করছি। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন অনুভব করছি। আশা করি সঠিক পথ নির্দেশনা দানে বাধিত করবেন।

১. (ক) শরীয়তে তাসাওউফের বিভিন্ন সিল্‌সিলার মান কি?

(খ) তাসাওউফের মোট সিল্‌সিলা কয়টি?

(গ) এ সকল সিল্‌সিলার প্রতিষ্ঠাতা কারা? কখন থেকে এগুলো শুরু হয়?

২. এসব সিল্‌সিলায় যে সকল সুনির্দিষ্ট যিকির তাঁদের নির্ধারিত পন্থায় করানো হয়, তা কি সুন্নাহ ভিত্তিক? নাকি বিদআত?

৩. আত্মশুদ্ধির কোন্ পদ্ধতিটি কুরআন–সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত? কালের পরিবর্তনের কারণে কি আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধন জরুরী?

৪. শরীয়তে বাইআত গ্রহণ করার পদ্ধতি কি? উপস্থিত না হয়েও কি বাইআত হওয়া যায়?

৫. (ক) কোন কোন সিল্‌সিলায় শ্বাসের মাধ্যমে যিকির করানো হয়ে থাকে।

(খ) সেসব পীরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মৃত বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করানোর দাবী করে থাকেন, এ পদ্ধতিটি কেমন? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

৬. আমার কিছু বন্ধু–বান্ধবের ধারণা যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ইসলামিক আর অনৈসলামিক সিল্‌সিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা শুধু তাওয়াজ্জুহ এবং মনের একাগ্রতার গুণ মাত্র। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তরের জন্যে ফেরত খাম পাঠালাম। আশা করি অতি তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

জবাব

মুহ্‌তারাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ!

আপনার মূল্যবান পত্রটি হস্তগত হয়েছে। তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী দেখেছি। এসব প্রশ্নের জবাব বুঝার পূর্বে তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কীয় কয়েকটি মৌলিক বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে প্রথমে তাসাওউফের হাকীকত তথা মূলতত্ত্ব সম্পর্কে একটি ভূমিকা লিখছি। অতঃপর উক্ত প্রশ্নাবলীর পৃথক পৃথক জবাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইখলাসের সাথে বুঝবার ও বুঝাবার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ভূমিকা

প্রথমতঃ আমাদেরকে জানতে হবে যে, পুরো দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্য হল—পূর্ণ মুক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া, অর্থাৎ পরকালে কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করা।[১] দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার অধিক হতে অধিকতর নৈকট্য লাভ করা এবং জান্নাতে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হওয়া।[২]

এজন্যে প্রয়োজন পুরো দ্বীনের উপর আমল করা, দিল-মন দিয়ে প্রাণপণে তা মেনে চলা। পরিপূর্ণ দ্বীনদার হওয়া। শরীয়তের সমস্ত হুকুম মেনে নেওয়া, মানুষের যাহেরের সাথে সম্পর্কিত হোক বা বাতেনের সাথে সম্পর্কিত হোক, শরীয়তের সর্বপ্রকার বিধি বিধানের যথাযথ পাবন্দী করা। এ ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ নাজাত এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের আশা পোষণ করা নিরর্থক।[৩]

---

১. কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে হবে সফলকাম। পার্থিব জীবন তো কেবল ছলনার বস্তু।'
—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

২. কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 'নামায পড় এবং নৈকট্য অর্জন কর।' —সূরা আলাক ঃ ১৯

৩. হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বীনের যেসব হুকুম বা বিধান যাহেরের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো আদেশসূচক হোক, যেমন—নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, হালাল রুযী উপার্জন ইত্যাদি। কিংবা নিষেধসূচক হোক, যেমন—চুরি-ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, মদপান, হারাম উপার্জন ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে 'ইলমে ফিক্‌হ'-এ আলোচনা করা হয়। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা এসব হুকুম প্রমাণিত।

আর দ্বীনের যেসব হুকুম বা বিধান বাতেনের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো আদেশসূচক হোক, যেমন—সবর, শোকর তথা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, তাকওয়া, ইখলাস, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি। কিংবা নিষেধসূচক হোক যেমন—অহংকার, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও লৌকিকতা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আহকাম নিয়ে ইল্‌মে 'তাসাওউফ'-এ বিশদ আলোচনা করা হয়। এ সকল হুকুমও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। এ তাসাওউফকে 'সুলূক' বা 'ফিক্‌হে বাতেন' বলা হয়।

তাসাওউফ ও সুলূকের উদ্দেশ্য

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, নিজের মধ্যে আখলাকে হামীদা বা অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী পয়দা করা। বলা বাহুল্য, আখলাকে হামীদা বা অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা এবং আপন জীবনে তা প্রতিফলিত করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে আখলাকে রযীলা তথা অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি থেকে কলবকে পাক করা এবং এগুলোর চাহিদা মোতাবেক কোনক্রমেই আমল না করার নির্দেশও স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি আখলাকে হামীদা ও আখলাকে রাযীলা তথা অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী ও দোষত্রুটিসমূহ সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করা হল।[১]

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله: رواه الترمذي، و قال : هذا حديث حسن صحيح.

'বুদ্ধিমান সে, যে স্বীয় নফসকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে প্রস্তুতি নেয়। আর নির্বোধ সে, যে খাহেশাতে নফসের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দীর্ঘ আশা পোষণ করে।'—তিরমিযী, ইবনে মাজা—মিশকাত ঃ ৪৫১

১—এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর অধিকাংশই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে অনুবাদকের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কয়েকটি আখলাকে হামীদা ঃ

সবর তথা ধৈর্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল–ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সেসব সবরকারীদের যারা বিপদে পতিত হলে বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত।"—সূরা বাকারা ঃ ১৫৫–১৫৭

ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" –সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له.

"মুমিনের ব্যাপারটি কত আশ্চর্য! তার সকল অবস্থাই মঙ্গলজনক। এই সৌভাগ্যের অধিকারী একমাত্র মুমিনই—সুখে থাকলে কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, এটা তার জন্যে কল্যাণ। দুঃখ–মুসীবতে পড়লে ধৈর্যধারণ করবে, এটাও তার জন্যে মঙ্গল।" —সহীহ মুসলিম ঃ ২/৪১৩, হাদীস ২৯৯৯

শোকর তথা কৃতজ্ঞতা

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরো দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" —সূরা ইবরাহীম ঃ ৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُونِ

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"—সূরা বাকারা ঃ ১৫২

তাকওয়া তথা খোদাভীতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে মাজীদে ইরশাদ করেন ঃ
يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথোচিত ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ
يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" —সূরা আহযাব ঃ ৭০

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

হযরত আবূ যর (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, তাকওয়া তথা খোদাভীতি অবলম্বন কর। (কদাচিৎ) অন্যায় হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক আমল কর, যাতে অন্যায় মিটে যায়। আর মানুষের সঙ্গে সদাচরণ কর'।

—জামে তিরমিযী ঃ ২/১৯, মুসনাদে আহমাদ ঃ ৬/১৯৭

ইখলাস তথা সবকিছু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে পালন করা

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

"তারা আদিষ্ট হয়েছিল একনিষ্ঠ হয়ে এই ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, যেন ইবাদতকে তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট রাখে।"—সূরা বায়্যিনা ঃ ৫

এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

"আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ী বিনিময় পাবে। সুতরাং, যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই বিবেচিত হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে হবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত নিয়ত মোতাবেকই বিবেচিত হবে।" —সহীহ বুখারী ঃ ১/১৩ হাদীস ৫৪, সহীহ মুসলিম ঃ ২/১৪০ হাদীস ১৫৫

আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্টি

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث جعفر بن سليمان. انتهى. وإسناده لا بأس به.

"আল্লাহ তাআলা তোমার ভাগে যা রেখেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সবচাইতে ধনী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। প্রতিবেশীর প্রতি দয়া কর, মুমিন হতে পারবে। নিজের জন্যে যা পছন্দ কর তা অন্যের জন্যেও পছন্দ কর, মুসলমান হতে পারবে। অধিক হেসো না। কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।" —জামে তিরমিযী ঃ ২/৫৬, মুসনাদে আহমাদ ঃ ২/৫৯৭

এ সম্পর্কে মাইমূন ইবনে মিহরান (রহঃ) বলেন ঃ

من لا يرض بالقضاء، فليس لحمقه دواء

"যে আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট নয়, তার নির্বুদ্ধিতার কোন ওষুধ নেই।" —আল মুহাযযাব মিন ইহইয়াই উলূমিদ্দীন ঃ ২/৩৮৫

কয়েকটি আখলাকে রযীলা ঃ

অহংকার

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

"নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"–সূরা নাহল ঃ ২৩

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী ঃ

لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে। এক সাহাবী বললেন, মানুষ তো চায় তার কাপড় সুন্দর হোক, জুতা সুন্দর হোক (তাহলে এটাও কি অহংকার হবে?) তিনি ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তাআলা অতি সুন্দর। তাই তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হল হককে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় করা।"

—সহীহ মুসলিম ঃ ১/৬৫ হাদীস ১৪৭

ক্রোধ

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন।" —সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪

হাদীস শরীফে আছে ঃ

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمني شيئا ولاتكثر علي، لعلي أعيه، قال: لاتغضب، فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لاتغضب. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু শিখিয়ে দিন, যাতে আমি তা মনে রাখতে পারি। তিনি ইরশাদ করেন, 'রাগ করো না। সে বারবার একই কথা বলছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই ইরশাদ করেন, রাগ করো না।"

—জামে তিরমিযী ঃ ২/২২, হাদীস ২০২০, মুসনাদে আহমাদ ঃ ২/৩৬৭

লোভ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"—সূরা ত্বোয়াহা ঃ ১৩১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولايملأ جوف ابن أدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.

"আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদ থাকে, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। একমাত্র মাটিই বনী আদমের পেটকে পূর্ণ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবূল করেন।"—সহীহ বুখারী ঃ ২/৯৫২, সহীহ মুসলিম ঃ হাদীস ১০৪৮, তিরমিযী ঃ ২/৫৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرأ على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

"দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ মেষ পালের জন্যে ততটুকু ক্ষতিকর নয়, যতটুকু মানুষের মাল ও পদমর্যাদার লোভ তার দ্বীনের জন্যে ক্ষতিকর।"

—জামে তিরমিযী ঃ ২/৬২ হাদীস ২৩৭৬

হিংসা

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

"নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, সে বিষয়ের জন্যে মানুষের সাথে তারা হিংসা করে।"—সূরা নিসা ঃ ৫৪

এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إياكم والحسد! فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أو قال: العشب. رواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري بعده، وإسناده صالح لابأس به

"সাবধান! তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা, হিংসা নেক আমল ধ্বংস করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে ভস্মীভূত করে ফেলে।"—সুনানে আবূ দাউদ ঃ ৬৭২ হাদীস ৪৯০৩

রিয়া তথা লৌকিকতা

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর ; যারা রিয়া তথা লোক-দেখানোর জন্যে করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।"—সূরা মাঊন ঃ ৪-৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. رواه أحمد في «مسنده». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ج ١ ص ٢٩٠: رجاله رجال الصحيح. وقال العراقي: رواته ثقات، نقله في «إتحاف السادة المتقين» ج ٨ ص ٢٦٣.

"আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরকের বিষয়টি সব চাইতে বেশী ভয় করি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি জিনিস? তিনি ইরশাদ করেন, রিয়া তথা লৌকিকতা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিয়ে দিবেন, তখন (রিয়াকারীদেরকে সম্বোধন করে) বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্যে নেক আমল করতে, আজ তাদের কাছে যাও। দেখ, তাদের নিকট এর বিনিময় পাও কি না।" —মুসনাদে আহমাদ ঃ ৬/৫৯৬ হাদীস ২৩১১৯

এসব অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী ও দোষসমূহের ব্যাপারে আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। তেমনিভাবে উল্লেখিত অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী ও দোষসমূহ ছাড়াও অনুরূপ আরো অনেক গুণ ও দোষ রয়েছে, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

আলোচনা চলছিল তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এক কথায় তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলাহে বাতেন, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দোষসমূহ থেকে অন্তরকে পূত-পবিত্র করে সৎগুণাবলী দ্বারা তাকে সুসজ্জিত করা। তবে এক্ষেত্রে দু'টি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। নতুবা পদস্খলনের আশংকা রয়েছে।

১. এসব আখলাকের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। যদিও এগুলোর কিছু বাহ্যিক আলামত ও লক্ষণ রয়েছে। তবে কেবলমাত্র এসব বাহ্যিক আলামত ও লক্ষণ দ্বারা অন্তরের বাস্তব অবস্থা সঠিকভাবে জানা যায় না।

যেমন যাহেরী (বাহ্যিক) বিনয় অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বিনয়ের প্রমাণ হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়ে থাকে যে, মানুষ বাহ্যতঃ দেখতে খুব বিনম্র, কিন্তু তার অন্তর অহংকারে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, কখনো মানুষ বাহ্যতঃ স্বীয় মস্তক উঁচু করে রাখে, কিন্তু তার অন্তর থাকে বিনয় ও খোদাভীতিতে ভরপুর, কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তাসাওউফ ও সুলূকের ময়দানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অহংকারী। মানুষ তাকে যতই নম্র মনে করুক না কেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিই বিনয়ী ও নম্র, যদিও মানুষের নযরে বাহ্যতঃ তাকে অহংকারী বলে মনে হয়।

২. ইল্‌মে ফিক্‌হের দৃষ্টিতে যেরূপ নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে শুধু এক ওয়াক্তের নামায পড়ে নেওয়া অথবা একদিনের ফরয রোযা রাখাই যথেষ্ট নয় ; বরং সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদাসহ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া, পাবন্দ থাকা একান্ত কর্তব্য।

অনুরূপ 'ফিক্‌হে বাতেন' তথা তাসাওউফের দৃষ্টিতেও দু'এক নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে দেওয়া বা দু'এক স্থানে ধৈর্যের প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, বরং আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার জন্যে এসমস্ত গুণাবলী অন্তরে বদ্ধমূল করে নেওয়া জরুরী। অর্থাৎ, শোকর তথা কৃতজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রে কথায়, কাজে ও অন্তর দ্বারা কৃতজ্ঞতা আদায় করা জরুরী। এমনিভাবে ধৈর্যের সকল স্থানে যথাযথভাবে ধৈর্যাবলম্বন করা কর্তব্য।

ফিক্‌হের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন কখনো কখনো চুরি করা, মাঝে মধ্যে হারাম উপার্জিত বস্তু ভক্ষণ করা পরিপূর্ণ দ্বীনদারীর পরিপন্থী, তেমনি তাসাওউফের বেলায়ও মাঝে মধ্যে অহমিকা প্রদর্শন করা, কোন কোন ইবাদতে লৌকিকতা করা, কোথাও কোথাও অযথা রাগ করা আত্মশুদ্ধির

অন্তরায়। এজন্যে বলা হয়েছে যে, সৎগুণাবলীকে এমনভাবে হাছিল করতে হবে, যাতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। আর দোষগুলোকে এভাবে পরিত্যাগ করতে হবে, যেন পরিত্যাগ করা তার স্বভাব হয়ে যায়।

এতটুকু হলে তখনই বলা যাবে যে, তার ইসলাহে বাতেন (আত্মশুদ্ধি) হয়েছে ; তাসাওউফের হাকীকত তার নসীব হয়েছে। **এই ইসলাহে বাতেন তথা আত্মশুদ্ধিকেই কুরআনের ভাষায় তায্‌কিয়া বলা হয়।** আর এ তায্‌কিয়াকে আল্লাহ তাআলা সফলতার চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"যে ব্যক্তি নফসকে পবিত্র করেছে সে সফলকাম হয়েছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে যে নফ্‌সকে কলুষিত করেছে।" —সূরা আশ্‌ শামস ঃ ৯

এ তায্‌কিয়াই আখেরী নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ভাষ্য—

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে। যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করেন, তাদের তায্‌কিয়া করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। তারা তো পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" —সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

উক্ত আয়াত (এমনিভাবে সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াত) থেকে সুস্পষ্ট যে, কালামে পাকের তেলাওয়াত এবং কুরআন ও হেকমত শিক্ষার পাশাপাশি তায্‌কিয়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। **আর এ তায্‌কিয়াই তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**

কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন এবং উম্মতের হেদায়াত ও তায্‌কিয়ার (আত্মশুদ্ধির) দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করলেন, তখন এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইল্‌ম ও কিতাব আত্মশুদ্ধির জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং আত্মশুদ্ধির জন্যে জরুরী এমন একজন 'মুযাক্কী' তথা সংশোধনকারীরও, যার তরবিয়ত ও তত্ত্বাবধানে এ দৌলত অর্জন করা যেতে পারে।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের জন্যে মুযাক্কী (সংশোধনকারী)। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পরবর্তী তাবেঈদের জন্যে মুযাক্কী। অতঃপর ক্রমশঃ চলতে থাকে এ ধারাবাহিকতা।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ

"শুধু কিতাব পড়ে কেউ কি পরিপূর্ণ হতে পেরেছে? এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কাঠমিস্ত্রীর সংশ্রব ছাড়া, তার পাশে বসা ব্যতীত কেউ মিস্ত্রী হতে পারে না। এমনকি রান্দা (কাঠ চাছার যন্ত্রবিশেষ) নিজ হাতে উঠালেও নিয়মমাফিক যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম হবে না।

দর্জির নিকট বসা ব্যতীত সুঁই ধরার সঠিক আন্দাজটুকু হয় না। সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গ ছাড়া, তার কলম ধরা এবং লিখন-পদ্ধতি দেখা ব্যতীত, কেউ সুন্দর লেখতে পারে না। মোটকথা, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংশ্রব ব্যতিরেকে কেউ কামেল হতে পারে না।

گرھوائے این سفر داری دلا

دامن رھبر بگیر و پس بیا

بے رفیق هر که شد در راه عشق

عمر بگذشت و نه شد آگاه عشق

"হে মন! যদি এ সফরের আকাংখা পোষণ কর, তবে একজন রাহবর তথা পথপ্রদর্শকের আঁচল আঁকড়ে ধরে পথ চল। কেননা, যে ইশকের রাহে সঙ্গীহীন অবস্থায় পথ চলেছে, তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, তবু সে ইশক ও মহব্বতের ঘ্রাণও পায়নি।" —শরীয়ত ও তাসাওউফ ঃ ১০৬

আত্মশুদ্ধির দু'টি কাজ

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একথা সুপ্রমাণিত যে, আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্যে দু'টি কাজ করতে হয়। (১) মুজাহাদা অর্থাৎ নফস ও কুপ্রবৃত্তির কামনা-চাহিদার বিরোধিতা করা। (২) তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল অর্থাৎ যিকির-আযকার, নফল ও নেক আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা। এ দু'টির প্রথমটি অর্থাৎ, মুজাহাদা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির আসল কাজ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার সহযোগী।

মুজাহাদা

মুজাহাদা[১] শরীয়তে একটি কাম্য বস্তু। কুরআন, সুন্নাহতে এর নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন— وَجَاهِدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ
"তোমরা আল্লাহর জন্যে মুজাহাদা কর, যেভাবে মুজাহাদা করা উচিত।" —সূরা হজ্ব ঃ ৭৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ
"যে মুজাহাদা করে, সে তো নিজের জন্যেই মুজাহাদা করে।"—সূরা আনকাবূত ঃ ৬

আরো ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যারা আমার জন্যে মুজাহাদা করে, আমি তাঁদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।" —সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন—

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه أحمد في «مسنده» برقم ٢٣٤٣٨، وابن حبان في «صحيحه» برقم ٤٨٦٢.

"প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে (সশস্ত্র জিহাদের পাশাপাশি) আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"

—মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ২৩৪৩৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ঃ হাদীস ৪৮৬২

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে মুজাহাদার গুরুত্ব ও উপকারিতার বর্ণনা এসেছে এবং ফরয করা হয়েছে সমস্ত মুসলমানদের জন্যে মুজাহাদা এবং বাদ দেওয়া হয়নি কাউকে এর পরিধি থেকে।

এই মুজাহাদার তত্ত্বকথা এতটুকুই যে, যখন যে ইবাদত করতে অলসতা অনুভব হয়, তখন তার মোকাবেলা করতঃ সে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া এবং মনে গোনাহের যে চাহিদা উদ্রেক হয়, তা দমিয়ে সে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। অভ্যন্তরীণ গুণসমুহের চাহিদা মোতাবেক মনে না চাইলেও যত্নের সাথে আমল করা। আর অভ্যন্তরীণ দোষসমূহের চাহিদা থেকে হিম্মত করে কষ্ট হলেও বিরত থাকা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে শরীয়ত প্রদর্শিত পদ্ধতিতে মেহনত,

---

১. মুজাহাদা সম্পর্কে লেখকের এ আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট থাকায় লেখকের তথ্যপঞ্জি দেখে ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত লেখা হল।—অনুবাদক

চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের উপর অটল-অনড় থাকতে গিয়ে যে কোন বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করা।

উক্ত মুজাহাদার প্রশিক্ষণ এবং তাকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্যে মানুষকে কিছু কাজও করতে হয়। শরীয়ত নিজেই সেগুলোর মৌলিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন ঃ

১. অনর্থক কথাবার্তা (যে জায়েয কথায় না সাওয়াব আছে, না পার্থিব কোন উপকারিতা আছে) কমিয়ে দেওয়া।

২. আরাম ও সুস্থতার প্রতি খেয়াল রেখে পানাহার সীমার ভিতর নিয়ে আসা।

৩. স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে যে পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন তার চাইতে অধিক ঘুম পরিহার করা বা কমিয়ে দেওয়া। এক কথায়, গাফলতের নিদ্রা পরিত্যাগ করা।

৪. মানুষের সাথে বেহুদা ও নিরর্থক সম্পর্ক কমিয়ে দেওয়া।

৫. দিবা-রাত্রির কোন এক সময় বা মাঝে মধ্যে নিজ আমলের মোহাসাবা তথা হিসাব নিকাশ নেওয়া।

৬. তাওবা করার পরও কোন গোনাহ হয়ে গেলে অথবা কোন নেক কাজ ছুটে গেলে নিজের উপর কোন শারীরিক বা আর্থিক জরিমানা ধার্য করা।

৭. হালাল ও জায়েযের সীমালংঘন না করে ভোগ-বিলাস ও শাহানশাহী জিন্দেগী যদিও নাজায়েযের কিছু নয়, তথাপি নফ্সকে নিয়ন্ত্রণে আনার খাতিরে তা বর্জন করা।

৮. অভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্যে নফ্সকে পদদলিত করতে গিয়ে চিকিৎসাস্বরূপ হক্কানী বুযুর্গের বাতানো এমন কোন কাজ আঞ্জাম দেওয়া, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নেক বা অন্ততঃ বৈধ। যেমন ঃ অহংকারের চিকিৎসাস্বরূপ মুসল্লীদের জুতা সোজা করা, গরীব মিসকীনদের শারীরিক খেদমত ও সেবা করা।

মুজাহাদার প্রশিক্ষণ এবং তা অভ্যাসে পরিণত করার জন্যে এই প্রকৃতির যেসব আমল করা হয়, হক্কানী বুযুর্গদের পরিভাষায় এগুলোকেও মুজাহাদা বলা হয়। কেননা, এতেও নফসের মোকাবেলা হয় এবং আসল মুজাহাদা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে তার যথেষ্ট ভূমিকা থাকে।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এ দ্বিতীয় পর্যায়ের মুজাহাদা পরবর্তী সূফিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক উদ্ভাবিত, শরীয়তে এর কোন মূল ও ভিত্তি নেই। **কিন্তু** মূলতঃ ব্যাপারটি এমন নয়, বরং শরীয়তে এ প্রকার মুজাহাদারও মূল

ও উৎস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে, সলফে সালেহীন তথা সাহাবী ও তাবেঈদের ঘটনাবলীতে অধিক পরিমাণে এবং সুস্পষ্টভাবে তার উৎস বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়াত পেশ করছি।

১. হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ তাআলার যিকিরবিহীন অধিক কথাবার্তা বলো না। কেননা, আল্লাহ তাআলার যিকিরবিহীন কথাবার্তা হৃদয়কে কঠিন করে তুলে। আর কঠিন হৃদয়ওয়ালা ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য থেকে সব চাইতে বেশী দূরে।"—জামে তিরমিযী ঃ ২/৬৬ হাদীস ২৪১১

২. অন্য হাদীসে আছে ঃ

ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.رواه الترمذي في «سننه» ج ٢ ص ٦٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

"মানুষ পেটের চাইতে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভরেনি। মেরুদণ্ড সোজা রাখার মত কয়েক লোকমাই বনী আদমের জন্যে যথেষ্ট। একান্ত পূর্ণ করতে হলে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যে, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্রব্যে পূর্ণ করা উচিত। আর অবশিষ্টাংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে রাখা উচিত।" —জামে তিরমিযী ঃ ২/৬৩

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل، فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.

"তোমাদের কেউ ঘুমালে শয়তান তার মাথার পশ্চাদাংশে তিনটি গিট দেয়। প্রতিটি বন্ধনের সময় বলে ঃ রাত অনেক লম্বা, তুমি আরামের সাথে শুয়ে থাক। যখন সে জাগ্রত হয় এবং আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, তখন একটি বাঁধন খুলে যায়। যখন উযূ করে তখন আরেকটি বাঁধ খুলে যায়। নামায পড়লে আরেকটি বাঁধ খুলে যায় এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে সকাল করে। অন্যথায় অলস ও নিরানন্দ হৃদয় নিয়ে জাগ্রত হয়।"

—সহীহ বুখারী ঃ হাদীস ১১৪২, সহীহ মুসলিম ঃ হাদীস ৭৭৬

৪. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ! ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن.

"হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তি কোন্ পথে? তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। ঘরে অধিক সময় অবস্থান কর। স্বীয় গোনাহের ব্যাপারে কাঁদ।"

—জামে তিরমিযী ঃ ২/৬৬

৫. হযরত উমর (রাঃ) বলতেন ঃ

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا.

"তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও। বড় হিসাবের জন্যে প্রস্তুত হও। কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির হিসাব সহজ হবে, যে দুনিয়াতে নিজের হিসাব নিয়েছে।"—জামে তিরমিযী ঃ ২/৭২

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ

المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. «المهذب من إحياء علوم الدين» ٢: ٤٢١

"মুমিন ব্যক্তি স্বীয় নফসের নিয়ন্ত্রনকারী হয় এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে স্বীয় নফসের হিসাব-নিকাশ নেয়। কিয়ামত দিবসে কেবল তাদের হিসাব সহজ হবে, যারা দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব নিয়েছে। আর সেসব

লোকের হিসাব–নিকাশ কঠিন হবে, যারা দুনিয়াকে বিনা হিসাবে বরণ করেছে।"—আল্ মুহাযযাব মিন ইহ্ইয়ায়ে উলূমিদ্দীন ঃ ২/৪২১

৬. হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে বিছানায় আরাম করতেন সেটি ছিল চটের। আমি হুযূরের জন্যে সেটিকে দ্বিগুণ করে দিতাম। তিনি তার উপর বিশ্রাম করতেন। এক রাতে আমি সেটিকে আরো দ্বিগুণ করে মোট চারপাট করে বিছিয়ে দিলাম, যাতে তিনি আরো বেশী প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ রাতে তুমি আমার জন্যে কি বিছিয়েছিলে?' আমি আরয করলাম, 'সে পুরাতন বিছানাটিই। আমি শুধু তাকে চার ভাঁজ করে দিয়ে ছিলাম।' তিনি বলেন, 'ওটিকে পূর্বেকার মত করে দাও। কেননা, সে বিছানার কোমলতা আজ রাতে আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।' —শামায়েলে তিরমিযী ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা প্রসঙ্গ।

৭. একদা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছেন। এতদদৃষ্টে আরয করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহর খলীফা! (আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন) আপনি একি করছেন?' উত্তরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, 'এ যবান আমাকে অনেক মুসীবতে ফেলেছে।'—মুআত্তা ইমাম মালেক—মিশকাত ঃ ৪১৫, দারাকুতনী–তাখরীজু ইহইয়াই উলূমিদ্দীন ঃ ৩/৩৫৫

৮. হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কোন এক বক্তব্যে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠান্তে সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে লোক সকল! আমি সে যুগও দেখেছি, যখন আমি বনী মাখযূমে আমার খালাদের বকরী চরাতাম। তারা এর বিনিময়ে একমুষ্টি খেজুর আর কিসমিস দিত। আমি তা দ্বারাই সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। সে এক করুণ সময় ছিল।'

বক্তব্য শেষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আজ তো আপনি নিজের দোষ ছাড়া আর কিছুই বললেন না।' তিনি বলেন, 'হে ইবনে আউফ! আমি একাকী

ছিলাম, আমার মন আমাকে বলে, তুমি তো আজ আমীরুল মুমিনীন! মুসলমানদের মাঝে তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কে হবে? তাই আমি ইচ্ছা করেছি, স্বীয় নফসকে দলিত করব এবং তাকে শাস্তি প্রদান করব।'—আদ্দীনাওয়ারী—মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল ঃ ৪/৪১৭, হায়াতুস সাহাবা ঃ ৭/৬৫৯

আসল মুজাহাদার প্রশিক্ষণ এবং তাকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্যে এ দ্বিতীয় প্রকার মুজাহাদা করা হয়ে থাকে। এ প্রকার মুজাহাদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের জন্যে উপরোল্লিখিত কয়েকটি বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। সঙ্গে সঙ্গে এ সকল রেওয়ায়াত দ্বারা এ কথাও অনুমিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বদা নিজেদের ব্যাপারে কত সতর্ক থাকতেন! স্বীয় আমল ও কলবের প্রতি কেমন সজাগ দৃষ্টি রাখতেন! মুজাহাদার জন্যে সদা সর্বদা কেমন প্রস্তুত থাকতেন!!!

নফলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন

মুজাহাদার পাশাপাশি নফল ইবাদতসমূহ দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জন করা শরীয়তে কাম্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

"আপনি সিজদা করুন এবং নৈকট্য লাভ করুন।" —সূরা আলাক ঃ ১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشي، أحب إلي من أداء ماافترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سئلني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته.

"যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বান্দা আমার নৈকট্য অর্জনের জন্যে ফরয আদায়ের চাইতে প্রিয় কোন কাজ করেনি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে। (যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকাশ পায় এজন্যে একথা

বলা হয়েছে যে, আমিই যেন তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে না, তার বিধানের খেলাফ হাত-পা চালায় না, বরং যা কিছু করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর হুকুমের আওতায় থেকে করে ; তখন আর তার চোখ, কান, হাত ও পা নিজের রইল কোথায়! কার্যতঃ আল্লাহ তাআলারই হয়ে গেছে।)

যদি সে আমার কাছে চায়, তাহলে তাকে তা দিয়ে দেই ; যদি আমার আশ্রয় কামনা করে, তাহলে আশ্রয় দান করি।" —বুখারী শরীফ ঃ ২/৯৬৩

যাহোক, এতটুকু প্রমাণিত হল যে, কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্যে মৌলিক দু'টি কাজ রয়েছে। এক—মুজাহাদা, দুই—তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল তথা নফলসমূহের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন। তবে আত্মশুদ্ধির জন্যে মুজাহাদাই হল মূল জিনিস। কারণ, যদি মানুষের অন্তরে আত্মগর্ব, অহংকার ও রিয়া ইত্যাদি দোষগুলো থাকে, সততা ও ইখলাস না থাকে, তাহলে নফল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় না, তা দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এজন্যে আবশ্যক হল, সর্বপ্রথম মুজাহাদার[১] মাধ্যমে অন্তরকে প্রবৃত্তি ও অনৈতিকতা থেকে পরিস্কার করা এবং সৎগুণাবলী, যেমন—সততা, ইখলাস ইত্যাদি সৃষ্টি করা, অন্তরে স্থান দেওয়া। যাতে নফল ইবাদত দ্বারা সামান্য হলেও আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্যার্জন করা সম্ভব হয়।

শাইখের প্রয়োজনীয়তা

আত্মশুদ্ধি হাছিলের নিমিত্তে এদু'টি পন্থা (মুজাহাদা ও নফলের মাধ্যমে নৈকট্যার্জন) অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ার জন্যে একজন শাইখ তথা পীর থাকা জরুরী। পবিত্র কুরআন দ্বারাই একথা প্রমাণিত যে, তায্‌কিয়ার জন্যে একজন মুযাক্কী তথা সংশোধনকারী প্রয়োজন। আর বাস্তবের দিকে তাকালেও তা সহজে অনুমেয়। কারণ, মুজাহাদার মাধ্যমে খাহেশাতে নফসানীর (প্রবৃত্তির) বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের প্রবৃত্তি এক রকম হয় না ; একেক ব্যক্তির প্রবৃত্তি একেক ধরণের হয়ে থাকে। এমনকি একই ব্যক্তির মনোবৃত্তি, তার মন, শয়তানের প্রভাব এবং মানুষের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং বয়সের তারতম্যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। অধিকন্তু এ

১—মুজাহাদার ব্যাখ্যা ২৬—২৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

প্রবৃত্তিতে রয়েছে হক-বাতিলের মিশ্রণ। কেননা, মনের চাহিদা কিছু আছে শরীয়ত বিরোধী, আর কিছু আছে শরীয়ত মোয়াফেক।

অপরদিকে শরয়ী মুজাহাদার পাশাপাশি রয়েছে (ভণ্ডপীরদের উদ্ভাবিত) শরীয়ত পরিপন্থী মুজাহাদা যা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। তাই সে সব খাহেশাত তথা ইচ্ছা-অভিলাষ, কামনাসমূহের মাঝে হক-বাতিলের পার্থক্য নিরুপণ করা, অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ অবস্থা মাফিক শরয়ী-সহজ-সরল চিকিৎসা নির্ধারণ করা, এমন এক অভিজ্ঞ শাইখের কাজ, যিনি নিজে এসব ময়দান অতিক্রম করেছেন এবং এ পর্যায়ের চিকিৎসায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এমনিভাবে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য নেককাজের উল্লেখ আছে এবং সেগুলোর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। একজন মুসলমানের পক্ষে সেসব আমল এক সাথে করা সম্ভব নয়। যেমন—নফল নামায, নফল রোযা, দান-খয়রাত, নফল হজ্ব, নফল উমরা, তেলাওয়াতে কুরআন, কিতাব রচনা ও পাঠদান, তালীম-তাবলীগ, জিহাদ, জনসেবা, নির্জনবাস, রোগীর সেবা-শুশ্রুষা, সমবেদনা প্রকাশ, জানাযার সাথে গমন, আযান-ইমামত, হালাল ব্যবসা, কৃষিকাজ, নেতৃত্বদান, বিচারকার্য পরিচালনা, বিবাহ-শাদী, সন্তান পালন, পিতা-মাতার খেদমত, আত্মীয়তা বজায় রাখা, প্রতিবেশীর হক, আতিথেয়তা, আল্লাহ তা'আলার যিকির ইত্যাদি।

এগুলো সবই নেক আমল এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এ সবের ফযীলত কুরআন-হাদীসে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্যে এ সবের অনেকগুলোর উপর এক সাথে আমল করা অসম্ভব। এগুলোর মাঝে প্রাধান্যদানের প্রয়োজন রয়েছে, যা ব্যক্তি বিশেষে তার স্ব স্ব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। একজন বিজ্ঞ দূরদর্শী শাইখ-ই এ প্রাধান্যদানের কাজটি সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারেন।

কেননা, কারো পক্ষে নিজের ব্যাপারে নিজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। যদি কেউ নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েও নেয়, তবুও সেখানে ভ্রান্তির প্রবল আশংকা থাকে। এমনি ভাবে নফসের ধোঁকায় চরমপন্থা বা শিথিলপন্থা অবলম্বনের প্রবল আশংকা থাকে, এটাই নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এ সব কারণেই বিজ্ঞ শাইখের প্রয়োজন, যিনি মুরীদের সাধারণ অবস্থাসমূহ এবং তার শারীরিক, আর্থিক সর্বোপরি আত্মিক উপকারিতার

প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিমাণমত যথা স্থানে নফলের নির্দেশ প্রদান করতে থাকবেন। যেসব অবলম্বনের মাধ্যমে মুরীদ স্বীয় অবস্থা এবং যোগ্যতা মাফিক দিন–দিন আত্মশুদ্ধির পথে উন্নতি লাভ করতে থাকবে।

প্রশ্নোত্তর

ভূমিকার পর পূর্বোক্ত প্রশ্নসমূহের পৃথক পৃথক উত্তর প্রদান করা হল ঃ

প্রশ্ন ঃ ১. (ক) শরীয়তে তাসাওউফের বিভিন্ন সিল্‌সিলার মান কি?

উত্তর ঃ ইসলামী শিক্ষা–দীক্ষার ক্ষেত্রে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনের মূলনীতিসমূহ কুরআন মাজীদে নাযিল করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরই নির্দেশে ওহী মারফত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেসব মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অতঃপর শরীয়তের পক্ষ হতে দ্বীনের তালীম, তাবলীগ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামায়ে কেরামের উপর। আর সাধারণ মানুষকে তাঁদের কাছ থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারেসীন তথা উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে যাঁরা দ্বীনের যে বিদ্যা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতেন, উম্মত সে বিদ্যা ও শাস্ত্রে তাঁদের শরণাপন্ন হত ; তাঁদের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয় জিজ্ঞেস করত। কেরাআত ও তেলাওয়াতের ব্যাপারে আইম্মায়ে কুররা তথা কেরাআতের ইমামদের কাছে, হাদীস শাস্ত্রে আইম্মায়ে মুহাদ্দেসীনের কাছে, ফাতাওয়া ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কাছে, আকাইদ–বিশ্বাস শাস্ত্রে আইম্মায়ে আকাইদের কাছে, তাসাওউফ ও সুলূক শাস্ত্রে আইম্মায়ে সুলূক তথা হক্কানী পীর–মাশায়েখের কাছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তরসূরীদের মধ্য হতে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে কতককে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রসিদ্ধি দান করেছেন। যেমন তেলাওয়াত ও কেরাআত শাস্ত্রে কুররায়ে সাবআ তথা সাত কারীকে, আকাইদ–বিশ্বাস শাস্ত্রে ইমাম ত্বহাবী (রহঃ), ইমাম আবু মনসূর মাতুরীদী (রহঃ) ও ইমাম আবুল হাসান আশআরীকে (রহঃ), ফিক্‌হ ও ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয়—ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রাঃ)কে, যাঁদের নামে আজ ফিক্‌হের মাযহাব সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

এমনিভাবে তাসাওউফ ও সুলূক শাস্ত্রেও চার হক্কানী মাশায়েখ খ্যাতি লাভ করেন এবং তাঁদের নামানুসারে আজ তাসাওউফের সিল্‌সিলা প্রসিদ্ধ।

এই সকল ইমামের মর্যাদা শরীয়তে কতটুকু তা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)—এর নিম্নোক্ত বক্তব্য হতে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন ঃ

فيجب على المسلمين– بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم– موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهتدي بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.

إذ كل أمة–قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم –فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، في أمته والمحيون لما مات من سنته. بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا.

"কুরআন কারীমের ভাষ্যানুযায়ী মুসলমানদের উপর অপরিহার্য যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের পর মুমিনদের সাথে মহব্বত ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। বিশেষতঃ উলামায়ে কেরামের সাথে, যাঁরা নবীগণের ওয়ারিস তথা উত্তরসূরী, আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে বানিয়েছেন নক্ষত্রতুল্য—যাঁদের মাধ্যমে জল ও স্থলের ঘোর অন্ধকারে মানুষ হেদায়াতের আলো লাভ করে। যাঁদের ব্যাপারে মুসলমানরা একমত যে, তাঁরা রয়েছেন জ্ঞান ও হেদায়াতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে সকল উম্মতের মধ্যেই নিকৃষ্ট সম্প্রদায় হত উলামা সম্প্রদায়। একমাত্র মুসলিম জাতিই এর বিপরীত। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন এই উলামায়ে কেরাম। কেননা, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। তাঁর মৃত সুন্নতের জীবনদানকারী। তাঁদের দ্বারা কুরআন কারীম সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কুরআন কারীম দ্বারা তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। কুরআন কারীম তাঁদের কথা বলে এবং তাঁরা কুরআন করীমের কথা বলেন....।"—রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম ঃ ৮

আল্লামা ইবরাহীম বাজুরী (রহঃ)—এর আকাইদ বিষয়ক একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুরীদ শরহু জাওহারাতিত্ তাওহীদ'। তিনি এ গ্রন্থে ইলমে

দ্বীনের বিভিন্ন বিভাগের একাধিক ওয়ারিসীনে রাসূল উলামায়ে উম্মতের নামোল্লেখ করতঃ লিখেন ঃ

والحاصل أن الإمام مالكا ونحوه هداة الأمة في الفروع، والإمام الأشعري ونحوه هداة الأمة في العقائد الدينية، والجنيد ونحوه هداة الأمة في التصوف، فجزاهم الله تعالى خيرا، ونفعنا بهم.

"মোটকথা ইমাম মালেক (রহঃ) ও এ পর্যায়ের উলামায়ে কেরাম ফিক্হ ও ফাতাওয়ার ব্যাপারে হাদিয়ে উম্মত তথা উম্মতের পথপ্রদর্শক, ইমাম আশআরী (রহঃ) ও তদনুরূপগণ দ্বীনের আকাইদ বিষয়ে উম্মতের রাহবর, জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) ও তদনুরূপগণ তাসাওউফ বিষয়ে উম্মতের রাহবর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁদের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করুন।" —তুহ্ফাতুল মুরীদ ঃ ৭৮–৭৯

প্রশ্ন ঃ ১

(খ) তাসাওউফের মোট সিলসিলা কয়টি?

(গ) এ সকল সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা কারা এবং কখন থেকে এগুলো শুরু হয়?

উত্তর ঃ (খ-গ)

তাসাওউফের চারটি সিলসিলা অধিক প্রসিদ্ধ। যথাঃ (ক) কাদেরিয়া—যা হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ ৪৭০—৫৬১হিঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়। (খ) চিশতিয়া—এটি হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ ৫২৭–৬৩৩হিঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। (গ) সোহরাওয়ারদিয়া—হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ ৫৩৯–৬৩২হিঃ)—এর নামানুসারে বলা হয়। (ঘ) নকশাবন্দিয়া—হযরত বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী (রহঃ ৭১৮–৭৯১হিঃ)-এর নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উক্ত সিলসিলা চতুষ্টয়ের শাইখগণের অধিক খ্যাতির কারণ হল আল্লাহ তা'আলা এই চার শাইখের দ্বারা আত্মশুদ্ধির কাজ অধিক পরিমাণে নিয়েছেন। তাঁদের ফয়েয ও বরকত ছিল ব্যাপক। তাঁরা এ আত্মশুদ্ধির ইলমী ও আমলী উভয় ময়দানে বিরাট ভূমিকা রাখেন। তাঁদের এ ত্যাগ–তিতিক্ষার বদৌলতে পরবর্তী শাইখগণ তাঁদের মান–মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেন। নিজেদেরকে তাঁদের দিকে সম্পৃক্ত করার মাঝে স্বীয় ইযযত এবং দ্বীন হেফাযতের উপায় মনে করেন। যদিও এ চারজন ছাড়া আরো বহু ওলী

বুযুর্গ রয়েছেন যাদের মর্যাদা অস্বীকার করার জো নেই। ইলম ও আমলের ময়দানে তাঁদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

এ চার সিলসিলা উপরে গিয়ে তাবেঈ পর্যন্ত পৌছেছে। মাঝখানে মাধ্যম হিসাবে রয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলী–বুযুর্গগণ। তাবেঈদের থেকে সে ধারা পরম্পরা সাহাবীদের সাথে গিয়ে মিলেছে। খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয় উপরের চার সিলসিলা। আর খোলাফায়ে রাশেদীন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্ত মোবারকে বাইআত (ঈমান, জিহাদ ও গোনাহ বর্জনের সংকল্প) গ্রহণ করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নীচের দিকে সেই চার সিলসিলার বিভিন্ন শাখা–প্রশাখা আজো বিদ্যমান আছে। কিন্তু আফসোসের কথা হল, এ চার সিলসিলা এবং তদনুরূপ অন্যান্য হক্কানী বুযুর্গদের সিলসিলার দিকে কতিপয় এমন পীরও নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন (এবং প্রত্যেক যুগেই এমনটি হয়ে থাকে) যারা ইল্ম, আমল, তাকওয়া, শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ ইত্যাদি—কোন গুণের ক্ষেত্রেই বুযুর্গদের পথ ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। এজন্যে কাউকে শুধু কোন হক্কানী সিলসিলার নাম নিতে শুনে ধোঁকা না খাওয়া উচিত, বরং সত্যতার আসল মাপকাঠি—ইলম, আমল, তাকওয়া, ইখলাস, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ–অনুকরণ, এক কথায় শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণের ভিত্তিতে পীর সাহেবের যাচাই হওয়া উচিত। যদি পীর সাহেব সে মাপকাঠিতে টিকলেন তাহলে তিনি আল্লাহর ওলী, তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত। অন্যথায় তিনি শয়তানের ওলী, তার সংশ্রব থেকে বিরত থাকা ফরয।

যাহোক, আমাদের অল্প কিছুকাল আগে সায়্যিদুত্তায়েফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ), কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এবং মুজাদ্দেদে মিল্লাত, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মুরীদদেরকে চারো সিলসিলার বাইআত করাতেন, যাতে তাঁদের অন্তরে সকল ওলীদের প্রতি আদব ও আয্মত–মহব্বত থাকে। ওলীদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টির অনিষ্টতায় নিপতিত না হয়।

প্রশ্ন ঃ ২. এসব সিলসিলায় যে সকল সুনির্দিষ্ট যিকির নির্ধারিত পন্থায় করানো হয়, তা কি সুন্নাহ ভিত্তিক? নাকি বিদআত?

উত্তর ঃ আসল হুকুম হল আল্লাহ তা'আলার যিকির। কুরআন মাজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির কর এবং সকাল–সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" –সূরা আহযাব ঃ ৪২

কুরআন শরীফে জ্ঞানী লোকদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

"এরা ঐ সকল লোক, যাঁরা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তা'আলার যিকির করে এবং চিন্তা–ফিকির করে আসমান–জমিন সৃষ্টির বিষয়ে।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—"আল্লাহ তা'আলার যিকির এত অধিক পরিমাণে কর, যাতে লোকজন তোমাকে পাগল বলে।" —মুসনাদে আহমাদ ঃ ৩/৬৮, মুস্তাদরাকে হাকেম ঃ ১/৬৭৭

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন—

كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন।' —মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী—আল্ জামেউস সগীর (তাইসীরসহ) ঃ ২/২৭৪

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির তথা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা জায়েয। দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, কাত হয়ে বা চিত হয়ে শোয়ে হোক, মাথা উঁচু করে কিংবা মাথা নিচু করে হোক, মাথা স্থির রেখে বা মাথা (একাগ্রতা ও মনযোগ সৃষ্টির জন্যে) ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে হোক, আস্তে আওয়াযে হোক বা বলন্দ আওয়াযে হোক, কালিমা তায়্যিবার যিকির হোক বা তৃতীয় কালিমার যিকির, সুবহানাল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ–এর যিকির হোক, দুরূদ শরীফ হোক বা ইস্তিগফার। এসব যিকির নীরবে হোক বা প্রকাশ্যে, একাকী বা সম্মিলিতভাবে, সব কিছুই জায়েয।

মোটকথা, যিকিরের কোন পদ্ধতিই নাজায়েয নয়। তবে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যাপারে শরীয়তের নিষেধ থাকলে সে কথা ভিন্ন। যেমন যে পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলার যিকিরের অবমাননা ও বেআদবী হয়।

পীর-মাশায়েখ স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুরীদদের জন্যে বিশেষ মুহূর্তে যিকরুল্লাহর কোন নির্দিষ্ট তরীকার কথা বলে থাকেন, যা তার জন্যে অধিক উপকারী হয়ে থাকে। এ সুনির্দিষ্ট তরীকাকে নাজায়েয বলা যাবে না। তবে এটাকে সুন্নাত বলাও ঠিক হবে না। কেননা, এক বিশেষ মুহূর্তে এ সুনির্দিষ্ট তরীকা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়। যদিও কুরআন-হাদীসের কোথাও একে নিষেধ করা হয়নি।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলার যিকির সাওয়াবের কাজ। হক্কানী সূফীদের নিকট তার যতগুলো তরীকা চালু আছে, মূলতঃ সবগুলোই জায়েয। এগুলোকে সুন্নাত মনে করা ভুল[১] এবং ঢালাওভাবে বিদআত বলাও ভুল। তবে যদি কেউ এ সুনির্দিষ্ট তরীকাকে সুন্নাত মনে করে, তাহলে তা সেক্ষেত্রে বিদআতে পরিণত হবে। (কেননা সে এমন একটি তরীকাকে যা শরীয়তে জায়েয মাত্র, তাকে সুন্নাতের মান দিয়েছে)। যেমন কেউ সুনির্দিষ্ট তরীকাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে বলে মনে করল অথবা তাতে অধিক সাওয়াবের কথা ব্যক্ত করল (অথচ তা হুবহু বর্ণিত নয় এবং তাতে অন্য তরীকা অপেক্ষা সাওয়াবও বেশী নয়)।

প্রশ্ন-৩ ঃ আত্মশুদ্ধির কোন্ পদ্ধতিটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত? কালের পরিবর্তনের কারণে কি আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধন জরুরী?[২]

উত্তর ঃ কুরআন-হাদীসে আত্মশুদ্ধির একটি মাত্রই পদ্ধতি রয়েছে। তা হল শরয়ী মুজাহাদা এবং নফলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা। অন্য ভাবে বলা যায়, তাখ্‌লিয়া ও তাহ্‌লিয়া অর্থাৎ অন্তরকে দোষমুক্তকরণ ও সৎগুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ। তার বিস্তারিত বিবরণ ২৫-৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

একথা স্পষ্ট যে, কালের পরিবর্তনের কারণে আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসতে পারে না। কেননা, কুরআন-হাদীসে সরাসরি বিধৃত বিধানাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তবে ইন্তেযামী উমূর তথা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন জিহাদ

---

১. তবে যেসব তরীকা হুবহু স্পষ্টভাবে কুরআন-হাদীসে এসেছে সেগুলো অবশ্যই সুন্নাত।

২. এ প্রশ্নের উত্তরও লেখকের তথ্যপঞ্জি দেখে ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়েছে।

একটি শরীয়তের বিধান। প্রথম যুগে জিহাদের জন্যে তীর–ধনুক, বর্শা–বল্লম ও ঢাল–তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। জিহাদের জন্যে এসব অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাই অপরিহার্য ছিল। কিন্তু আজ আধুনিক যুগে এ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে গেছে। এখন তদস্থলে দরকার রাইফেল, ট্যাংক–কামান, জঙ্গী বিমান, রাসায়নিক ও পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি সমরাস্ত্রের অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং, সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদের বিধান পালনে প্রথমোক্ত অস্ত্রের পরিবর্তে শেষোক্ত অস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তদনুরূপ আত্মশুদ্ধি সংক্রান্ত কুরআন–হাদীসের মৌলিক বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্যে উক্ত প্রকারের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের বিষয়াবলীতে পরিবর্তন সাধন হতে পারে। কিন্তু বিধানাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন–পরিবর্ধন হতে পারে না।

তবে মনে রাখতে হবে যে, এ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পরিবর্তনের জন্যেও শরীয়তের নির্দিষ্ট উসূল ও মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খেয়াল রাখা জরুরী।

এ কাজ আঞ্জামের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এও যে, স্বয়ং মুসলিহীন তথা পীর–মাশায়েখেরও সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে। সাথে সাথে বিদ'আত থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কোন নির্ভরযোগ্য শাইখ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। যাতে ইন্তেযাম তথা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিবর্তনের নামে বিদ'আতে লিপ্ততা এবং সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুতি না ঘটে। কেননা, তাকওয়া ও আধ্যাত্মিক পথের দুধারই কুসংস্কার, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ইত্যাদি কন্টকে পরিপূর্ণ। এসব থেকে নিজকে এবং নিজ মুরীদদেরকে বাঁচানো সহজ ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন ঃ ৪—শরীয়তে বাইআত গ্রহণ করার পদ্ধতি কি? উপস্থিত না হয়েও কি বাইআত হওয়া যায়?

উত্তর ঃ সকল পীর–মাশায়েখ এ বিষয়ে একমত যে, পরিপূর্ণ নাজাতের জন্যে আন্তরিকভাবে খাঁটি তওবা এবং স্বীয় আত্মশুদ্ধি লাভ করা একান্ত জরুরী, যা সৎ ও নেককারদের সোহবত, মহব্বত এবং তাঁদের অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমেই হাছিল হতে পারে। কিন্তু এ জন্যে বাইআত গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, পীর সাহেবের হাতে হাত রেখে তাওবা করতঃ আত্মশুদ্ধির জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার দ্বারা এ কাজ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে এ বাইআতের দ্বারা পীর সাহেবের সুদৃষ্টি ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

এসব দিক লক্ষ্য করে সকল সিলসিলায় এ বাইআত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বাইআত পদ্ধতির বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ শেরওয়ানী (রহঃ) বলেন—

"বাইআত মূলতঃ যাহেরী–বাতেনী সকল আমল ও আহ্কাম আদায়ের গুরুত্ব সৃষ্টি এবং এ সবের প্রতি যত্নবান হওয়ার একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র। একেই তাসাওউফের পরিভাষায় বাইআত বলা হয়। এটি ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ববর্তীদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ ও ইসলামের বাইআত ছাড়াও সাহাবীদের থেকে আহ্কাম ও আমলের প্রতি গুরুত্বদানের জন্যে বাইআত নিয়েছেন। একাধিক হাদীসের আলোকে তা প্রমাণিত।

শাইখ মুরীদের ডান হাত নিজের ডান হাতে নিয়ে বাইআত নেন। মজলিসের লোকজন সংখ্যায় অধিক হলে রুমাল বা অন্য কিছুর দ্বারা বাইআত নেওয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের বাইআত নেওয়া হয় পর্দার আড়াল থেকে, যেখানে তার কোন মাহরাম পুরুষ উপস্থিত থাকবে এবং রুমাল বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বাইআত নেওয়া হবে।

নিয়ম হল শাইখের নিকট উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করা। আর যে ব্যক্তি শাইখের খেদমতে উপস্থিত হতে না পারে, সে পত্রের মাধ্যমে অথবা তার আস্থাভাজন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাইআত গ্রহণ করতে পারে। এ পদ্ধতির বাইআতকে 'বাইআতে উসমানী' বলা হয়। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআতে রিযওয়ানে হযরত উসমান (রাঃ)–এর অনুপস্থিতিতে স্বীয় বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বলেছিলেন—"আমি উসমানের বাইআত নিলাম।"[১] —শরীয়ত ও তাসাওউফ পৃঃ ১০০

প্রশ্ন ঃ ৫. (ক) কোন কোন সিল্‌সিলায় শ্বাসের মাধ্যমে যিকির করানো হয়ে থাকে, এ পদ্ধতিটি কেমন ?

(খ) সে সব পীরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মৃত বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করানোর দাবী করে থাকেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ (ক) এ তরীকাকে 'পাসে–আনফাস' বলা হয়। যদি এ তরীকাকে সুন্নাত মনে না করা হয়, অধিক পুণ্যের তরীকা মনে না করা হয় এবং যারা

১ বাইআত সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা–৭৫–৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

এ তরীকায় আমল করে না, তাদের নিন্দা না করা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, এ পথের কতিপয় মুরীদ এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। কখনো এমন হয় যে, তার শাইখ এ নির্দিষ্ট পদ্ধতি তার জন্যে উপকারী মনে করে নির্ধারণ করে দেন। আর সে এ বিশেষ পদ্ধতিকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করে বসে। আবার অন্যকে এর দিকে দাওয়াতও দেয়। যে আল্লাহর বান্দা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ না করে, যিকিরের ভিন্ন কোন (জায়েয বা মাসনূন) তরীকা অবলম্বন করে, তাকে বঞ্চিত মনে করে এবং তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।

মাঝে মধ্যে তাদের বাড়াবাড়ি আরো বৃদ্ধি পায়। সে নির্দিষ্ট এ তরীকাকেই (সহীহ ইলম না থাকার দরুন) সুন্নাত মনে করে বসে। সে মোতাবেক যারা আমল করে না, তাদের কুৎসা রটায়, তিরস্কার করে। তাদের এ ধরনের কার্যকলাপ বিদআতের শামিল। এসব ক্ষেত্রে উক্ত তরীকা বর্জন করা জরুরী।

এজন্যে আজকালকার অভিজ্ঞ শাইখগণ জনসাধারণ ও স্বল্পজ্ঞানী পীরদের এ কাণ্ডলীলা দেখে এ তরীকার ব্যাপক প্রচারে উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং প্রয়োজনের তাগিদে খাছ ব্যক্তি পর্যন্ত সীমিত রাখতে বলেন।

(খ) কাশ্‌ফ বা স্বপ্নে তাঁদের রূহের সাথে সাক্ষাৎ করানো সম্ভব। তবে এ মোলাকাত ও যিয়ারত তরীকার মূল উদ্দেশ্য নয় এবং এটি মুজাহাদার অন্তর্ভুক্তও নয়।[১]

প্রশ্ন ঃ ৬. আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের ধারণা হল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ইসলামিক আর অনৈসলামিক সিলসিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা শুধু তাওয়াজ্জুহ ও মনের একাগ্রতার গুণ মাত্র। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হল, তা সবই ছিল ঐ তাসাওউফ সম্পর্কিত যা ইসলামে কাম্য। আর তার উদ্দেশ্য হল অন্তরের পবিত্রতা লাভ করা, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। তার প্রধান কাজ দু'টি—মুজাহাদা ও তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল, যা পিছনে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফীক দিন!

---

১ কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বইয়ের ১৪২-১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

কতক লোক সন্ন্যাসী, যোগী ও বৌদ্ধদের অবস্থা দৃষ্টে সংশয়ে ভোগে। ভাবে এরাও তো মুজাহাদা, চেষ্টা–সাধনা করে থাকে। বাহ্যতঃ তারাও আত্মিক পূর্ণতা অর্জন করে। তাহলে তো ইসলাম ও অনৈসলামের মাঝে কোন পার্থক্য রইল না।

স্মর্তব্য যে, শরীর ও রূহ, এ দু'য়ের সমন্বয়েই মানুষ। তন্মধ্যে রূহ হল আসল ও শাসক। আর শরীর হল তার শাসিত ও অনুগামী।

শরীরের যত বেশী যত্ন নেওয়া হবে, শরীর ততই মযবূত, শক্তিশালী ও উদ্যমী হবে। এতে কাফের, মুমিন হওয়ায় কোন পার্থক্য হবে না। যদিও মুমিন যাবে জান্নাতে আর কাফের যাবে জাহান্নামে। আর রূহকে যত উন্নতি দান করা হবে, রূহও ততই মযবূত, শক্তিশালী কর্মোদ্যমী ও কার্যকরী হবে। কাফেরের রূহ হোক আর মুমিনের রূহ তাতে কোন তফাৎ হবে না। যোগী, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধসহ অন্যান্যরা যখন স্বীয় অনৈসলামিক পদ্ধতিতে সাধনা করে, তখন তাদের রূহও মযবূত, শক্তিশালী ও কর্মোৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে তাদের অন্তরের পবিত্রতা নসীব হয় না। আর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের তো প্রশ্নই উঠে না।

পক্ষান্তরে একজন মুমিন ব্যক্তি যখন শরীয়ত অনুযায়ী মুজাহাদা করতে থাকে, তখন তাঁর রূহও মযবূত, শক্তিশালী, কর্মোৎসাহী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সাথে সাথে আত্মশুদ্ধি এবং অন্তরের পবিত্রতা লাভ হয়। সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এটাই মুমিনের মূল উদ্দেশ্য। (বলা বাহুল্য, সাধনার মাধ্যমে শুধু রূহকে শক্তিশালী করা–শরীয়তে তার কোন মূল্য নেই। ইসলামের নির্দেশ হল, শরয়ী তরীকায় মুজাহাদা করতঃ অন্তর পবিত্র করা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভে ধন্য হওয়া। এটাই ইসলামিক ও অনৈসলামিক তরীকার পার্থক্য)।

তার একটি সহজ উদাহরণ, যেমন একটি অপবিত্র আয়না, যার উপর ধূলোবালি, ময়লা–আবর্জনা জমে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। এটিকে পাক–পবিত্র পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করলে আয়নাটি ঝকঝকে হবে এবং পাক–পবিত্রও হবে।

আর যদি সে আয়নাটিকে পেশাব দ্বারা ধোয়া হয় তাহলে চকচকে উজ্জ্বল হবে ঠিক, কিন্তু পাক–পবিত্র হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সে ঝকঝকে আয়নাটি নাপাক এবং দুর্গন্ধযুক্তই থেকে যাবে। তার জন্যে পাক পানি ব্যবহার করা অপরিহার্য।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। নতুবা তাসাওউফ ও সুলূকের সম্পর্ক মূলতঃ আমলের সাথে, শুধু কিতাবের সাথে নয়। শুধু যাহেরী কোন আমলের সাথে নয়, বরং তার মূল সম্পর্ক মুমিনের অন্তরের বাতেনী আমলের সঙ্গে। বাতেনী আমল শুধু কিতাব থেকে হাছিল করা যায় না। কোন বিজ্ঞ হক্কানী পীর ও ওলীর তত্ত্বাবধানে থেকে অর্জন করতে হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের যাহের ও বাতেন উভয়টিকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বানানোর তাওফীক দিন। আমাদের সবাইকে আত্মশুদ্ধির দৌলত নসীব করুন। স্বীয় করুণায় দুনিয়া ও আখেরাতে সহজে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিদানে ধন্য করুন। আমীন!

তথ্যপঞ্জি

কুরআন কারীম, তাফসীর ও হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ছাড়াও এ লেখায় নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যদিও এ লেখায় সূত্র হিসাবে এগুলোর উল্লেখ নেই।

১। তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন—হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ)

২। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন—হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)

৩। আত্তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৪। হাকীকতে তাসাওউফ ও তাকওয়া—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৫। শরীয়ত ও তরীকত—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৬। তরবিয়াতুস্ সালেক—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৭। বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত—হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ)

৮। তাজদীদে তাসাওউফ ও সুলূক—হযরত মাওলানা আবদুল বারী নদভী (রহঃ)

৯। শরীয়ত ও তাসাওউফ—হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ শিরওয়ানী (রহঃ)

১০। আমার প্রতি হযরত হাজী মুহাম্মাদ শরীফ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ সাহেব (রহঃ) কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী।

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দেদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর

তাসাওউফ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রজ্ঞাপূর্ণ মূল্যবান বাণী

(মাআসিরে হাকীমুল উম্মত (রাঃ) থেকে সংকলিত)

১. এক মুরীদ লিখেছেন—'বুযুর্গদের নিকট থেকে হাছিল করার জিনিস কোন্‌টি এবং তার নিয়ম কি?'

হযরত থানভী (রহঃ) উত্তরে লিখেন—"পালনীয় আমলের কিছু আছে যাহেরী (বাহ্যিক); আর কিছু আছে বাতেনী (অভ্যন্তরীণ)। উভয় প্রকারের মাঝে কিছু ইল্‌মী ও আমলী ভুলত্রুটি হয়ে থাকে। শাইখগণ মুরীদের অবস্থা ও প্রতিকূলতার বিবরণ শুনে সব কিছুর প্রতি নযর রেখে উপযোগী প্রতিকার বলে দেন। সে মোতাবেক আমল করা মুরীদের কাজ। এ পথের সহায়ক স্বরূপ কিছু যিকিরও বলে দেন। এ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য ও তরীকা উভয়ই **জানা গেল।**" —পৃষ্ঠা ১৫৫

২. এক মুরীদকে লিখেছেন—"সুলূকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো (আলহামদু লিল্লাহ্) জানা আছে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি। এখন বাকী **আছে দু'টি** জিনিস—তরীকার ইলম এবং সে মোতাবেক আমল। **তরীকা একটিই**—যাহেরী ও বাতেনী হুকুমসমূহ যথাযথভাবে পালন করা।

এ পথের সহায়ক দু'টি জিনিস ঃ (ক) যিকির, যথাসম্ভব সব সময় যিকির করতে থাকা।

(খ) যত অধিক সম্ভব আল্লাহ্ ওয়ালাদের সংশ্রব অবলম্বন করা। যদি অধিক সংশ্রব অবলম্বন করা সম্ভব না হয়ে উঠে, তবে এর বিকল্প হল—বুযুর্গদের জীবন-চরিত, তাঁদের লেখা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াশুনা করা।

আর দু'টি জিনিস এ তরীকার উদ্দেশ্যের প্রধান প্রতিবন্ধক—(১) গোনাহ্, (২) অনর্থক কার্যকলাপ।

যিকির, সোহবত (সংশ্রব) ইত্যাদি উপকারী হওয়ার জন্যে একটি মাত্র শর্ত, তা হল নিজের অবস্থাদি শাইখকে অবহিত করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। এর পর জরুরী হল নিজের যোগ্যতা। স্বীয় যোগ্যতা ভেদে উদ্দেশ্য হাছিলে কম বেশী বিলম্ব হয়ে থাকে। আমি সব কিছুই লিখে দিয়েছি।" —পৃষ্ঠা ১৫৬

(৩) তিনি বলেন, "আমার মাধ্যমে যারা সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং আমার সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাঁদের জন্যে ওযীফা, আওরাদ, যিকির শোগলের ব্যাপারে ততটুকু গুরুত্ব দেই না, যতটুকু আখলাক-চরিত্র সংশোধনের গুরুত্ব দিয়ে থাকি। চরিত্র সংশোধন করা খুবই জরুরী। তাই আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বেশী তাকিদ করা হয়ে থাকে। এ যুগে অধিকাংশ মানুষ আখলাক-চরিত্র ঠিক করার ব্যাপারে যত্নবান হয় না। কিন্তু ওযীফা আদায়ে খুব পাবন্দ হয়।" —পৃষ্ঠা ১৪৯

(৪) একবার হযরত থানভী (রহঃ) তাসাওউফের সকল স্তর ও পর্যায়ের আলোচনা করেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং এ পথের পথিকের বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। সবশেষে বলেন—"সব কিছুর সারকথা হল, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথ আদায় করা; আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হুকুমসমূহ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া। হককুল ইবাদ তথা বান্দার হকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তাসাওউফের মাধ্যমে এতটুকু হাছিল হলে সবই হল, নতুবা কিছুই হল না।" —পৃষ্ঠা ১২৯

(৫) এক মুরীদ এমন ওযীফা বা তরীকা জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিল, যদ্দ্বারা ইবাদতে প্রভূত উন্নতি এবং গোনাহ হতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। উত্তরে তিনি লিখেন, "ইবাদত ও গোনাহ উভয়টি মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন আমলের অন্তর্ভুক্ত। ওযীফার সেখানে কিছু করার নেই। বাকী থাকল তরীকার কথা, মানুষের ক্ষমতাধীন কার্যাদির মাঝে ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া দ্বিতীয় কোন তরীকা নেই। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছাশক্তিকে সহজে কাজে লাগানোর জন্যে প্রয়োজন পড়ে মুজাহাদার। মুজাহাদার হাকীকত হল নফসের বিরুদ্ধাচরণ করা। নফসকে সব সময় কাজে লাগানোর দ্বারা আস্তে আস্তে তা সহজ হয়ে যায়। আমি তাসাওউফ শাস্ত্রের সব কিছু লিখে দিয়েছি।

এরপর শাইখের দু'টি কাজ বাকী থাকে—(১) আত্মার রোগ নির্ণয় করা (২) মুজাহাদার কোন তরীকা নির্ধারণ করা, যা ঐ রোগের চিকিৎসা।" —পৃষ্ঠা ১৭৯

(৬) তিনি বলেন, "এ পথের নির্যাস আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা। যে সব বিষয় হতে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তার অন্যতম দু'টিঃ (ক) শাহওয়াত (কামনা, অভিলাষ) (খ) কিব্‌র তথা অহংকার। এগুলোর চিকিৎসা কোন কামেল বুযুর্গের সংশ্রবে থেকে করতে হবে। কেননা, তিনি এ পথ অতিক্রম করেছেন।" —পৃষ্ঠা ২৮৭

(৭) মুরীদের (এবং সকল মুসলমানের) জন্যে যাহেরী ও বাতেনী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহেরী আদব বলতে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার, বিনয়, নম্রতা ও নৈতিকতা প্রদর্শনকে বুঝানো হয়। বাতেনী আদব হল সবসময়, সর্বাবস্থায়, সকল লেনদেনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ রাখা। বাহ্যিক আদব–আখলাক বাতেনী আদব–আখলাকের পরিচায়ক, বরং পুরো তাসাওউফটাই আদব, অর্থাৎ আদব–আখলাকের নামই **তাসাওউফ।" —পৃষ্ঠা ২৮৯**

(৮) তিনি বলেন, "আখলাকে রযীলা তথা মানুষের **অভ্যন্তরীণ** দোষগুলোর সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা হল—ধ্যান, চিন্তা ও ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে এ খেয়াল রাখা যে, এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ **কি** না? আর তাড়াহুড়া না করা, বরং ধৈর্যের সাথে কাজ সমাধা করা।

অথবা ইত্তিলা ও ইত্তিবা অর্থাৎ স্বীয় আমল ও অবস্থা শাইখকে জানাতে থাকা এবং **শাইখের নির্দেশানুযায়ী আমল** চালিয়ে যাওয়া বা 'ইনকিয়াদ ও ই'তিমাদ' অর্থাৎ **শাইখের পূর্ণ অনুসরণ–অনুকরণ করা এবং তিনি যা বলেন,** তার উপর পূর্ণ আস্থা পোষণ করা।" —পৃষ্ঠা ২৯১

(৯) তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি করার সহজ রাস্তা হল, মহব্বত ওয়ালাদের সাথে উঠাবসা করা।" —পৃষ্ঠা ২৯৭

(১০) 'নকশাবন্দিয়া, চিশতিয়া এগুলো নামে ভিন্ন, কাজে সবগুলো এক ও অভিন্ন।

أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"তাঁ*রা আল্লাহর দল, শুনে রাখ! তাঁরাই সফলকাম।" —সূরা মুজাদালা ঃ ২২

তাছাড়া কোন কোন নকশাবন্দীর মেযাজ চিশতী হয়ে থাকে। আবার এর উল্টো কোন কোন চিশতীর মেযাজ হয়ে থাকে নকশাবন্দী। এরূপ বিভিন্ন নামে বিশেষিত হওয়া নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরশাদ হয়েছে— وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .

"এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।" —হুজুরাত ঃ ১৩

অন্যান্য সিলসিলার ব্যাপারটিও অনুরূপ। কিন্তু আফসোস! আজ লোকেরা এগুলোকেই মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। তাই চিশতী শাইখের জন্যে স্বীয় মুরীদদেরকে শুধু চিশতিয়া পন্থায় তরবিয়ত, প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত নয়; নকশাবন্দী শাইখ শুধু নকশাবন্দিয়া তরীকায় তরবিয়ত করবেন না, বরং সকল শাইখের উচিত স্বীয় মুরীদের যোগ্যতা মাফিক যে তরীকা ও পন্থা তার জন্যে উপকারী হয়, সে তরীকা নির্ধারণ করা।" —পৃষ্ঠা ১৩৯

সমাপ্ত

তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

তাসাওউফের মূলতত্ত্ব, তার সঠিক পথ, বহুবিধ ভ্রান্তির নিরসন, বাড়াবাড়ি-শিথিলতার সংশোধন, হক্কানী পীরের আলামত, শরীয়ত ও তরীকতের সম্পর্ক এবং পীর মুরীদীর আড়ালে কুফর ও ইলহাদের মুখোস উন্মোচন

(একটি জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল পর্যালোচনা)

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা

অনুবাদ

মাওলানা মুতীউর রহমান

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

'তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা' কিতাবটি আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এতে 'তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে শিথিলতা' 'তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ, 'তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি', 'পীর-মুরীদীর নেপথ্যে ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতা' এবং সমসাময়িক কয়েকজন মুলহিদ পীরসাহেব —এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের উপর দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা করার কোশেশ করা হয়েছে।

আলহামদু লিল্লাহ, কিতাবের সব কিছুই খুব তাহকীকের সাথে লেখা হয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে কিছু লিখার পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিতে লি-খেছি। কিতাবের প্রতিটি আলোচনায় কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আর তাফসীর ও ব্যাখ্যা স্বরূপ আনা হয়েছে আকাবির ও মাশায়েখ, উলামায়ে কেরামের বাণীসমূহ।

আয়াতের বরাত দিতে গিয়ে সূরার নাম ও আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসের বেলায় নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস নম্বর অথবা খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে। আইম্মায়ে হাদীসের তাহকীক ও গবেষণা অনুযায়ী এ কিতাবের হাদীসগুলো সনদের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য। হাদীস শাস্ত্রের উসূল ও ধারা অনুযায়ী হাদীসগুলো 'সহীহ' বা 'হাসান', আর কিছু আছে করীব মিনাল হাসান। আর প্রয়োজনীয় স্থানে হাদীসের সাথে আরবীতে তার সনদের মান উল্লেখ করা হয়েছে। ১

١- فأحاديث الرسالة مابين صحيح أو حسن أو قريب من الحسن وقليل ما هو، وما تكلم به على كل حديث نقلا عن الأئمة ربما لا يلزم منه الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن، وإنما ينحصر كلامهم فى الحكم على الإسناد، غير أني بحثت عن حال الحديث أيضا في أمثال هذه المواضع، على ما وقفت له وهديت إليه، واكتفيت عند الحكم بما نقلت عن الحفاظ، تورعا من أن أقوم بمقام تتميم كلامهم، لا سيما ومثل هذا الكتاب لا يتحمل التوسع في مثل هذا الموضوع بأكثر من ذلك.

কিতাবের মাসআলা ও আলোচিত বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে আরো দলীল প্রদান করা যেত, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি এবং সাধারণ পাঠকদের রুচির প্রতি খেয়াল রেখে সংক্ষেপ করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীস থেকে উৎসারিত হক্কানী আকাবির ও মাশায়েখের বাণীসমূহ উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও সংক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাথে সাথে সাধারণতঃ সেসব আকাবিরের উক্তিই বেশী দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের পাঠকদের পরিচিতি ও আস্থা অধিক।

এই কিতাবটি আমি স্থানীয় আকাবির উলামায়ে কেরাম এবং ইলম পিপাসু বন্ধুদের অনেকের নিকট পেশ করেছি। কেউ পুরো সংকলন, কেউ কিছু অংশ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দেখেছেন এবং ভাষা ও বিষয় উভয় দিক থেকে কিতাবটির সংশোধনে আশাতীত সহযোগিতা করেছেন। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁদের সকলের শোকর আদায় করছি। তাঁদের খেদমত ও ইহসানের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দিতে পারেন। جزاهم الله تعالى خير الجزاء وأوفاه

বিশেষভাবে আমি কিতাবটির অনুবাদক মাওলানা মুতীউর রহমানের শোকর আদায় করছি। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে কিতাবটি অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া মূল কিতাব রচনার ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট শ্রম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন এবং রুসুখ ফিল ইলম নসীব করুন এবং তাকে দ্বীনের একজন নিষ্ঠাবান খাদেম হিসাবে কবূল করুন। আমীন।

অবশেষে আমি আবারো তাঁদের শোকর আদায় করছি, যাঁরা আপনাদের হাতে কিতাবটি তুলে দেওয়ার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামান্য হলেও মদদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

آمين برحمتك رب العالمين ۞ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما

১৭/৪/১৪২১ হিঃ
২১/৭/২০০০ ইং

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুত তাসনীফ
মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া
ঢাকা, বাংলাদেশ

তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে শিথিলতা

সমাজে তাসাওউফ সম্পর্কে বহু মৌলিক ভ্রান্তি রয়েছে। সেগুলো সংশোধন হওয়া খুবই জরুরী। অনেকের ধারণা, তাসাওউফের বিধিবিধান ও শিক্ষা-দীক্ষা কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক ও যোগীদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। এ ভুল ধারণার কারণে অনেকে একে বিদ'আত ও গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তাদের এ ভ্রান্তির মূল কারণ হল, হকপন্থীগণ যে তাসাওউফের কথা বলে থাকেন, সে তাসাওউফের হাকীকতের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

দ্বিতীয়তঃ তাদের দৃষ্টি মূলতত্ত্ব ও অর্থের প্রতি নয়, বরং বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা এ জাতীয় মন্তব্য করে থাকেন। কারণ, তারা যখন তাসাওউফের ভিত্তি কুরআন-হাদীসে দেখতে চান, তখন তারা 'তাসাওউফ' শব্দ বা 'পীর-মুরীদী' শব্দসমূহ সন্ধান করতে থাকেন। আর কুরআন-হাদীসে এসব শব্দ না পেয়ে তারা তাসাওউফকে বিদ'আত ও গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো শুধু পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর মূলতত্ত্ব ও অর্থ যদি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান থাকে, তাহলে শুধু এসব শব্দ বিদ্যমান না থাকায় কোন অসুবিধা নেই।

এও একটি কারণ যে, তাসাওউফ দাবীদারদের এমন একটি দল অতিবাহিত হয়েছে এবং এখনও রয়েছে, যারা বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ, বিদ'আত, বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপকে তাসাওউফ নাম দিয়ে রেখেছে। অথচ প্রকৃত তাসাওউফ বা হক্কানী পীর-মুরীদীর সাথে এগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে তো একটি শাশ্বত সত্যকে বদদ্বীন লোকদের বাড়াবাড়ির কারণে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। হ্যাঁ, বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ ও খণ্ডন অবশ্যই করতে হবে।

দ্বীন-দুনিয়ার এমন কোন বিষয় নেই যার মাঝে প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। কেউ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছে, অনেকে তা মেনেও নিয়েছে। মুশরেকরা ভ্রান্ত উপাস্য পর্যন্ত বানিয়েছে। যিন্দীক-মুলহিদরা জাল হাদীস

বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এক ভ্রান্ত আইন তৈরী করে তাকে শরীয়তের অংশ বানাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি। এসব প্রতারণা ও মিথ্যা জালিয়াতির পরও কি কোন কিছুর মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়? অবশ্যই নয়। বরং ভ্রান্ত ও ভেজালকেই বাদ দেওয়া হয়, খণ্ডন করা হয়।

সুতরাং, আল্লাহ-রাসূল হক। জাল উপাস্য এবং ভ্রান্ত নবী না-হক। সত্যপন্থীদের আমল হয় সহীহ হাদীসসমূহের উপর, জাল হাদীসসমূহের উপর নয়; এমনিভাবে সঠিক আইনের উপর, বাতিল আইনের উপর নয়। বাতিল আইনের কারণে তারা বিশুদ্ধ ইসলামী আইনকে অস্বীকার করেন না। জাল হাদীসের কারণে (মা'আযাল্লাহ) তারা সহীহ হাদীসসমূহকে অস্বীকার করতে পারেন না।

অনুরূপভাবে তাসাওউফের বিষয়টিও বুঝা উচিত। বাতিল তাসাওউফ বা বাতিল পীর-মুরীদী সর্বাবস্থায় বাতিল। তাই বলে সত্যিকারের তাসাওউফকে অস্বীকার করার কোন জো নেই।

যাহোক, সত্যিকারের তাসাওউফের মূলতত্ত্ব এবং তার কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্ট। তারপরও যদি কেউ তাসাওউফকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, তাহলে এটা তার মূর্খতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন হল সত্যিকারের তাসাওউফের মূলতত্ত্ব এবং তার কর্মপদ্ধতি কি? নিম্নে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ

কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

"যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের তাযকিয়া তথা আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করবেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হেকমত (অর্থাৎ সুন্নাহ)। শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। সুতরাং, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" — সূরা বাকারা ঃ ১৫১-১৫২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য হতে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে তাযকিয়া তথা আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত (অর্থাৎ সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল এর পূর্বে পথভ্রষ্ট।" – সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় এবং সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াত এবং সূরা জুমু'আর ২নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একই বিষয়, একই ধরনের শব্দে আলোচিত হয়েছে। এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যসমূহ তথা তাঁর নবুওয়ত ও রিসালাতের তিনটি গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[1]

১. আয়াতসমূহ পাঠ করা। অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের সহীহ তেলাওয়াত করা। তার শব্দের সংরক্ষণ এবং যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু সেভাবে পাঠ করা।

২. কিতাব ও হেকমতের তা'লীম। অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়বস্তু শিক্ষাদান এবং তা বুঝানো।

আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে আমি এ দু'টির ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না।

৩. 'তাযকিয়া'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় গুরুদায়িত্বটি হচ্ছে তাযকিয়া। যার অর্থ হল অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক অপবিত্রতা হতে মানব মনকে পবিত্র করা। অর্থাৎ, শিরক, কুফর ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। এমনিভাবে নীতিহীনতা, অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ধন ও মানের মোহ ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র করা এবং তদস্থলে একত্ববাদের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিনয়-নম্রতা, যুহদ ও অমুখাপেক্ষিতা, আল্লাহর মহব্বত, অপরের অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান ও বদান্যতা ইত্যাদিকে স্থান দেওয়া এবং এসব গুণাবলী দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করা।

---

১. এসব আয়াতের অধিকাংশ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ মাআরিফুল কুরআন ঃ ১/৩৩১–৩৪১, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১/২০৯, ৪/৫৩১, ৫৪৭ ও ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ১/৭, ১১ থেকে গৃহীত।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হল, উল্লেখিত বিষয়সমূহ এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়সমূহের শিক্ষাদান কুরআন ও হেকমতের তালীমেরই অন্তরর্ভুক্ত। এরপরও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিন্ন একটি দায়িত্ব সাব্যস্ত করা হল কেন ? বস্তুতঃ এ ভিন্ন দায়িত্ব প্রদানের দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শুধু নীতি ও দর্শনগত দিক থেকে কোন বিষয় হাছিল হওয়ার দ্বারা আমলের পূর্ণতা অর্জিত হয় না। তাই যতদিন পর্যন্ত কোন মুরুব্বীর অধীনে থেকে আমলী অনুশীলনের মাধ্যমে দ্বীনকে অভ্যাসে পরিণত না করবে, ততদিন পর্যন্ত অপূর্ণতা থেকেই যাবে। সুলূক ও তাসাওউফে একজন কামেল শাইখ ও পীরের কাজ এতটুকুই যে, কুরআন-হাদীসে যেসব বিধানাবলীর তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে, তিনি সেগুলোকে আমলে রূপদান এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়ে থাকেন।

হেদায়াত ও সংশোধনের দু'টি ধারা ঃ কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে মানুষের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্যে সর্বদা সর্বযুগে দু'টি ধারা জারি রেখেছেন। এক-আসমানী কিতাবসমূহের ধারা, দুই-সেগুলোর শিক্ষক ও প্রশিক্ষকরূপে নবী-রাসূলদের ধারা। খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উপরের দু'টি ধারা সমান ভাবে বলবৎ ছিল।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সংশোধন ও সফলতার জন্যে উভয় ধারাকে একইভাবে প্রবাহমান রেখে এক বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তা হল, মানুষের সঠিক তালীম-তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু কিতাব যেমন যথেষ্ট নয় তেমনি শুধু উস্তাদ তথা মুরুব্বীর দ্বারাও একাজ সমাধা হওয়া সম্ভব নয়, বরং একদিকে প্রয়োজন আসমানী হেদায়াত এবং খোদায়ী বিধিবিধান—যাকে বলা হয় কিতাবুল্লাহ বা কুরআন। অপরদিকে প্রয়োজন একজন মানব শিক্ষক ও মুরুব্বী, যিনি মানুষকে যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াতের সাথে পরিচিত করাবেন এবং তা অভ্যাসে পরিণত করাবেন।

এটিই কারণ যে, ইসলামের সূচনা যেমন একটি কিতাব এবং একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছিল, উভয়ের সমন্বয় এ ধরাকে উপহার দিয়েছিল একটি সঠিক ও অনুপম আদর্শ। এমনিভাবে আগামী প্রজন্মের জন্যেও রয়েছে একদিকে

পুত-পবিত্র শরীয়ত এবং অন্যদিকে রিজালুল্লাহ তথা দ্বীনের ধারক বাহক মনীষীদের এক অমীয় ধারা।

চিন্তা করে দেখুন, পুরো কুরআন মাজীদের মূল ও সারাংশ হল সূরা ফাতেহা, যা আমরা নামাযের প্রতি রাকাতেই পড়ে থাকি। হাদীসের ভাষায় যাকে উম্মুল কুরআন তথা কুরআনের মূল বলা হয়েছে। তার অন্যতম অংশ হল সিরাতে মুস্তাকীম তথা সহজ-সরল পথের হেদায়াত। এ সূরা ফাতিহাতেও সিরাতে মুস্তাকীম যা কুরআন ও হাদীসেরই পথ–এর সন্ধান দিতে গিয়ে 'কুরআনের পথ, হাদীসের পথ' না বলে, কিছু আল্লাহওয়ালা লোকের সন্ধান দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের পথ সিরাতে মুস্তাকীম–এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল কুরআন, হাদীস ও রাসূলের পথ রিজালুল্লাহের মাধ্যমেই হাছিল করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

"সে সমস্ত লোকের 'সিরাতে মুস্তাকীম' যাঁদের তুমি নেয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয়, যাঁদের প্রতি তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে এবং (তাদের পথও নয়) যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" –সূরা ফাতেহা ঃ ৭

যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হয়েছে, তাঁদের আরো নির্দিষ্ট করে এবং ব্যাখ্যাসহকারে কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

"যাঁদেরকে মহান আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন এঁরা তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।" – সূরা নিসা ঃ ৬৯

যাহোক, কুরআন মাজীদের হেদায়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, মানব জাতির ইসলাহ ও তরবিয়তের জন্যে সর্বযুগে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন। এক–কুরআন ভিত্তিক হেদায়াত। দুই–তা বুঝা এবং সে মুতাবেক আমল করার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহওয়ালাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

অন্যান্য বিদ্যা ও বিষয় এবং তার শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, তালীম-তরবিয়তের এসব নিয়ম-পদ্ধতি শুধু ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট নয়, বরং সর্বপ্রকার বিদ্যা ও বিষয় সঠিকভাবে অর্জন করতে হলে এ পদ্ধতিতেই হতে হবে। একদিকে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্ভরযোগ্য পুস্তকাবলী, অন্যদিকে থাকবে বিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের তা'লীম তরবিয়ত ও দিক নির্দেশনা। এ দু'টি জিনিসই প্রতিটি বিদ্যা, প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা ও চরম উৎকর্ষতার বাহন স্বরূপ।

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও মনোবিজ্ঞানীদের নিকটও এখন এ ব্যাপারটি স্বীকৃত যে, শুধু বই পড়া-পড়ানোর দ্বারা মনোজগতে ও ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আসে না, যতক্ষণ না এতদুদ্দেশ্যে ভিন্ন পরিবেশ বা প্রশিক্ষণাগার তৈরী করা হয়। যেখানে ছাত্ররা কিছুদিন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে জীবন নির্বাহ করতে শিখবে। কিন্তু নববী প্রদীপের প্রজাপতিরা (সাহাবায়ে কেরাম) প্রথম দিনেই সে রহস্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা নিজেদের অধিকাংশ সময় নববী মজলিসে কাটাতেন। ইসলামী শিক্ষার তরবিয়ত হাতে-কলমে গ্রহণ করতেন। এজন্যেই পূর্ববর্তীদের মাঝে শুরু থেকেই বুযুর্গদের সংশ্রব অবলম্বন এবং তাঁদের নসীহত ও ইসলাহের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ধারা চলে আসছে। আত্মশুদ্ধি ও আমলী তরবিয়ত এ পথে যতটুকু সম্ভব, শুধু কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তা সম্ভব নয়।

মরহুম আকবরের ভাষায় ঃ

کورس تو لفظ ہی سکھا تے ہیں

آدمی آدمی بناتے ہیں

"কোর্স শুধু শব্দই শিখায়, মানুষ বানায় মানুষে।"

যাহোক, কুরআন মাজীদে তাযকিয়াকে তা'লীম থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং তাঁর গুরুদায়িত্ব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তা'লীম যতই সঠিক হোক না কেন, শুধু তা'লীম দ্বারা স্বভাবতই নৈতিক সংশোধন হয় না , যতক্ষণ পর্যন্ত তরবিয়ত প্রাপ্ত বিজ্ঞ কোন মুরুব্বীর অধীনে আমলী তরবিয়ত হাছিল না করবে। তা'লীম মূলতঃ সঠিক-সহজ-সরল পথ দেখায় মাত্র। আর শুধু পথ জেনে নেওয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্যে যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সাহস করে পদক্ষেপ না নেওয়া হবে, পথ অতিক্রম না করা হবে।

সাহসী ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব এবং তাঁদের অনুসরণেই হিম্মত সৃষ্টি হয়। নতুবা সবকিছু জানা ও বুঝার পরও অবস্থা এই দাঁড়ায় ঃ

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد ××× پر طبیعت ادھر نہیں آتی

"ইবাদত ও পরহেযগারীর সাওয়াব যে কত তা জানি, তবুও মন ওদিকে একটুও যায় না।"

কাজেই, আমলের স্পৃহা, শক্তি এবং কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আলোকে অন্তর পবিত্রকরণ–এসব বিষয় সাধারণতঃ শুধু কিতাব দ্বারা হয় না, বরং এসব মহান উদ্দেশ্যের জন্যে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত-সংশ্রব এবং তাঁদের কাছ থেকে হিম্মতের তরবিয়ত গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এরই নাম তায্‌কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। পরিভাষায় এরই অপর নাম তাসাওউফ তথা পীর-মুরীদী। হক্কানী পীর-মুরীদী এছাড়া কিছুই নয়।

দ্বীনী ইলম যে শাইখ থেকে অর্জন করা হয়, তাঁকে বলে শাইখুত তা'লীম বা উস্তাদ। আর যে শাইখ হতে তাযকিয়া ও তরবিয়ত অর্জন করা হয় তাঁকে বলা হয় শাইখুত তরবিয়ত তথা পীর বা মুরুব্বী। কখনো তো এমন হয় যে, একজন উস্তাদ শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি মুরুব্বীও হয়ে থাকেন। অপরদিকে একজন ছাত্র মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি স্বভাবগতভাবে অনুগতও হয়ে থাকে। তাই এমন ছাত্রের জন্যে এ প্রকৃতির উস্তাদ শাইখুত তা'লীম ও শাইখুত তাযকিয়া (শিক্ষক ও মুরুব্বী) উভয়ের ভূমিকাই পালন করতে পারেন। এমতাবস্থায় যদিও এখানে বাহ্যিক পীর-মুরীদীর অবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু তার বাস্তবতা এখানেও বর্তমান।

যাহোক, নফ্‌সের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যে, তরবিয়তের জন্যে একজন শাইখ বা মুরুব্বীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একে 'পীর মুরীদী' বলা হোক বা অন্য কিছু, সেটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

সোহবত বা সান্নিধ্য লাভের প্রভাব স্বভাবের উপর অত্যন্ত কার্যকরী হয়। এটি অতি সুস্পষ্ট বিষয়। এজন্যে শরীয়তে নেককার এবং উলামায়ে কেরামের সংসর্গ অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে অসৎ সঙ্গ বর্জনের জন্যেও কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'শুআবুল ঈমান' এ লিখেছেন ঃ

ومعلوم في العادات أن ذا الرأي بمجالسة أولي الأحلام والنهى يزداد رأيا، وأن العالم يزداد بمخالطته العلماء علما، وكذلك الصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء، فلا ينكر أن يكون ذو الخلق الجميل يزداد حسن الخلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة.

"স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন জ্ঞানীদের সাথে উঠা-বসা করে তখন তার বুদ্ধিমত্তা আরো বৃদ্ধি পায়। একজন আলেম যখন উলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে আসে, তখন তার ইলম সমৃদ্ধি লাভ করে। এমনিভাবে

একজন পুণ্যবান ও জ্ঞানী, পুণ্যবান ও জ্ঞানীদের সোহবতে এলেও তাই হয়। কাজেই সৎগুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের সোহবতে একজন সৎচরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন হবে এটাও অনস্বীকার্য।"–শুআবুল ঈমানঃ ৬/২২৯

নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা এবং অসৎসঙ্গের অনিষ্টতা বিষয়ক কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হল ঃ

১. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من شراره أصابك من دخانه. رواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري بعده.

"সৎসঙ্গের উপমা হল মেশকবহনকারীর ন্যায়। যদি মেশক নাও পাও ঘ্রাণ তো অবশ্যই পাবে। অসৎ সঙ্গের উপমা হল হাপরধারীর ন্যায়। তার স্ফুলিঙ্গ না লাগলেও ধোঁয়া থেকে রেহাই পাবে না।"–সুনানে আবু দাউদ ঃ ২/৬৬৪, হাদীস ৪৮১৯

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.

"পুণ্যবান সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গী যথাক্রমে মেশক বহনকারী আর হাপরে ফুৎকারদানকারীর ন্যায়। মেশক বহনকারী হয়ত তোমাকে মেশক প্রদান করবে বা তার নিকট হতে তুমি ক্রয় করবে। তাও না হলে সুগন্ধি তুমি অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুৎকারকারী হয়ত তোমার কাপড় জ্বালাবে, নতুবা দুর্গন্ধতো অবশ্যই পাবে।"–সহীহ বুখারী ঃ ২/৮৩০, হাদীস ৫৫৩৪

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خير جلساءكم من يذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم الآخرة عمله. رواه عبد بن حميد وأبو يعلى في مسنديهما. قال البوصيري رواته ثقات. كما في «إتحاف الخيرة» بذيل «المطالب العالية» ٨: ٢٢٢

"তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী সে, যাকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ হয়; যার কথায় ইলম বৃদ্ধি পায়; যার কাজ-কর্ম তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" -আবদ্ ইবনে হুমাইদ, আবূ ইয়া'লা-ইতহাফুল খিয়ারা ঃ ৮/১৬৩

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ المؤمن مرآة المؤمن "মুমিন মুমিনের জন্যে আয়না।" -সুনানে আবূ দাউদ ঃ ২/৩১৭, হাদীস ৪৯১৮

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দেস মুনাভী (রহঃ) বলেন ঃ

من اجتمع فيه خلائق الايمان، وتكاملت عنده آداب الاسلام، تحوهر باطنه عن أخلاق النفس، وترقى قلبه إلى ذروة الإحسان، فيصير لصفائه كالمرآة، إذا نظر اليه المؤمنون رأوا قبائح أحوالهم في صفاء حاله، وسوء آدابهم في حسن شمائله. انتهى من «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» ٦:٢٥١-٢٥٢

"যে ব্যক্তির মধ্যে ঈমানী গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে, ইসলামের আদব-শিষ্টাচার পূর্ণতা লাভ করে এবং যার অন্তর সৎচরিত্রে আলোকিত, যার অন্তঃকরণ ইহসানের চূড়ায় আরোহণ করে, তিনি নির্মলতায় হন আয়নাতুল্য। মুমিনগণ তাঁর দিকে তাকালে তাঁর স্বচ্ছতায় নিজেদের দোষগুলো দেখতে পায়। ভেসে উঠে তাঁর সুন্দরতম চরিত্রে নিজেদের অশুভ কার্যকলাপসমূহ।" -ফয়যুল কাদীর ঃ৬/২৫১-২৫২

সারকথা আত্মশুদ্ধির জন্যে, তাকওয়া অর্জনের লক্ষ্যে নেক্কার মুত্তাকীদের সোহবত-সংশ্রব অবলম্বনের অপর নাম 'পীর মুরীদী' বা 'তাসাওউফ'। আর যে শাস্ত্রে কুরআন-হাদীস এবং সলফের (পূর্বসূরীদের) বাণীসমূহের আলোকে আত্মশুদ্ধি বা পীর-মুরীদী সম্পর্কিত নিয়ম কানুন ও তার বিধিবিধানের বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তারই নাম ইলমে তাসাওউফ।

তাসাওউফের মূলতত্ত্বের আরেক দিক

সহীহ বুখারী ও মুসলিম-এ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك

حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، آلا وهي القلب.

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও অনুরূপ সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কিছু বস্তু আছে যেগুলো মুশতাবেহ (অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক)। সেগুলোর বিধান কি তা অনেকেই জানে না। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকবে, সে স্বীয় দ্বীন ও ইযযত-আবরু সংরক্ষণে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বস্তুতে লিপ্ত হবে সে ক্রমশঃ হারাম কার্যাবলীতে জড়িয়ে পড়বে। তার উদাহরণ ঐ রাখালের ন্যায়, যে সরকারী সংরক্ষিত এলাকার খুব নিকটে পশু চরায়। তার ব্যাপারে এ আশংকা প্রবল যে, সে শীঘ্রই তাতে (সরকারী সংরক্ষিত এলাকায়) ঢুকে পড়বে। জেনে রাখ! প্রত্যেক শাসকেরই একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে । আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে মাহারিম (হারাম কার্যাবলী)।

শুনে রাখ! মানব শরীরে একটি গোশতের টুকরো আছে, যা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। শুনে রাখ! সে টুকরোটি হচ্ছে ক্বল্‌ব।"–সহীহ বুখারী ঃ ১/১৩, হাদীস ৫২, সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৮, হাদীস ৩৯৭৩

হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে তিন বা চারটি হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলো স্বীয় ব্যাপকতার ফলে ইসলামের পুরো বিধানাবলীকে শামিল করে নেয়–এ হাদীসটি সেগুলোর অন্যতম। এ হাদীসের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে দরকার বিরাট কলেবরের একটি স্বতন্ত্র পুস্তক। এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু হাদীসটির শেষ বাক্যটির প্রতি সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চিন্তার বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো শরীরের আমলের ইসলাহ ও সংশোধনকে অন্তরের ইসলাহ ও সংশোধনের উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, অন্তরে ত্রুটি দেখা দিলে পুরো শরীরের আমলের মাঝে ত্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দেয়।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসের আলোকে আয়িম্মায়ে কেরাম বলেছেন যে, ক্বলব ঠিক করার উপায় হল–শিরক ও কুফরী হতে বেঁচে থাকা। ঈমান ও তাওহীদের (একত্ববাদের) নেয়ামত লাভ করা। তৎসঙ্গে আত্মিক রোগ ও দোষ-ত্রুটি থেকে অন্তরকে পবিত্র করতঃ সৎগুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করা। অন্তর নষ্ট হওয়ার অর্থ হল–তাতে আত্মিক রোগ ও দোষত্রুটি বিদ্যমান থাকা এবং সৎগুণাবলী হ্রাস পাওয়া।[১]

১. ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) প্রণীত জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ঃ ৬৫, ইবনে আল্লান (রহঃ) লিখিত 'ফুতূহাতে রাব্বানিয়া' ৭/৩০৬–৩০৭ সহ হাদীসের অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এখন প্রশ্ন হল–সে আত্মিক রোগ ও দোষ-ত্রুটিগুলো কি? এবং সৎগুণাবলীই বা কি? উত্তর অতি সহজ ও সুস্পষ্ট। কুরআন মাজীদের অগণিত আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আত্মিক গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে–ইখলাস, খোদাভীতি, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি, আল্লাহর মহব্বত, বদান্যতা ও নম্রতা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে আত্মিক রোগসমূহের মধ্যে রয়েছে–রিয়া, কপটতা, অহংকার আত্মগর্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, অবৈধ যৌনাচার, কুপ্রবৃত্তি, ধন-সম্পদ ও সম্মানের মোহ, লোভ-লালসা ও কুধারণা ইত্যাদি।

কুরআন হাদীসে এসব আত্মিক রোগসহ আরো বিভিন্ন রোগ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং অন্তরকে স্বচ্ছ-নির্মল রাখার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অন্তরকে এসবের সাথে জড়ানোর ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে উপরোক্ত গুণাবলীসহ অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করতে জোর তাগিদ করা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারংবার। সাথে সাথে কেউ যদি এসব গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট না হয়, তার ব্যাপারেও চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব গুণাবলী অর্জন করা না হবে এবং অন্তরকে এসব রোগ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে না। আমলও দুরস্ত হবে না। তাছাড়া এসব গুণাবলী অর্জন না করা এবং রোগ ও দোষ-ত্রুটিসমূহের কোনটিতে আক্রান্ত হওয়াও কবীরা গুনাহ।[১]

এ ভূমিকার পর এবার মূল কথায় আসা যাক। যে ইলম অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং তা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়; অন্তরের রোগসমূহের বিশ্লেষণ এবং তার চিকিৎসা নির্ধারণ করে তারই নাম ইলমে তাসাওউফ। আর সেসব সৎগুণাবলী অর্জন এবং আত্মিক রোগ মুক্তির জন্যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও হক্কানী বুযুর্গের চিকিৎসা ও তরবিয়তের অধীনে থাকার নাম 'পীর-মুরীদী'।

উল্লেখ্য যে, হক্কানী বুযুর্গগণ যে সব পদ্ধতিতে তরবিয়ত ও চিকিৎসা করে থাকেন, তা তাঁদের মনগড়া কোন পদ্ধতি নয়, বরং তার কোন কোনটি

১. সেসব সৎগুণাবলী ও দোষসমূহের অধিকাংশেরই সামান্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি 'তাবলীগে দ্বীন', 'হায়াতুল মুসলিমীন' ও 'তালীমুদ্দীন' বই-পুস্তকেও রয়েছে। এসম্পর্কে আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক রয়েছে।

কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর কোন কোনটি কুরআন-হাদীস থেকে তাঁদের গবেষণালব্ধ। ইলমে তাসাওউফের বিশাল গ্রন্থাবলীতে বিবৃত ও চিকিৎসার পদ্ধতি এবং তাসাওউফ বিষয়ক প্রত্যেক মৌলিক বিষয় কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণসহ সবিস্তারে উল্লেখিত আছে। এখানে কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করছি ঃ

১. রিয়াযুস সালেহীন – ইমাম নববী (রহঃ ইন্তেকাল ৬৭৬ হিঃ)

২. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন বিশরহে আসরারে ইহয়াউ উলুমিদ্দীন– আল্লামা মুরতাযা যাবীদী (রহঃ ইন্তেকাল ১২০৫ হিঃ)

৩. আত তাশাররুফ বিমারিফাতি আহাদীসিত তাসাওউফ – হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ ইন্তেকাল ১৩৬২ হিঃ)

৪. মাসাইলুস সুলুক মিন কালামি মালিকিল মুলূক – হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৫. তায়ীদুল হাকীকাহ বিলআয়াতিল আতীকা – হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

৬. হাকীকাতুত তরীকা মিনাস সুন্নাতিল আনীকা–হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ; শেষোক্ত কিতাব দু'টি তাঁরই রচিত 'আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ'-এর ভিতর রয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, "তাসাওউফের বিশুদ্ধ মূলনীতি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান আছে। অনেকের ধারণা, 'তাসাওউফ বলতে কুরআন-হাদীসে কিছু নেই'। কট্টর সূফীদেরও এই ধারণা। তথাকথিত নামধারী আলেমদেরও ধারণা যে, 'কুরআন-হাদীস সম্পূর্ণ তাসাওউফ মুক্ত'। এসব ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এরা সকলেই ভ্রান্তিতে নিপতিত। তারা বুঝতে ভুল করেছে। যাহেরপন্থী আলেমরা বলেন, 'তাসাওউফ কোন বিষয়ই নয়, এসব আজে-বাজে কথা। কুরআন-হাদীসে আছে নামায-রোযার কথা। এগুলো আদায়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সূফীরা কোথা থেকে এসব ঝগড়া-ফাসাদ আমদানী করেছে?' তাদের মতে কুরআন-হাদীস নাকি তাসাওউফ মুক্ত।

আর কট্টরপন্থী সূফীরা বলে থাকে যে, 'কুরআন-হাদীসে শুধু যাহেরী (বাহ্যিক) বিধানাবলী আছে। তাসাওউফ হল বাতেনী বিষয়।' ভাবটি এমন যেন (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন-হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, উভয় দলই কুরআন-হাদীসকে তাসাওউফ মুক্ত মনে করে থাকে। অতঃপর নিজ নিজ খেয়াল খুশী মত এক দল ইলমে তাসাওউফকে বাদ দিয়েছে, আরেক দল বাদ দিয়েছে কুরআন-হাদীসকে।

বন্ধুগণ! বিতর্কের পথ পরিহার করুন। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। উপরোক্ত বিষয়ের উপর অধম (থানভী রহঃ) স্বতন্ত্র দু'টি কিতাব লিখেছে। একটির নাম 'হাকীকাতুত তরীকা'। এ কিতাবে তাসাওউফের হাকীকত (মূলতত্ত্ব) হাদীসের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে। অপরটি হল 'মাসাইলুস সুলূক'। এ কিতাবে পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাসাওউফের মাসআলাসমূহ কুরআন মজীদ দ্বারা সুপ্রমাণিত। এ কিতাবদ্বয়ের মাধ্যমে জানা যাবে যে, কুরআন হাদীস তাসাওউফে ভরপুর। বাস্তবে সেটি তাসাওউফই নয়, যার বিবরণ কুরআন-হাদীসে নেই। ফলকথা, তাসাওউফের সঠিক ও মৌলিক সবগুলো মাসআলা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।"–তরীকুল কালান্দার–বাসায়েরে হাকীমুল উম্মতঃ ১০০

তাসাওউফ ও পীর-মুরীদীর সারকথা

উল্লেখিত বক্তব্যের পর এখন ইলমে তাসাওউফ ও তরবিয়তের ইমাম, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ভাষায় তাসাওউফ ও পীর-মুরীদীর হাকীকত বা তার সার-সংক্ষেপ শুনুন। তারপর আপনি নিজেই ভেবে দেখবেন, এতে কোন্ বিষয়টি এমন আছে যাকে বিদআত বা শরীয়ত পরিপন্থী বলা যায়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেনঃ

"এতে (পীর-মুরীদীতে) ঃ

১. কাশ্ফ-কারামাত প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয়।

২. কিয়ামতের দিন মাফ করানোর জিম্মাদারী নেই। (এবং তা সম্ভবও নয়)

৩. পার্থিব কোন লেনদেনে জিতিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার নেই। এমনও জরুরী নয় যে, তাবীয দিয়ে কোন কাজ উদ্ধার করে দিবে, দু'আ দিয়ে মামলা-মুকাদ্দমায় জিতিয়ে দিবে, কামাই-রোজগারে উন্নতি হবে, ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোগ ভাল করে দিবে, ভবিষ্যতের কথা আগাম বলে দিবে।

৪. তাসাররুফও অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নয় যে, পীর সাহেবের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা মুরীদের সংশোধন হয়ে যাবে। তার কোন গুনাহের খেয়ালও আসবে না, আপনাআপনিই ইবাদত-বন্দেগীর মানসিকতা তৈরী হবে। মুরীদের নিয়ত ও ইচ্ছার প্রয়োজন পড়বে না।

৫. বাতেনী কোন অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ধরাবাঁধা অঙ্গীকার নেই যে, সর্বদা বা শুধু ইবাদতের সময় পরম স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে। আর ইবাদতের সময় কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হবে না। খুব কান্না আসবে এবং এমন আত্মভোলা হবে যে, আপন-পর কারোর কোন খবর থাকবে না।

৬. যিকির-শোগলরত অবস্থায় কোন নূর বা অন্য কিছু দেখতে পাওয়া অথবা গায়েবী কোন শব্দ শুনাও জরুরী নয়।

৭. ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা এবং ইল্‌হাম সঠিক হওয়াও আবশ্যক নয়।

বরং সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। যার মাধ্যম হল–শরীয়তের নির্দেশিত পথে চলা, বিধানাবলী অনুযায়ী পুরোপুরি আমল করা।

কিছু বিধান আছে বাহ্যিক, যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর হক আদায় করা, কসম, কাফ্ফারা, লেনদেন, মামলা-মুকাদ্দমা, সাক্ষ্য প্রদান, অছিয়ত ও পরিত্যাজ্য সম্পদ বন্টন, সালাম-কালাম, পানাহার, ঘুম, উঠা-বসার আদাব ও মেহমানদারী ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত বিধানের নাম ইলমে ফিক্‌হ।

আর কিছু বিধান রয়েছে বাতেন (আভ্যন্তর) সম্পর্কিত, যেমন–আল্লাহ তা'আলার মহব্বত, আল্লাহ তা'আলার ভয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, দুনিয়ার আসক্তি কম হওয়া, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্রতা অর্জন করা, দ্বীনী কাজসমূহ নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেওয়া, কাউকে হেয় মনে না করা, আত্মগরিমা পরিহার করা ও রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। এ বিষয়ক বিধানাবলীর নাম ইলমে সুলূক তথা ইল্‌মে তাসাওউফ।

যাহেরী বিধানাবলীর ন্যায় বাতেনী বিধানাবলী মোতাবেক আমল করাও ফরয। তাছাড়া বাতেনী ত্রুটির কারণে অনেক সময় যাহেরী আমলসমূহে ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন–আল্লাহ তা'আলার মহব্বত কম হলে নামাযে অলসতা আসে, 'তাদীলে আরকান' ব্যতীত তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে ফেলে। কৃপণতা বশতঃ যাকাত আদায় করে না, হজ্ব পালনে অবহেলা করে। অথবা অহংকার ও অধিক ক্রোধ থাকার কারণে কারো উপর অত্যাচার করে ফেলে, কারো হক নষ্ট করে। এ ধরনের আরো অনেক কিছু। বাহ্যিক আমলসমূহে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও নফসের ইসলাহ না হয়ে থাকলে সে সতর্কতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং, নফসের ইসলাহ (সংশোধন) উপরোক্ত দু'টি কারণে জরুরী সাব্যস্ত হল।

কিন্তু এসব বাতেনী ক্ষতিগুলো অনেক কম বুঝে আসে। যা বুঝে আসে, সেগুলোর সংশোধনের পদ্ধতি কম জানা থাকে। আবার যেসব পদ্ধতি জানা থাকে, নফসের গড়িমসির কারণে সে মোতাবেক আমল করা হয়ে দাঁড়ায় অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ ব্যাপার। এসব প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই একজন কামেল পীরের ' শরণাপন্ন হতে হয়, যিনি এসব কিছু বুঝে মুরীদকে অবহিত করবেন। সাথে সাথে তার

চিকিৎসা ও তাদবীরও বলে দিবেন। নফসে যেন সংশোধনের যোগ্যতা ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসা সহজতর হয়, সেজন্যে কিছু যিকির-শোগলও তালীম দিয়ে থাকেন। তাছাড়া যিকির ইবাদতও বটে।[১] সুতরাং, সালেককে (এবং প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহ তা'আলার রাস্তার সালেক) দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমটি জরুরী, তা হল শরীয়তের যাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকারের বিধানাবলী যথাযথ পালন করা। দ্বিতীয়টি হল মুস্তাহাব, তা হল অধিক পরিমাণে যিকির করা।

হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জিত হয়। আর অধিক পরিমাণ যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। এ-ই হল সুলূকের (তাসাওউফের) তরীকা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।" – আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৭–৮

মাসনূন তাসাওউফ

থানভী (রহঃ) বলেন, "যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছিল হয়–এগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশাবলী তথা ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝেই সীমিত। এগুলো যাহেরের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা বাতেনের সাথে, সবগুলোর উপর আমল করুন। ছুটে গেলে কাযা করে নিন। দ্বীনী কাজে এর চাইতে সহজ আর কি হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ দ্বীনী ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপ করেননি।" –সূরা হজ্ব ঃ ৭৮

এমনিভাবে যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন–সেগুলো হারাম ও মাকরুহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (এগুলো যাহেরের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা বাতেনের সাথে) সবগুলো হতে বিরত থাকুন। ঘটনাক্রমে গুনাহ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ইস্তিগফার করে নিন। নিজকে বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবেন না, নগদ ফল পাওয়ার আশায় থাকবেন না। পরবর্তীতে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবেন, এ আকাংখাও পোষণ করবেন না। শুধু এ দু'আ-ই করতে থাকবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন দুনিয়াতে আমল করার তাওফীক দেন, পরকালে জান্নাত নসীব করেন এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। মাসনূন তাসাওউফ (সুলূক) এতটুকুই।"

–আশরাফুস সাওয়ানেহ–বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১০৬

---

১. কামেল পীরের আলামত ৮০নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

তাসাওউফের সারকথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) অন্যত্র বলেন, "তাসাওউফের সারকথা অতি অল্প। তা হল, যে নেককাজে অলসতা অনুভব হয়, অলসতার মোকাবেলা করে সে নেক কাজটি সম্পাদন করবেন এবং গুনাহের চাহিদা হলে তা দমন করতঃ গোনাহের কাজ হতে বিরত থাকবেন। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে, তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কেননা, এতটুকুই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী, এটাই তার সংরক্ষক এবং এটাই তাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করবে।" –ওয়াযুত তাকওয়া–বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১০৬

এই হল তাসাওউফ এবং পীর-মুরীদীর মূলকথা, তার আসল অবয়ব। অথচ এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে, স্পষ্ট ধারণার অভাবে কিছু লোক তাসাওউফ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয়েছে এবং তাসাওউফকে বিদআত বা শরীয়ত পরিপন্থী বলে আখ্যা দিয়েছে। অথচ সত্যিকারের তাসাওউফের মাঝে শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুর সামান্যতম মিশ্রণ পর্যন্ত নেই। তাসাওউফের বর্ণিত হাকীকত (মূলতত্ত্ব) জানার পর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক বিষয়ের ন্যায় তাসাওউফের মধ্যেও কিছু কাজ এমন রয়েছে যা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে সম্পাদিত হয়। যেমন তাখ্লিয়া (পরিশোধন) এবং তাহ্লিয়া (সজ্জিতকরণ) অর্থাৎ, বাতেনী রোগ ও দোষ এবং তার চিকিৎসা জেনে অন্তরকে তা হতে পবিত্র করা। আখলাকে হাসানার (সৎগুণাবলীর) পরিচয় লাভ করা এবং অর্জনের পদ্ধতি অবহিত হয়ে অন্তরকে এগুলো দ্বারা সুসজ্জিত করা।

পক্ষান্তরে তাসাওউফের মাঝে কিছু কাজ এমন আছে যেগুলো মাধ্যম হিসেবে করা হয়ে থাকে। এসব মাধ্যমগুলোর কোন কোনটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-হাদীসে বিধৃত হয়েছে। যেমন শরয়ী মুজাহাদা, অধিকতর মৃত্যুর স্মরণ ও নফসের মুহাসাবা ইত্যাদি।

আর কতিপয় মাধ্যম এমন আছে, যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। (আবার শরীয়তের কোন দলীলের পরিপন্থীও নয়।) বরং হক্কানী মাশায়েখ স্থান-কাল-পরিবেশ এবং কোন মুরীদের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো শরীয়তের কোন বিধান হিসেবে

নয়, বরং কোন শরয়ী উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যে চিকিৎসা স্বরূপ। যেমন–যিকিরের সময় বিশেষ পদ্ধতির জরব লাগানো এবং পানাহার অত্যধিক কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলোকে শরীয়তের হুকুম মনে করা বা সুন্নাতের মর্যাদা দেওয়া নিতান্তই ভুল এবং এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়।

তাছাড়া যিকির ও মুজাহাদার সময় বহু মানুষই অনিচ্ছাধীন বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন যিকিরের সময় আলো দেখতে পাওয়া, কোন গায়েবী আওয়ায শুনা, ভাল স্বপ্ন দেখা এবং ভয়ের আধিক্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া।

এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়াও শরীয়তের নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলোকে তাসাওউফের উদ্দেশ্য মনে করা এবং এগুলো সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করা আদৌ ঠিক নয়।[১]

তাসাওউফ বিরোধীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

তাসাওউফের ব্যাপারে শিথিলতা প্রসঙ্গে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। চলমান শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উল্লেখপূর্বক এ বিষয়ের ইতি টানছি। এ লেখাটি তিনি 'আকাবির কা সুলূক ও ইহসান' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন। এতে তাসাওউফ অস্বীকারকারীদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে।

তিনি বলেছেন, "তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলতত্ত্বের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এটি অতি সুস্পষ্ট একটি বিষয়। কিন্তু দু'টি বস্তু এর ক্ষতিসাধন করেছে। প্রথমটি হচ্ছে, তাসাওউফ সংক্রান্ত মাধ্যম পর্যায়ের বিষয়গুলোতে চরমপন্থা অবলম্বন। দ্বিতীয়তটি হচ্ছে, পরিভাষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান এবং এ বিষয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি।

যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ইখলাস ও আখলাক অর্জন করা জরুরী কি না? ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) কাম্য কি না? সদ্গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া, দোষ-ত্রুটি হতে বেঁচে থাকা, হিংসা-দ্বেষ, অহংকার, রিয়া, সম্পদের লোভ, মান-সম্মানের মোহ এবং

---

১ -আল ই'তিসাম (আল্লামা শাতেবী রহঃ) ঃ ১/২৬৫-২৬৯, ইযাহুল হাক্কিস সরীহ ফী আহকামিল মায়্যিতি ওয়াযযারীহ (শাহ ইসমাঈল শহীদ রহঃ) ঃ ৭৯-৮০, তারবিয়াতুস সালেক ঃ ১/২৬-৩৪, ৫৬৬-৫৬৯, ৬১৪, ৬২২, ৭৮৩, আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ২৫, কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ১৩৫, ৩২৪, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ঃ ১৬৭-১৬৯, বিস বড়ে মুসলমান ঃ ১০০০-১০১৪ (হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ), বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ২৮৩-৩০৪, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম মাদানী খন্ড ২ পত্র নং ৬৬, খন্ড ৩ পত্র নং ৫৭, ৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ২/১১৬-১১৭ (রিসালা 'কালিমাতুল কওম ফি হিকমাতিস সাওম')।

অন্যান্য আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া, কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকা জরুরী কি না ? এমনিভাবে নামাযে একাগ্রতা, কান্নাকাটি করে বিনীতভাবে দু'আ করা, নফসের হিসাব-নিকাশে অভ্যস্ত হওয়া, সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত, সে মহব্বতের স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব হওয়া, অথবা তার আগ্রহ রাখা, এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, লেনদেন পরিষ্কার রাখা, সততা, আমানতদারী, বান্দার হক যথাযথভাবে আদায় করা, আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হওয়া, রাগের সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যাওয়া-এসব কাম্য কি না ?

সুস্থ বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি মানুষ এ ক্ষেত্রে একটি উত্তরই প্রদান করবে যে, এগুলো শুধু ভালই নয়, বরং শরীয়তে কাম্যও বটে। অবশ্য গোঁড়াপ্রকৃতির লোকদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার এসবের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ সংক্রান্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু যদি বলা হয়, ঐ সব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে সে কর্ম পদ্ধতিই, যা পরবর্তীতে তাসাওউফের নাম ধারণ করেছে। তখন তাসাওউফ শব্দটি শুনা মাত্রই কিছু লোকের কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। এর কারণ হল, এ পরিভাষার প্রতি তাদের ভীতি জন্মেছে এবং তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে স্বয়ং তথাকথিত সূফীদের সম্পর্কে। সে সময় তাদের মানসপটে তথাকথিত সূফীদের ঐ সব ঘটনাবলী ভেসে ওঠে, যা কার্যক্ষেত্রে বা নিকট থেকে তারা দেখেছেন বা তাদের সাথে ঘটেছে।

কিন্তু এরূপ ঘটনা শুধু তাসাওউফের ক্ষেত্রেই ঘটেনি, বরং সকল শাস্ত্র, প্রতিটি ইসলাহী দাওয়াত এবং প্রত্যেকটি নেক কাজের একই দশা। তার ধারক-বাহকদের মধ্যে, তার আহবায়ক এবং দাবীদারদের মাঝে বিদ্যমান ছিল খাঁটি-মেকি, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, পরিপক্ক-অপরিপক্ক, সত্যবাদী-মুনাফেক সব প্রকৃতির মানুষ। এতদসত্ত্বেও কোন তত্ত্বসন্ধানী ব্যক্তিই মূল বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে বা তার বিরোধিতা করতে পারে না।

পার্থিব বিষয়াবলীরও একই অবস্থা। ব্যবসা, কৃষি, কারিগরী, শিল্প প্রত্যেকটিতে পাশাপাশি দু'ধরণের লোক পাওয়া যায়। পরিপক্ক-অপরিপক্ক, ভাল-মন্দ, সাধু-অসাধু। অথচ দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত কার্যাবলী আপন গতিতে চলছে, মানুষ থেমে নেই। সবাই নিজ কাজ করেই যাচ্ছে। অপরিপক্কদের কারণে মানুষ দৌলত হতে বঞ্চিত হচ্ছে না। আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে না। পরিভাষাগত কোন বিভেদের কারণে আসল হাকীকত বা মূল বস্তুকে বর্জন করছে না। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف سے

"জ্ঞানীগণ শব্দের প্যাঁচে হারিয়ে যান না, বরং উদ্দেশ্য থাকে মূলতত্ত্বে পৌছার। বলুন, ডুবুরির মুক্তা আহরণ উদ্দেশ্য থাকে, নাকি ঝিনুক আহরণ।"

তাসাওউফের ব্যাপারে মানুষ দু'দলে বিভক্ত। একদল তাসাওউফের সকল বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে মেনে থাকেন। কিন্তু যখন সেগুলোর সমষ্টিগত কোন নাম দেওয়া হয়, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসেন। উপরে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সব ক'টিই সবাই পৃথক পৃথকভাবে মেনে থাকেন। কিন্তু যখন কেউ কোন কারণে সেগুলোকে সমষ্টিগত ভাবে 'তাসাওউফ' নামে অভিহিত করেন, তখনি তাদের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে যায়। তারা বলতে থাকেন, আমরা তাসাওউফ মানি না। তাসাওউফ আমাদের বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে।

দ্বিতীয় দলটি এমন, কেউ যদি সেই হাকীকত তথা মূলতত্ত্বের নাম পরিবর্তন করতঃ তাদের সামনে উপস্থাপন করে তাহলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করে নেয়। যেমন বলা হল, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় এ তাসাওউফের নাম তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি, হাদীসের পরিভাষায় ইহ্সান এবং পরবর্তী উলামায়ে কেরামের কারো পরিভাষায় এর নাম ফিক্হে বাতেন। তখন তারা বলেন, এ নিয়ে মতভেদের কিছু নেই। এগুলো শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

ব্যাপার হল, এ পর্যন্ত রচিত সকল কিতাবে সংস্কার করাও সম্ভব নয় এবং মানুষের মুখও বন্ধ করে রাখা যায় না। নতুবা আমাদের সাধ্যের ভিতরে থাকলে আমরা একে তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি বা ইহ্সান নাম দিতাম। তাসাওউফ শব্দই ব্যবহার করতাম না। কিন্তু এখন এটি তাসাওউফ নামেই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটা কোন বিষয় বিশেষের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং ইলম ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ইতিহাস এ ধরণের প্রচলিত পরিভাষায় ভরপুর।

বিজ্ঞজন ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মাধ্যমসমূহকে মাধ্যম পর্যন্তই সীমিত রাখেন। এমনিভাবে তাঁরা বড় সাহসিকতার সাথে সে সব জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করেন, যা শুধু মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বহির্ভূতই নয়, বরং তার স্পষ্ট পরিপন্থী এবং অধিকাংশ সময় তা মূল উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি, যে যুগে তাসাওউফ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ আসল-নকল, হাকীকত-সূরত, মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রথাকে পৃথক পৃথক বুঝিয়ে দেননি।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ও শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) থেকে নিয়ে মুজাদ্দেদে আলফে সানী, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও হাকীমুল উম্মত

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীরা সবাই মূল দ্বীনী ও আনুষঙ্গিক উভয় বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে হক-নাহকের পার্থক্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কঠোর হস্তে ঐ সব রসম-রেওয়াজ খণ্ডন করেছেন, যেগুলো অমুসলিমদের সংশ্রব বা অপরিপক্ক সূফীদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাসাওউফের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) রচিত 'ফুতূহুল গায়ব' 'গুনয়াতুত্ তালেবীন' অথবা শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)-এর 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ', হযরত মুজাদ্দেদ (রহঃ)-এর 'মাকতূবাতে ইমাম রাব্বানী' বা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)-এর রচনাবলী বা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর 'সিরাতে মুস্তাকীম', হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর 'মাকতূবাত', হযরত থানভী (রহঃ)-এর 'তারবিয়াতুস সালেক' 'কাসদুস সাবীল' এসব গ্রন্থে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে আসল-নকলের পার্থক্য ধরিয়ে দিয়েছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) তো এতটুকু পর্যন্ত লিখেছেন ঃ

نسبت صوفیه کبریت احمر است ورسوم ایشاں هیچ نیرزد

'সূফীদের নিসবত অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক অতি মূল্যবান নেয়ামত। কিন্তু তাঁদের রসম-রেওয়াজ (যেগুলো শরীয়তের আলোকে প্রমাণিত নয়) মূল্যহীন।'

এমনিভাবে এ সকল উলামায়ে কেরাম আখলাক, লেনদেন ও বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের শর্তরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের রচনাবলী এসব বিষয়বস্তুতে ভরপুর। তাঁদের মজলিসগুলো এসবের বর্ণনায় সুশোভিত।

আমরা যে সকল বুযুর্গানে দ্বীনের যুগ পেয়েছি এবং যাঁদের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, যাঁদেরকে দেখে তাসাওউফের ভক্ত ও প্রবক্তা হয়েছি, তাঁদের মধ্যে আমরা শুধু তাসাওউফ আর তরীকতই পাইনি, বরং তাঁদের মধ্যে পুরো দ্বীন ও শরীয়তের নির্যাসও খুঁজে পেয়েছি। তাঁদের আখলাক ছিল নববী আখলাকের ঝলক। তাঁদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, আমল সর্বোপরি তাঁদের জীবন ছিল শরীয়তের ছাঁচে তৈরী, শরীয়তের দাঁড়িপাল্লায় মাপা। তাঁদের দেখেছি সব-সময় মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও ওয়াসায়েল (সহায়ক ও মাধ্যম)-এর মাঝে পার্থক্য করতে। দেখেছি পরিভাষা হতে বিমুখ হয়ে, সেগুলো ভুলে গিয়ে হাকায়েক-এর (মূলতত্ত্বের) প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতে।

আরও দেখেছি তাঁরা রসম-রেওয়াজ বিরোধী এবং বিদআত অপনোদনে সোচ্চার। তাঁদের জীবনে সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সুন্নাতের অনুসরণ তাঁদের চাল চলন ও লেনদেন তথা যাবতীয় কাজে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। যাঁরা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাবলে, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওয়াসায়েলের মধ্যে কখনো সংক্ষেপ করার মাধ্যমে, কখনো যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে, কখনো বা বাদ দিয়ে, পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এর সামঞ্জস্য বিধান করে থাকেন। প্রত্যেকের স্বভাব-প্রকৃতি মোতাবেক ওষুধ নির্ধারণ করেন, চিকিৎসা করেন এবং চিকিৎসা ও পথ্যের বেলায় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, ব্যস্ততা ও অবস্থার প্রতি পুরো দৃষ্টি রাখেন। তাঁরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ন্যায়, যিনি চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ণকারী। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে উপকারিতা এবং রোগীর সুস্থতা, অন্য কিছু নয়।

কারণ, তাঁদের নিকট তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য হল–নৈতিক শুদ্ধি, লেন দেনে স্বচ্ছতা অর্জন, স্বভাব-চরিত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন, নিজকে নিয়ন্ত্রণ, অন্যাকে অগ্রাধিকারদান, দ্বীনের অনুসরণ-অনুকরণ, প্রতিটি বিষয়ে ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ইত্যাদি। যিকির-আযকার, চেষ্টা-সাধনা, শাইখের সাহচর্য ও বাইআতের আসল উপকারিতা এগুলোই। যদি এটুকু হাছিল না হল, তবে তা হবে অনর্থক অসাধ্য সাধনের নামান্তর এবং তখন নিম্নোক্ত পংক্তিটি পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে ঃ

خواجه پندارد که مرد واصل است
حاصل خواجه بجز پندار نیست

সাধক তো মনে করেন যে, তিনি আল্লাহর তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়ে গেছেন, অথচ এটা তার আত্মপ্রবোধ বৈ কিছুই নয়।" –আকাবির কা সুলূক ও ইহসান–ভূমিকা

তাসাওউফের এক স্তর ফরযে আইন

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)–এর সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর আমরা একটি বিষয় আরো ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করতে চাই। তা হল, কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত, অগণিত হাদীস ও ইজমা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় নেক আমলগুলো করা, আক্বীদা-বিশ্বাস ঠিক করা, ইখলাস, শোকর, ধৈর্য, যুহ্দ, বিনয়, তাওয়াক্কুল প্রভৃতি সৎগুণাবলী অর্জন করা এবং রিয়া, নাশোকরী, দুনিয়ার মোহ, অহংকার ইত্যাদি দোষগুলো থেকে অন্তরকে

পাক-পবিত্র রাখা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরযে আইন (সর্বজন পালনীয় অপরিহার্য কর্তব্য)।

সংক্ষেপে বিষয়টি হল, কথায়-কাজে-বিশ্বাসে যাহেরে-বাতেনে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীতে) পুরো শরীয়তের অনুসরণ করা ফরযে আইন। এটা ইলমে দ্বীন অর্জন করে হোক বা উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে থেকে হোক, বাইআত ছাড়া হক্কানী বুযুর্গদের সাহচর্যে থেকে হোক বা সাহচর্য অবলম্বনের পাশাপাশি তাদের কারো হাতে বাইআত হয়ে হোক।

মোটকথা, কাজে-কর্মে-বিশ্বাসে যাহেরে-বাতেনে পুরো শরীয়তের অনুসরণ অনুকরণ করা ফরয; প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে জরুরী; সর্বজন পালনীয় অপরিহার্য কর্তব্য। তাই তাসাওউফ বা পীর-মুরীদী ইত্যাদি শব্দের সাথে মতানৈক্য করে অথবা পীর-মুরীদীকে মুস্তাহাব মনে করে পূর্বোক্ত বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে না।

ভালভাবে বুঝতে হবে, ইসলাহের একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম হল পীর মুরীদী। এই পদ্ধতি মুস্তাহাব বিধায় আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও আখলাকের ইসলাহও মুস্তাহাব হবে এমন নয়। বরং, এগুলোর ইসলাহ করা ফরযে আইন। কারণ এগুলো তো সরাসরি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যে যেহেতু শরীয়ত পূর্বোক্ত পদ্ধতিসমূহের কোনটিকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেনি। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটি পদ্ধতিকে (যেমন পীর-মুরীদীকে) কোন কারণ ব্যতিরেকে ফরয বা ওয়াজিব বলা যাবে না।

এমনিভাবে নফল ও যিকিরের আধিক্য এবং ইহসানের সর্বোচ্চস্তর অর্জন করার জন্যে কোন বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকা মুস্তাহাব। একে মুস্তাহাব বলার দ্বারা মূল ইসলাহ (যার বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে) মুস্তাহাব হবে এমন নয়।

এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দিয়েছে যে, কেউ কেউ যখন উলামায়ে কেরামের নিকট পীর-মুরীদী কাজটি মুস্তাহাব বলে শুনতে পায়, তখন তারা মনে করে, পীর সাহেবের নিকট মুরীদরা যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে বা পালন করে থাকে, তা সবই মুস্তাহাব তথা ঐচ্ছিক পর্যায়ের জিনিস। অথচ ব্যাপারটি এমন নয় যা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। বহু সূফী দ্বীনী ইলমের দৈন্যতা ও মূর্খতার কারণে তাসাওউফের আসল মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে অক্ষম। তারা মনে করেছেন কিছু ওযীফা, যিকির-শোগল ও নির্জনতার নাম তাসাওউফ। আর কেউ কেউ ভেবেছেন, কোন একজন পীর সাহেবের হাতে বাইআত হওয়া বা কারো মুরীদ হওয়ার নামই তাসাওউফ।

অনেক জাহেল বা বিদআতী পীরের কারণেও বেশ বাড়াবাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রচুর বিদআত ও ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকের এই স্বল্প পরিসরে সবগুলো তুলে ধরা অসম্ভব। তাই শুধু বড় বড় ভ্রান্তিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা হল।

১. বাইআত হওয়াকে নাজাতের জন্যে শর্ত মনে করা এবং নামমাত্র বাইআতকেই নাজাতের জন্যে যথেষ্ট মনে করা

একটি ভ্রান্তি হচ্ছে কেউ কেউ ইসলাহে নফসের জন্যে, পরকালে নাজাতের জন্যে, কারো হাতে বাইআত বা মুরীদ হওয়াকে ফরয মনে করে থাকে। বাইআত হওয়ার পর তারা মনে করে যে, সবকিছুই হয়ে গেছে। অথচ বাইআত হওয়া ফরযও নয়, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদাও নয়। তাছাড়া শুধু বাইআত হওয়াই আত্মশুদ্ধির জন্যে যথেষ্ট নয়। বাইআত মূলতঃ শরীয়তের যাহেরী-বাতেনী যাবতীয় বিধানাবলীর উপর অটল থাকার প্রতিশ্রুতিকে নবায়ন করার নাম। এ বাইআত একাধিক হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, "এক হল বাইআতের হাকীকত (তত্ত্ব), আরেক হল বাইআতের রূপ। মানুষ যখন ঈমান গ্রহণ করে, তখন তার এ ঈমানই একটা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার হয় শরীয়তের যাবতীয় বিধান মোতাবেক চলা এবং এর উপর অটল থাকার জন্যে। এরপরও কোন পীর সাহেবের নিকট বাইআত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, উক্ত প্রতিশ্রুতি নবায়ন করা। এটি হল বাইআতের হাকীকত। একেই বলে মুরীদ হওয়া।"

তিনি আরো বলেন, "এটি ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদা হওয়ার কোন দলীল নেই। তবে কতিপয় হাদীসে এ ধরণের বাইআতের কথা আছে, যার দ্বারা সে বাইআত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত প্রমাণিত হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের বাইআতের ব্যাপারে মুদাওয়ামাত (সব সময়) করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাজারো মুমিন এমন পাওয়া যায়, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু .আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এ বিশেষ পদ্ধতির বাইআত হননি।"

তিনি বলেন, "আরেকটি হল বাইআতের রূপ, অর্থাৎ অঙ্গীকারের সময় হাতে হাত রাখা অথবা হাতে কাপড় ইত্যাদি ধরা। এটি একটি মুবাহ (যা করা না করা উভয়ই সমান) আমল। একে মুস্তাহাবও বলা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাতে হাত রাখার যে রেওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে, তা ইবাদত ও দ্বীনী আমল হিসেবে নয়, বরং আদত-অভ্যাস হিসেবে। আরবে পূর্ব থেকেই অঙ্গীকারের সময় হাতে হাত রাখার প্রথাটি প্রচলিত ছিল।"

তিনি আরো বলেন, "মোটকথা এই যে, সূফীদের নিকট প্রচলিত বাইআতের হাকীকত মুস্তাহাবের উর্ধ্বে নয় এবং তার বিশেষ রূপ ও অবস্থা মুবাহের চাইতে বেশী নয়। কাজেই, একে কাজে-বিশ্বাসে অধিক মর্যাদা দেওয়া, যেমন বাইআতকে নাজাতের শর্ত মনে করা অথবা বাইআত পরিত্যাগকারীকে তিরস্কার করা-এ সবই বিদআত, দ্বীনী বিষয়ে সীমালংঘনের শামিল।

যদি কেউ সারা জীবনে কখনো প্রচলিত পদ্ধতিতে কারো হাতে বাইআত না হয়, বরং নিজেই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে অথবা উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে জেনে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে শরীয়তের বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে সেও মুক্তিপ্রাপ্ত, মকবূল ও নৈকট্য অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, আমল ও ইসলাহের যে স্তর শরীয়তে কাম্য, তা কোন কামেল বুযুর্গের তরবিয়ত ব্যতীত সচরাচর হাছিল হয় না। কিন্তু তার জন্যে প্রচলিত বাইআত শর্ত নয়। প্রয়োজন হল কোন কামেল বুযুর্গের সংস্রব ও সাহচর্য, তাঁর মহব্বত, অনুসরণ-অনুকরণ। তৎসঙ্গে প্রয়োজন ইসলাহ ও তরবিয়তের চিন্তা-ফিকির ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা।"[১]

বাইআতের এ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য মনে রেখে যদি শাইখের হাতে হাত রেখে ইসলাহের অঙ্গীকারকে দৃঢ় করা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কারণ এর দ্বারা মুরীদের প্রতি পীরসাহেবের সুদৃষ্টি ও মহব্বত বৃদ্ধি পায় যা তার ইসলাহের জন্যে খুবই জরুরী।

[১]– ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৩৭-২৩৮, কামালাতে আশরাফিয়াঃ ১৮২, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২৬০, ২৪৮, ২৭১, বাছায়েরে হাকীমুল উম্মতঃ ৫৮-৬০, ১৩৬-১৪২, ১৪৬, ৫৮৬-৫৮৮, আরো দ্রষ্টব্যঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ১১/৫১১-৫১৪, আর-রাসাইলুস সুগরাঃ ১০৬, ১২৫, রিসালাতুল মুসতারশিদীনঃ ২৪-৩৬ (ভূমিকা), আলী ইবনে আবূ তালেব ইমামুল আরেফীনঃ ১১২-১১৮, আল কাওলুল জামীলঃ ৫১, মাকতূবাতে শাইখুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) ৪৪/৫১

কিন্তু কিছু লোক তাসাওউফ নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করছে যে, একদিকে তাসাওউফকে ফরয বলছে ; অন্য দিকে তারাই এত অনীহা-অবহেলা করছে যে, শুধু বাইআত এবং নাম মাত্র পীর-মুরীদীকেই নাজাতের জন্যে যথেষ্ট মনে করছে। অথচ শরীয়তের উপর অটল থাকা এবং আত্মশুদ্ধি অর্জন ইত্যাদি ঈমানের প্রতিশ্রুতির দাবীতে এমনিতেই আবশ্যক ছিল। তারপর বাইআতে আবার সে অঙ্গীকার নবায়ন করার দাবী হল ইসলাহে আমল ও ইসলাহে নফসের ব্যাপারে অধিক তৎপর হওয়া। কিন্তু এ বাইআতকে শেষ পর্যন্ত বানানো হল অনীহা-অবহেলার বাহানা! সকলেই জানেন, বাস্তবে অঙ্গীকার পূর্ণ করা ব্যতীত নিছক মৌখিক অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই।

হযরত থানভী (রহঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন, "বাইআতের আসল হাকীকত ও তত্ত্ব বাইআত শব্দ ও মুরীদ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মুরীদ শব্দের অর্থ হল ইচ্ছা পোষণকারী। ইরাদা (ইচ্ছা) শুধু আশা-আকাংখার নাম নয়, বরং উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে প্রয়োজনীয় মাধ্যম-উপায় অবলম্বন করা অথবা মানযিলে মাকসূদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করা ও ইরাদার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুরীদ সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় দ্বীনী ইসলাহ বিশেষতঃ আত্মিক সংশোধনকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে প্রয়োজনীয় মাধ্যম অবলম্বন করে এবং সেদিকে যাত্রা করে।

আর বাইআতের অর্থ হল, ঐ মানযিলে মাকসূদের জন্যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে রাহ্বার হিসেবে গ্রহণ করা। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পথ চলা। যার ফলে আল্লাহর রহমতে গোমরাহীর আশংকা মুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়। কেবল তাই নয়, বরং পথ অতিক্রম করতে পারবে সহজে এবং আরামের সাথে।এক কথায় নিজের চাইতে অধিক ওয়াকিফহাল, যোগ্য সংশোধনকারীর হাতে নিজকে সঁপে দেওয়া। যেমন রোগী কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় এবং ওষুধ ও পথ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি তাঁরই সিদ্ধান্ত মেনে চলে।"

হযরত থানভী (রহঃ) আরো বলেন, "পীর-মুরীদী বা বাইআতের হাকীকত ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেক চরম ও শিথিল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। একদিকে কিছু লোক একে সম্পূর্ণরূপে বিদআত আখ্যা দিয়েছে। অন্যদিকে বহু লোক এ প্রথা চালু করে রেখেছে যে, বাইআত হয়ে শুধু হস্ত চুম্বন, কদম চুম্বন ইত্যাদি করে নিলেই হল। বাকী নিজে কিছু করারই প্রয়োজন নেই। অথচ নামমাত্র পীর-মুরীদীতে কোন লাভ নেই। আসল কাজ হল কোন রাহবার ও পথ নির্দেশকের হাত ধরে নিজে পথ অতিক্রম করা। যদিও প্রচলিত পন্থায় কারো মুরীদ না-ই বা

হল। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মুরীদ হওয়া কোন বরকতের বিষয় নয়। উদ্দেশ্য হল একেই সব কিছুর মূল মনে করা মস্ত বড় ভুল।"[১]

তিনি আরো বলেন, "কারো নিকট শুধু অবস্থান করার দ্বারা কি উপকার হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের সংশোধনের চিন্তা-ফিকির না করে?"[২]

সলফে সালেহীনের যুগে ইসলাহে নফসের জন্যে দ্বীনী ইলম অর্জন করা, আল্লাহওয়ালাদের সোহবত, তাঁদের মহব্বত ও অনুসরণের পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। নামমাত্র বাইআত বা অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত শুধু সম্পর্কের প্রশ্নই ছিল না। আর সেটিই ছিল আসল সুলূক এবং মাসনূন তাসাওউফ। এ ব্যাপারে সূফী শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ নফযী (রহঃ) (ইন্তেকাল৭৯২ হিঃ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন, যা 'রিসালাতুল মুসতারশিদীন' গ্রন্থের টীকায় (৭২-৭৩) বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে সলফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাদের ঘটনাবলী এত অধিক যে, সেগুলো বর্ণনার জন্যে বিরাট গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। কতিপয় ঘটনা 'রিসালাতুল মুসতারশিদীন' ঃ ১০২-১০৮-এর টীকাতেও উল্লেখ আছে।[৩]

২. যাচাই-বাছাই ছাড়া যে কোন পীরের হাতে বাইআত হওয়া

একটি বড় ধরনের ভ্রান্তি হল, ইসলাহের স্পৃহা জাগল আর সাথে সাথে কোন প্রকারের তাহকীক–তদন্ত ছাড়াই যে কোন পীরের হাতে বাইআত হয়ে তার মুরীদ হয়ে গেল। অথচ মুরীদ হতে হয় এমন ব্যক্তির, যার সংস্পর্শে থাকা যায়, যার সাথে মহব্বত রাখা এবং যার অনুসরণ করা যায়, যার সোহবত ও তরবিয়তের বদৌলতে নিজের সংশোধনে সহযোগিতা পাওয়া যায়। কেননা, বাইআত ও মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই। কাজেই কাউকে শাইখ বা পীর হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে এ সবের প্রতি খেয়াল করা জরুরী।

কুরআন মাজীদে দ্বীনী ব্যাপারে হেদায়াতপ্রাপ্ত, সৎ, নেককার, অভিজ্ঞ আলেম, পুণ্যবান এবং আল্লাহর রাহের পথিকদের সান্নিধ্য অর্জন করতে, তাঁদের শরণাপন্ন হতে এবং তাঁদেরকে অনুকরণ-অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নাহল আয়াত ৪৩, সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭, সূরা ফাতেহা আয়াত ৬-৭, সাথে সূরা নিসা আয়াত ৬৯, সূরা লোকমান আয়াত ১৫ থেকে উৎসারিত।)

১.–শরীয়ত ও তরীকত ঃ ৬১-৬২

২. –কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ২৭১

৩. উলামায়ে কেরামের জন্যে আরো দ্রষ্টব্য 'আলী ইবনে আবূ তালেব ইমামুল আরেফীন ঃ ১১২-১১৮, কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ১৮২

এমনিভাবে কাফের-মুশরেক, প্রবৃত্তিপূজারী, ফাসেক-পথভ্রষ্ট, জাহেল ও দুনিয়াদারদের সংশ্রব, তাদের অনুসরণ এবং তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। (সূরা কাহাফ আয়াত ২৮, সূরা ইনসান আয়াত ২৪, সূরা আরাফ আয়াত ৩, সূরা আহযাব আয়াত ৬৭, সূরা বাকারা আয়াত ১৭০, সূরা মায়েদা আয়াত ৭৭, সূরা আনআম আয়াত ৬৮, ৬৯, সূরা ছাফফাত আয়াত ৫১-৬১, সূরা ত্বহা আয়াত-১৩১)

হাদীস শরীফেও শুধু নেককার পুণ্যবানদের সোহবত অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এবং অসৎলোকদের সংশ্রব বর্জন করার প্রতি কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

'সুনানে আবূ দাউদ' (হাদীস ৪৮২৩) 'জামে তিরমিযী' (হাদীস ২৩৭৮)-এ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

المرأ على دين خليله فليتظر أحدكم من يخالل. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .

"ব্যক্তি তার বন্ধুর মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই ভালভাবে দেখে নেওয়া উচিত, কার সাথে সে বন্ধুত্ব করছে।"

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পীর সাহেবের সাথে মুরীদের সম্পর্ক হয় গাঢ়, সুদৃঢ়। যখন সাধারণ বন্ধুত্বের প্রভাব দ্বীনের ব্যাপারে এত বেশী ক্রিয়াশীল, তাহলে পীর সাহেবের এত গাঢ় ও সুদৃঢ় মহব্বত ক্রিয়া ও প্রভাবমুক্ত থাকার প্রশ্নই ওঠে না ? বাস্তব কথা হল, পীর সাহেবের আক্বীদা-বিশ্বাস, আমল ও আখলাকের প্রভাব মুরীদের মাঝে দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে। সুতরাং, পীর সাহেবের অবস্থা যদি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে মুরীদের অবস্থা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্যে পীর অনুসন্ধানের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অথচ এ বিষয়ে বেশী অবহেলা করা হয়। তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। তাই এ দিকটার সংশোধন একান্ত জরুরী।

উপরে যে সব আয়াত ও হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে সেগুলো এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম একজন কামেল শাইখ বা হক্কানী পীরের কতিপয় আলামত ও লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। অন্যথায় পীর-মুরীদী দ্বারা সংশোধনের পরিবর্তে শুধু ফাসাদই সৃষ্টি হবে।

হক্কানী পীরের আলামত

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শাইখ বা পীর হবেন তিনি, যার মধ্যে নিম্নোক্ত আলামতগুলো পাওয়া যাবে ঃ

১. প্রয়োজন পরিমাণ ইলমে দ্বীনের অধিকারী হওয়া, তা ইলম অর্জনের মাধ্যমে হোক বা উলামায়ে কেরামের সংশ্রবের মাধ্যমে। যাতে অন্ততঃ তিনি নিজকে ও মুরীদদেরকে আমল ও আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন। নতুবা অবস্থা হবে এই ঃ

خویشتن گم است کرا رهبری کند

অর্থাৎ নিজেই পথহারা, সে আবার পথ দেখাবে কাকে ?

২. আমল, আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণ করা। যাহেরী-বাতেনী (বাহ্যিক-আত্মিক) ইবাদতসমূহ সব সময় যথাযথ পালনে যত্নবান হওয়া।

৩. সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, বিদআতী না হওয়া।

৪. দুনিয়ার মোহমুক্ত এবং আখেরাতের অনুরাগী হওয়া।

৫. কামেল বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করা।

৬. উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় বুযুর্গ, মুত্তাকী উলামায়ে কেরামের সোহবত লাভে ধন্য হওয়া।

৭. সমকালীন ন্যায়পরায়ণ উলামায়ে কেরাম এবং মাশায়েখ তাকে ভাল জানা।

৮. তালীম-তালকীন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে স্বীয় মুরীদদের অবস্থার উপর দয়াপরবশ হওয়া। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৯. তার সংশ্রবে কয়েকবার বসার ফলে দুনিয়ার মহব্বতে ভাটা এবং আখেরাতের অনুরাগে উন্নতি অনুভব হওয়া।

১০. যারা তার নিকট বাইআত হয়েছে তাদের অধিকাংশের অবস্থা শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ বৃদ্ধি এবং দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা।

১১. সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যিকিরসমূহের ধারক-বাহক ও সংরক্ষক হওয়া।

১২. শুধু সালেহ তথা পুণ্যবান হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং মুসলেহও হতে হবে। অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সংশোধনের যোগ্যতা উভয়ই থাকা জরুরী, যাতে মুরীদ যে বাতেনী রোগের কথা বলবে, তা খুব মনোযোগের সাথে শুনে চিকিৎসা করতে পারে।[১]

---

১. 'আল কাওলুল জামীল' শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) ঃ ২০-২৭, শরীয়ত ও তরীকত ঃ ৬৬-৬৯, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ঃ ১৪৫-১৫০ এবং রিসালাতুল মুসতারশিদীন ঃ ১০২-১০৩

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) উক্ত আলামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে উক্ত আলামতগুলো পাওয়া যাবে, তাঁর সম্পর্কে আর দেখার প্রয়োজন নেই যে, তাঁর থেকে কোন কারামত প্রকাশ পেয়েছে কি না? অথবা সে ব্যক্তি স্বীয় বাতেনী শক্তি বলে কাজ উদ্ধার করে দিতে পারে কি না? তাঁর কাশ্‌ফ হয় কি না? কেননা, এ সব জিনিস শাইখ বা পীর হওয়ার জন্যে জরুরী নয়, এমনিভাবে ওলী হওয়ার জন্যেও অপরিহার্য নয়।" [১]

যাহোক, এগুলো হল হক্কানী শাইখ বা পীর পরিচয় লাভের আলামত। এ আলামতগুলো উলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করেছেন।

পর্দার বিধান লংঘনকারী হক্কানী পীর নন

কিন্তু আজকাল মানুষ এসব আলামতের তোয়াক্কা না করে যার তার হাতে বাইআত হয়। এমনকি, এক শ্রেণীর বেশরা পীর, যারা পর্দার হুকুম অমান্য করে মহিলাদেরকে সরাসরি বাইআত করে, তাদের নিকটেও বাইআত হয়।

এসব পীর ও তাদের মূর্খমুরীদরা পর্দার বিধান লংঘন করার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বলে, 'নিজের মহিলা মুরীদগণ আপন মেয়েদের মতোই, তাদের সাথে কোন পর্দা নেই।'

অথচ শরীয়তের অকাট্য বিধান হল যে, সকল গাইরে মাহরামের সাথেই পর্দা করা ফরয। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে সবাইকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন শ্রেণী বিশেষকে এর পরিমণ্ডল হতে বাদ দেননি। ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ، إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ...

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং মাথার ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকেও ঢেকে রাখে।" –সূরা নূর ঃ ৩০-৩১

সাহাবায়ে কেরামও সেসব মহিলাদের সাথে পর্দা করেছেন–যারা তাঁদের নিকট দ্বীন-শরীয়ত ও আত্মশুদ্ধির সবক নিতেন। অথচ তাদের মনের পবিত্রতার তুলনা হয় না।

---

১. বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১০৯, কাসদুস সাবীল–ইসলাহী নেসাব ঃ ৫০১

চিন্তা করার বিষয় যে, একদিকে সাহাবায়ে কেরাম, অন্যদিকে উম্মাহাতুল মুমিনীন, (নবী পত্নীগণ যারা উম্মতের মা তুল্য) তদুপরি তাঁদের পরস্পরে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ সাহাবায়ে কেরামও তাঁদের সন্তানতুল্য।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

"তোমরা তাদের (উম্মাহাতুল মুমিনীনের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।"–সূরা আহযাব ঃ ৫৩

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও (সুতরাং আগত বিধানগুলো যা অন্যান্য মহিলাদের জন্যে, সেগুলো তোমাদের জন্যে বিশেষভাবে পালনীয়) যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ভঙ্গি অবলম্বন করে কথা বলো না, কারণ এর ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করবে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতার যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" –সূরা আহযাব ঃ ৩২–৩৩

সাহাবায়ে কেরামের মত পবিত্র হৃদয় এবং উম্মাহাতুল মুমিনের চাইতে স্বচ্ছ অন্তর আর কাদের হতে পারে ? এত স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয়েও যখন তারা পর্দার জন্যে নির্দেশিত হয়েছেন, তখন অন্যদের প্রতিও পর্দার নির্দেশ রয়েছে কি-না, সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

আরো ভেবে দেখার বিষয় এই যে, কোথায় আজকালকার পীর এবং তাদের মহিলা মুরীদরা আর কোথায় নিষ্পাপ নবী ও তাঁর সাহাবিয়াগণ ! এঁদের মাঝে কোন তুলনাই চলে না। মা'সূম নবী ও তাঁর মহিলা সাহাবীদের মাঝে যখন পর্দার বিধান ছিল, তখন এ যুগের পীর ও তার মহিলা মুরীদদের মাঝে যে পর্দা ফরয হবে, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ মহিলা সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান তুল্যই ছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لا والله، مامست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. رواه البخاري برقم ٤٨٩١، ومسلم برقم ٤٧٩٧.

'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! বাইআত গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কক্ষনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি মহিলাদেরকে শুধু এ কথার দ্বারাই বাইআত নিতেন যে, উক্ত বিষয়ে তোমার বাইআত নিলাম।' –সহীহ বুখারী ঃ ২/৭২৬,হাদীস ৪৮৯১, সহীহ মুসলিম ঃ ২/১৩১, হাদীস ৪৭৯৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে বাইআত নিতেন না। শুধু তাই নয়, বরং কথার মাধ্যমেও যে বাইআত নিতেন তাও ছিল পর্দার আড়াল থেকে। যার বিবরণ রয়েছে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমা (রহঃ) কর্তৃক উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে। –ফতহুল বারী ৮/৫০৫

মোটকথা, পর্দা একটি সর্বকালীন সার্বজনীন পালনীয় অকাট্য বিধান। শুধু এ বিধানের ব্যাপারেও যদি কেউ অবহেলা করে, তাহলে সে হক্কানী পীর হতে পারে না।

পীর-মুরীদীর আসল উদ্দেশ্য হল আত্মশুদ্ধি অর্জন। আর পর্দা রক্ষা করা আত্মার পবিত্রতা সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সুতরাং এ পর্দার বিধান অমান্য করে একজন মানুষ কোনক্রমেই আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারে না। এমন ব্যক্তি আবার কিভাবে অন্যের আত্মসংশোধনকারী হবে?

কাশ্‌ফ ও অলৌকিক প্রকাশ পাওয়া বুযুর্গীর আলামত নয়

আজকাল পীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো বহু অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। কুরআন হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম হক্কানী পীরের যেসব আলামত বর্ণনা করেছেন, অনেকে সেসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিবর্জিত বিভিন্ন আলামত আবিষ্কার করেছে।

যেমন ধরুন, কেউ এ আলামত নির্ধারণ করেছে যে, পীর সাহেবের কাশ্‌ফ হয় কি না? তাঁর দ্বারা 'খাওয়ারেকে আদত' (অলৌকিক কার্যকলাপ) প্রকাশ পায় কি না?

এদের ধারণা মতে, এ আলামতগুলো যার মধ্যেই পাওয়া যাবে শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী না হলেও সে বুযুর্গ। অধিকন্তু শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী হয়েও যদি কারো মধ্যে এ আলামতগুলো (কাশ্‌ফ ও অলৌকিক কিছু) বিদ্যমান না থাকে, তবে তিনি তাদের মতে বুযুর্গই নন। বুযুর্গ হওয়ার কোন যোগ্যতাই তিনি রাখেন না।

অথচ শুধু কাশ্‌ফ ও অলৌকিক কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া কারো ওলী হওয়ার দলীল নয়। আবার এগুলো না হলে ওলী হতে পারবে না, এমনও নয়। কুরআন-হাদীসে ওলীর মানদণ্ড হল ঈমান ও তাকওয়া বা শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ। কোন কাশফ ও কারামতকে কুরআন-হাদীসে ওলীর মাপকাঠি রাখা হয়নি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ، ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে–তাদের জন্যে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। মহান আল্লাহর কথা কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।" –সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেযগার বা খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।" –সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

প্রথমোক্ত আয়াতে ওলীর মাপকাঠি ঈমান ও তাকওয়াকে নির্ণয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতেও বুযুর্গ ও ওলী হওয়ার মাপকাঠি তাকওয়াকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজেই যেব্যক্তি ঈমানে যত বড় মযবূত, যার মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতির গুণ যত বেশী শক্তিশালী, সে ব্যক্তি হবে তত বড় আল্লাহর ওলী।

এখন জানার বিষয় হল ঈমান কি জিনিস ? ঈমানের শাখা ও বিভাগ কি কি ? ঈমানের দাবী কি ? তাকওয়া কাকে বলে ? এর দাবী কি ? কুরআন-হাদীস এ সবের বিবরণে পরিপূর্ণ।

আপনি সবকিছু পড়ে দেখুন, কোথাও এ কথা কস্মিনকালেও পাবেন না যে, কাশ্‌ফ ও অলৌকিকতা ঈমান ও তাকওয়ার শাখা, বরং কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ের জবাব আসবে নেতিবাচক।

সহীহ বুখারী হাদীস (৩৩৫৩)-এ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচাইতে বুযুর্গ–সম্মানিত কোন ব্যক্তি ? উত্তরে বললেন, যে সবচাইতে বেশী মুত্তাকী।"

মুসনাদে আহমাদ (হাদীস ২২৯৭৮ সহ) অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণিত হয়েছে , তিনি ইরশাদ করেন ঃ

لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣:٥٨٦: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

"আরববাসীর কোন শ্রেষ্ঠত্বই নেই অনারবের উপর, এমনিভাবে অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীর উপর। কৃষ্ণাঙ্গের কোনই ফযীলত নেই শ্বেতাঙ্গের উপর, এমনিভাবে শ্বেতাঙ্গেরও কোন ফযীলত নেই কৃষ্ণাঙ্গের উপর। তবে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)-এর ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য নিরূপিত হবে।"

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি একমাত্র তাকওয়াকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। ওলী ও বুযুর্গের মাপকাঠি শুধু ঈমান ও তাকওয়া। এ বিষয়ে শরীয়তের অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সবগুলোর উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কুদরতে বুযুর্গদের নিকট কখনো গায়েবের বিষয় কাশফ (প্রকাশ) হয়। মাঝে মধ্যে তাঁদের কাছে অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন বিষয়াবলী প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে সেগুলো কখনো শরীয়তের দলীল নয়, এর ভিত্তিতে কোন বিধিবিধান জারী করা যায় না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলারই কুদরতে কখনো কখনো বুযুর্গদের হাতে খ্যাওয়ারেকে আদত (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশ পায়। এসবকে বুযুর্গীর বিশেষ সুফল বলা যায়, কামালিয়াতের (পরিপূর্ণতার) দলীল বলার কোন সুযোগ নেই।

এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা শুধু অলৌকিক কিছু দেখে ভক্ত হয়ে যায়। অথচ অলৌকিক কার্যাদি যাদু ও মিসমীরিযমের মাধ্যমেও হতে পারে। এমনিভাবে যোগীদের ন্যায় সাধনাবলে অর্জিত যোগ্যতা হাছিলের মাধ্যমেও হতে পারে। কাফের, বদদ্বীনের হাতেও ইস্তিদরাজ স্বরূপ এসব কার্যাদি প্রকাশ পেতে পারে। অভিশপ্ত দাজ্জালের হাতেও এসব অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কীর্তিকলাপ

প্রকাশ পাবে। তাই অলৌকিক কিছু দেখলেই কোন যাচাই বাছাই না করে সেগুলোকে কারামত বলা কুফরীও হওয়ার আশংকা আছে।

কারামত ঐ সকল অস্বাভাবিক অলৌকিক কাজকে বলা হয়, যেগুলো একজন ধর্মভীরু, শরীয়তের পাবন্দ এবং সুন্নাতের অনুসারী বুযুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যখন খাওয়ারেক (অস্বাভাবিক কার্যাদি) কারামত হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্যে উক্ত ব্যক্তিকে শরীয়তের পাবন্দ, সুন্নাতের অনুসারী বুযুর্গ হতে হয়, সেখানে সে অলৌকিক, অস্বাভাবিক কার্যাদি কিভাবে বুযুর্গ হওয়ার দলীল হতে পারে?[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্যোপলব্ধির তাওফীক দিন এবং সর্বপ্রকার ধোঁকাবাযী থেকে নিরাপদ রাখুন।

বিখ্যাত বুযুর্গ আবূ ইয়াযীদ বিস্তামী (রহঃ, লোকমুখে যিনি বায়েজিদ বোস্তামী নামে প্রসিদ্ধ) বলেন, 'তোমরা যদি কারো হাতে অলৌকিক কার্যাবলী প্রকাশ পেতে দেখ, এমনকি যদি তাকে আকাশে উড়তেও দেখ, তবু প্রতারিত হয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাচাই করে না দেখবে যে, সে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, শরয়ী সীমা সংরক্ষণ, শরীয়তের পাবন্দী এবং শরীয়তের অনুসরণ অনুকরণে সে কেমন?"

—সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১০/৪৮৪, তালীমুদ্দীনঃ ১৪৩

ভালভাবে বুঝতে হবে। মানুষ এ ব্যাপারে বিরাট ভুলে নিপতিত আছে। আবূ ইয়াযীদ বিস্তামী (রহঃ) যে কথাটি বলেছেন, এতে আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। কুরআন-হাদীসের নির্দেশও তাই।

অনেকে আবার ওলীর মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে—রূহানী তাওয়াজ্জুহ দিয়ে বা তাসাররুফ করে হাজত পুরো করে দেওয়া, অন্তর জারী করা, স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেওয়া। অথচ ওলী হওয়ার সাথে রূহানী তাওয়াজ্জুহ বা তাসাররুফের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। কুরআন-হাদীসের কোথাও তাসাররুফের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। আর একে ওলী হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

---

১. আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৯–১২, তারবিয়াতুস সালেক ঃ ১/৫৮৮-৫৯১, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১১/২৭৩–৩০২, ৩১১–৩৬২, ফাতহুল বারী ঃ আন-নিবরাস শরহু শরহিল আকাইদ ঃ ৫৭৫–৫৭৬, মাকতূবাতে শাইখুল ইসলাম মাদানীঃ ৩/২৪১-২৪২

এ কথা তো প্রত্যক্ষ প্রমাণিত যে, তাসাররুফ প্রকাশের জন্যে মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়, বরং অমুসলমানরাও সাধনা বলে এ সবের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। হিন্দু যোগীদের এ প্রকার অলৌকিক অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের হেদায়াত ও ইসলাহে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি উম্মতের দিক নির্দেশনা ও সংশোধনের জন্যে দাওয়াত-তাবলীগ, তালীম-তালকীন, তাযকিয়া-তরবিয়ত ও দু'আর পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথই ছিল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আউলিয়ায়ে কেরামের পথ।

যাহোক, তাসাররুফ ঈমানেরও কোন শাখা নয়, তাকওয়ারও কোন শাখা নয়। সুতরাং তাসাররুফ ওলী হওয়ার কোন মাপকাঠি হতে পারে না। তাই ঈমান ও তাকওয়া ব্যতীত শুধু তাসাররুফ কখনো ওলী হওয়ার দলীল হতে পারে না।[১]

অনেকে আবার ওলী হওয়ার আরো কতিপয় মাপকাঠি নির্ধারণ করে রেখেছে। তাদের মতে খুবই কার্যকরী ঝাড়ফুঁক বা অন্যান্য ক্রিয়াশীল তাবীয দিতে পারাই ওলী হওয়ার মাপকাঠি। অথচ এগুলোরও বুযুর্গীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হযরত থানভী (রহঃ) এ ব্যাপারে বলেনঃ

'তাবীয প্রদানকারীর বুযুর্গীর কারণে তাবীযে ফায়েদা হয় না, বরং যার কল্পনা শক্তি (قوة خيالية) প্রবল তার তাবীযে কাজ করে বেশী। এমনকি কারো কল্পনা শক্তি যদি অত্যন্ত প্রখর হয়, তাহলে তার কল্পনার সাথে সাথেই জ্বর, মাথা ব্যথা সব দূর হয়ে যায়। যদিও সে কাফেরই হোক না কেন। কারণ তার মধ্যেও কল্পনা শক্তি রয়েছে। আর অনুশীলনের মাধ্যমে কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কোন কোন স্বভাবের সাথে এগুলোর নিবিড় সম্পর্ক থাকে।'–কামালাতে আশরাফিয়াঃ ২৮৩

তিনি অন্যত্র বলেন, 'তাবীযের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এজন্যে তাবীয দিতে মন চায় না। যেমন কোন কোন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি বস্তুতে একটি শক্তি রয়েছে যা প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। এমনকি (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলারও সে শক্তি ও ক্রিয়ার বিপরীত করার ক্ষমতা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, আগুনের মধ্যে জ্বালানোর ক্ষমতা দেওয়া আছে। এমন হতে পারে না যে, আগুন জ্বালাবে না। অথচ এরূপ আকীদা রাখা সরাসরি কুফরী।

তেমনি তাবীযের ব্যাপারে সাধারণ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস তাই। তারা মনে করে যে, যখন তাবীয বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তখন উদ্দেশ্য হাছিল না হয়ে উপায় নেই। যদি মাকসূদ হাছিল নাও হয়, তখনও এরূপ ভাবে না যে, তাবীযে কাজ করেনি। বরং মনে করে যে, শর্তের মাঝে কোথাও ত্রুটি রয়েছে। আমি তো মানুষকে তাবীয দিয়ে আল্লাহর নিকট কামিয়াবীর জন্যে দু'আ করে থাকি।

---

১. - কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ৬৫, ১৭৩, ১৭৫

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের এ নিয়ম ছিল যে, মানুষের ইসলাহের জন্যে (দাওয়াতের সাথে সাথে দু'আর মাধ্যমে) আল্লাহ মুখী হতেন। তাঁরা লোকদেরকে নিজের দিকে ধাবিত করার জন্যে তাদের অন্তরে তাসাররুফ করতেন না অথবা কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ করতেন না। পক্ষান্তরে, আমেল তথা তাবীয-তুমার প্রদানকারীরা এমনভাবে তাওয়াজ্জুহ ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকে, যেন নিজেই রোগীর রোগ বের করে দিচ্ছে।' –কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ১৫৪

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ সন্ধানীদের জন্যে আমালিয়াতের (তাবীয-তুমারের পেশা) পথ ধরা শোভনীয় নয়। তবে সকল জায়েয প্রয়োজনের জন্যে দু'আ করা সুন্নাত ও উপকারী।' –কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ২৬৪

সুতরাং, যখন এ আমালিয়াত ও তাবীয-তুমার কোন প্রশংসনীয় বস্তু নয়, তখন এগুলোতে পূর্ণতা লাভ করা কিভাবে ওলী হওয়ার দলীল হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

ফলকথা, কুরআন হাদীসের আলোকে হক্কানী পীর (যার হাতে বাইআত হওয়া, যার সংশ্রব অবলম্বন করা এবং ইসলাহের জন্যে যার দরবারে যাওয়া শরীয়তে কাম্য)-এর আলামতসমূহ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো মনোযোগের সাথে বার বার পড়া এবং সে মোতাবেক আমল করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন!

৩. গোনাহ বর্জন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের পরিবর্তে যিকির ও নফলসমূহকে আসল মনে করা

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে একথা সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মূল বিষয় হচ্ছে ফরয ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে পালন করা ; গোনাহ পরিহার করা এবং নফসের ইসলাহ করা। এ তিনটি বিষয়ের জুড়ি নেই। বেশী বেশী যিকির ও নফল আদায় করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হওয়া সত্ত্বেও, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের আমল।

পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ে অবহেলা করে পরবর্তীগুলো অধিক পরিমাণে আদায় করা অথবা এগুলোকেই আসল মনে করা মারাত্মক ভুল।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, 'মুরীদের মধ্যে আমলের সংশোধন স্পৃহা সৃষ্টি করার পূর্বে অত্যধিক যিকির ও শোগলে লাগিয়ে দেওয়া প্রায়ই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কেননা, সে এরপর নিজেকে বুযুর্গ মনে করতে শুরু করে। বিশেষ করে যখন যিকির শোগলের এক পর্যায়ে একাগ্রতা হাছিল হয়ে 'কাইফিয়াত' বা বিশেষ অবস্থাদি সৃষ্টি হতে শুরু করে, তখন তার মনে হয় যেন

বুযুর্গী তার জন্যে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। অথচ এ প্রকারের কাইফিয়াত বা বিশেষ অবস্থার সাথে বুযুর্গীর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রকৃতির অবস্থাদি কিছু সাধনা ও চর্চার মাধ্যমে ফাসেক-ফুজ্জার, গোনাহগার-বদদ্বীন এমনকি কাফেরের পর্যন্ত হাছিল হয়ে থাকে। যখন উক্ত ব্যক্তি সে কাইফিয়াতকে বুযুর্গী মনে করে নেয়, তখন সে আর আত্মশুদ্ধি এবং আমলের ইসলাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, এদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। ফলে সর্বদা সে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার নেয়ামত থেকে চিরবঞ্চিত থাকে; যে নেয়ামত অর্জনের পথ কুরআন-হাদীসে একমাত্র আমলের সংশোধনকেই বলা হয়েছে।'[১]

নিম্নে এ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীস অনুবাদসহ উল্লেখ করছি, যাতে পূর্বোক্ত বর্ণনার গুরুত্ব অনুধাবিত হয়।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ.

"তোমরা যাহেরী ও বাতেনী (অর্থাৎ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার) গোনাহ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃত কর্মের শাস্তি পাবে।"–সূরা আনয়াম ঃ ১২০

সহীহ বুখারীতে (হাদীস ৬৫০২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.

'(আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,) আমার বান্দা ফরয আদায়ের চাইতে অধিক প্রিয় কোন বস্তু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে তিরমিযীতে (হাদীস ২৩০৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اتق المحارم تكن أعبد الناس.[٢]

"হারাম (কথা-কাজ ও বস্তুসমূহ) পরিহার কর, তাহলে সবচাইতে বড় ইবাদতকারী হয়ে যাবে।"

হযরত সাওবান (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. – আশরাফুস সাওয়ানেহ-বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ৫৬

٢. رواه بنحوه أحمد برقم ٨٠٣٤، وابن ماجه ص ٣١١ في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، والحديث حسن بمجموع الطريقين.

ইরশাদ করেছেন ঃ

لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز و جل هباء منثورا، قال ثوبان: يا رسول الله ! صفهم لنا، جَلِّهِمْ لنا، أن لانكون منهم ، ونحن لانعلم، قال:أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهى. رواه ابن ماجه ص ٣١٣، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، وإسناده لا بأس به.

"আমি স্বীয় উম্মতের অনেকের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানি, যারা কিয়ামত দিবসে মক্কার পাহাড়সম উজ্জ্বল পুণ্য নিয়ে উঠবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে (পাহাড়সম) পুণ্যকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় গণ্য করবেন। হযরত সাওবান (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন, যাতে আমরা অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই গোত্রভুক্ত। তারাও তোমাদের ন্যায় রাত্রিকালীন ইবাদতে অভ্যস্ত। কিন্তু তারা এমন লোক যে, যখন আল্লাহ তা'আলার মাহারেম (হারাম কর্ম-কথা-বস্তু) এর সুযোগ পায় তখন তাতে লিপ্ত হয়।"

–সুনানে ইবনে মাজা ঃ ৩১৩

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছেন ঃ إياك والمعصية! فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل "সাবধান! গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গোনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।" –মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদীস ২১৫৭০ (وإسناده صالح)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون. قال الترمذي :حديث حسن صحيح.

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গোনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি সে কৃত গোনাহ্ থেকে তাওবা করে, তা পরিহার করে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার অন্তরের কালো দাগ মুছে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের পর তাওবা ইস্তিগফারের পরিবর্তে আরো গোনাহ্ করতে থাকে, তাহলে অন্তরের কালিমা বৃদ্ধি পেয়ে অন্তর ছেয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা ঐ কালিমা ও মরিচা, যার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে উল্লেখ করেছেন ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ কখনো না, তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" –মুসনাদে আহমাদঃ হাদীস ৭৮৯২, জামে তিরমিযী ঃ হাদীস ৩৩৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ ৩১৩

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ

ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل بالرعة. رواه الترمذي برقم ٢٥١٩ وقال: حسن غريب.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তির কথা আলোচনা হল যে, সে ইবাদত-বন্দেগীতে খুব তৎপর। অপর আরেক ব্যক্তির প্রসঙ্গ এল, যার মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী আছে। অর্থাৎ, গোনাহ্ পরিহার করার ব্যাপারে সে খুব সতর্ক –তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবাদত তাকওয়ার সমান হবে না।" –তিরমিযী ঃ ২/৭৮, হাদীস ২৫১৯

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ

أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان: الفم والفرج، وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. رواه أحمد برقم ٨٨٥٢ و ٩٤٠٣ و ابن ماجه ص ٣١٣، ولا بأس بإسناده .

"যে কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তা হল মুখ ও লজ্জাস্থান। আর যে কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে তা হল তাকওয়া (খোদাভীতি, গোনাহ্ হতে বেঁচে থাকা) ও সচ্চরিত্র।"

–মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ৮৮৫২, ৯৪০৩, ইবনে মাজাহ ঃ ৩১৩

হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولايدخل رجل الجنة لايأمن جاره بوائقه. رواه أحمد برقم ١٢٦٣٦، وإسناده صالح.

"অন্তর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোন বান্দার ঈমান ঠিক হবে না এবং মুখ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অন্তর ঠিক হবে না। আর এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়।" –মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ১২৬৩৬

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসখানা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও অনুরূপ সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কিছু বস্তু আছে যেগুলো মুশ্‌তাবেহ (সন্দেহজনক)। সেগুলোর হুকুম অনেকেই জানে না। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকবে, সে স্বীয় দ্বীন ও ইযযত-আবরুকে হেফাযত করতে পারবে। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হবে, সে ক্রমশঃ হারামে পতিত হবে। যেমন একজন রাখাল সরকারী সংরক্ষিত এলাকার খুবই নিকটে পশু চরায়। অতি শীঘ্রই সে উক্ত সংরক্ষিত চারণভূমিতে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো! প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে (যার মধ্যে তার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা অন্যায়)। আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে মাহারেম (হারাম কার্যাবলী)। কাজেই মানুষের উচিত তার নিকটেও না যাওয়া। অর্থাৎ, সন্দেহজনক কাজগুলো হতে বিরত থাকা)। শুনে রেখো! দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক, তা খারাপ হয়ে গেলে পুরো শরীরটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখো! সে টুকরাটি হচ্ছে কলব।" –সহীহ বুখারী ঃ ১/১৩, হাদীস ৫২, সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৮, হাদীস ৩৯৭৩

বস্তুত: আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি লাভে গোনাহ বর্জন এবং ইসলাহে নফস দু'টি বস্তুই আসল এবং প্রথম পর্বের কার্যকরী বস্তু। এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ উপরে মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

গোনাহ বর্জন ও আত্মশুদ্ধিই যে সবচাইতে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদেও অগণিত আয়াত রয়েছে। শুধু তাকওয়া বিষয়ক আয়াতের সংখ্যাই একশতের উর্ধ্বে। এসব আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনে উৎসাহ, তাকওয়ার ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর তাকওয়া হল আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং গোনাহ বর্জনের নাম।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, যিকির ও নফলের কোন গুরুত্বই নেই। বরং উদ্দেশ্য হল, যিকির ও নফলের চাইতে গোনাহ্ বর্জন, ইসলাহে নফ্স এবং আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনের অধিক গুরুত্ব বুঝানো। তবে এগুলোর সাথে সাথে যদি যিকির ও নফলের ব্যাপারেও তৎপর হয়, তাহলে তা হবে সোনায় সোহাগা। তাছাড়া যিকর ও নফলের বরকতে আত্মশুদ্ধি এবং গোনাহ্ বর্জন করা সহজতর হয়। গোনাহ্ বর্জন ও ইসলাহে নফ্সের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে যিকির-শোগল বা নফল আদায় করেই নিজেকে বুযুর্গ মনে করা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত কথাটি কতইনা সুন্দর! তিনি বলেছেন, "কিছু লোক انا جليس من ذكرني 'আমাকে যে স্মরণ করে আমি তার সাথী' এ বাণী দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকে যে, ইসলাহের জন্যে শুধু যিকির-আযকারই যথেষ্ট। কেননা, যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাছিল হয়। আর নৈকট্য অর্জনের ফলে গোনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং, অন্যান্য তদবীরের কোন প্রয়োজনই নেই" অথচ এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, ذكرني (আমাকে স্মরণ করেছে)-এর মাঝেই ইসলাহের তদবীর (সংশোধনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা) অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরা, এছাড়া যিকিরই হয় না। বলা হবে না যে, সে যিকির করেছে।

কারণ ذكر মানে স্মরণ করা। শুধু মুখে নাম জপাকে 'স্মরণ করা' বলা হয় না, বরং আসল যিকির হল সামগ্রিকভাবে স্মরণ করার নাম। এ কেমন স্মরণ হল! যাকে স্মরণ করার দাবী করা হচ্ছে, তার সাথে কথা বলল না, তার চিঠির উত্তরও দিল না, তার সঙ্গে সাক্ষাতও করল না; সর্বোপরি তার কথাও মানল না। এটা কক্ষনো স্মরণ হতে পারে না। সুতরাং, ইসলাহ ব্যতীত যিকির এ প্রকৃতির স্মরণের পর্যায়েই পড়বে।"—কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ২৯২-২৯৩

৪. লেনদেন পরিষ্কার না রাখা, হারাম ভক্ষণ করা এবং সন্দেহজনক বিষয় বর্জনে যত্নবান না হওয়া

বেচাকেনা ও লেনদেন পরিষ্কার রাখা, হালাল খাওয়া এবং হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু হতে দূরে থাকা দ্বীনের একটি বিরাট হুকুম এবং অন্যতম ফরয। আমল ও নফ্সের ইসলাহের ব্যাপারে এগুলো খুবই ফলপ্রসূ। কিন্তু মানুষের অবহেলাও এ ব্যাপারে বেশী। অনেক সাধারণ মানুষ তো এগুলোকে দ্বীন বহির্ভূতই মনে করে থাকে। তারা নামায-রোযা সম্পর্কে সামান্য হলেও উলামায়ে কেরামের কাছে জানতে আসে। কিন্তু লেনদেনের ব্যাপারে শরীয়তের কোন বিধান তাঁদের নিকট জানতে আসে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যারা পীর-মুরীদীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তারাও আজকাল উপরোক্ত বিষয়াবলীতে অবহেলা করছে। তারা নিজেরাও লেনদেন পরিষ্কার রাখতে যত্নবান হচ্ছে না। আবার হাদিয়া তোহফাও বাছবিচার ছাড়াই গ্রহণ করছে। এমনকি, সুদখোর-ঘুষখোরদের নযরানাও গ্রহণ করছে নির্দ্ধিধায়। অথচ পীর-মুরীদীর বুনিয়াদী ও প্রাথমিক সবকের একটি হল রিযিক হালাল হওয়া, হারাম ও সংশয়পূর্ণ বিষয় পরিহার করা।

সুফিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, আমল ও কলবের ইস্লাহের জন্যে সবচাইতে বেশী উপকারী জিনিস হল–হালাল রুযী গ্রহণ করা। কেননা, হালাল খাদ্য অন্তরকে আলোকিত করে, মনকে পরিশোধন করে। এর প্রভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পুত-পবিত্র হয়ে সকল ময়লা-আবর্জনা মুক্ত হয়ে যায়, আমল ও আখলাকের সংশোধন হাছিল হয়। পক্ষান্তরে হারাম এবং সংশয়পূর্ণ বিষয়ে লিপ্ততা অন্তরকে অন্ধকার, মরিচাময় ও কঠিন করে তোলে। তাই সালেকের যেসব কাজের প্রতি যত্নবান হতে হয়, তন্মধ্যে খাদ্য হালাল হওয়া এবং হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা অন্যতম। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।[১]

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিধানাবলী (অর্থাৎ লেনদেন পরিষ্কার রাখা, হালাল রুযী গ্রহণ করা, হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা) শুধু পীর-মুরীদীর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই সেগুলো ফরয।

---

১. আল-ফুতূহাতুর রাব্বানিয়া ঃ ৭/৩০৭, রিসালাতুল মুসতারশিদীন–এর টীকা পৃষ্ঠা–২১৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ৩/২৭২, সূরা মুমিনূন ঃ আয়াত–৫১, সারাখসী (রহঃ) রচিত মাবসূত ঃ ৩০/২৮২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.

"হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা পূত-পবিত্র, তিনি পাক বস্তুই কবূল করে থাকেন। তিনি এ ব্যাপারে পয়গাম্বরদেরকে যে বিধান দিয়েছেন, ঠিক সে নির্দেশই মুমিন বান্দাদেরকে দিয়েছেন। পয়গাম্বরদের উদ্দেশ্যে তিনি ইরশাদ করেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা আমার দেওয়া পাক, হালাল খাবার গ্রহণ কর এবং নেক কাজ কর, তোমরা যা কর আমি সে বিষয়ে অবহিত।'

এবং (মুমিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে) বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল রুযী আহার কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে, তার অবস্থা এমন যে, চুল বিক্ষিপ্ত, দেহ-বসন ধূলিমাখা। সে আকাশের দিকে দু'হাত উঁচু করে দু'আ করছে 'হে প্রভু! হে আমার পালনকর্তা. . .! অথচ তার রুযী হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম। হারাম আহারের মধ্য দিয়ে সে প্রতিপালিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দু'আ কিভাবে কবূল হবে!" –সহীহ মুসলিম ঃ ১/৩২৬

মুসনাদে আহমদ (হাদীস ১৪৮৬০), জামে তিরমিযী (হাদীস ৬১৪)–এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত আছে ঃ

إنه لايدخل الجنة لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. قال الترمذي: حديث حسن انتهى وإسناد أحمد على شرط الصحيح.

"ঐ গোশত (শরীর) যা হারাম মাল দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لايدخل الجنة جسد غذي بحرام. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٢٥، وقال: رواه أبو يعلى والبزار و الطبراني في الأوسط والبيهقي، وبعض أسانيدهم حسن.

"হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

–আবূ ইয়ালা, বায্যার, তবরানী ও বায়হাকী-আত্তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ ৪/২৫

হযরত আবূ বারযা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي برقم ٢٤١٧، وقال: حسن صحيح.

"কিয়ামতের দিন (যখন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করা হবে তখন) বান্দার পা স্বস্থান হতে নড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্ন না করা হবে, তার জীবন সম্পর্কে–কোথায় কি কাজে শেষ করেছে; তার ইলম সম্বন্ধে, যতটুকু জানা ছিল সে মোতাবেক কতটুকু আমল করেছে; তার সম্পদের ব্যাপারে, কোত্থেকে কিভাবে অর্জন করেছে অতঃপর কি কাজে, কোন পথে ব্যয় করেছে? এবং তার শরীর নিয়ে প্রশ্ন হবে, কোন কাজে কি ব্যস্ততায় ক্ষয় করেছে?"

–জামে তিরমিযীঃ হাদীস ২৪১৭

এ বিষয়ের সব হাদীস উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে সতর্ক ও ইঙ্গিত প্রদানই মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ ভ্রান্তিতে নিপতিত যে, এ যুগে হালাল খাদ্য পাওয়া যায় না। হালাল উপার্জন বর্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল এবং শয়তানী ধোঁকা মাত্র। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মাঝে হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু বর্জনের ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি করা। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। অবস্থা যতই খারাপ হোক, যুগ যতই পরিবর্তিত হতে থাকুক, হালাল, হারাম ও সন্দেহজনক–এ তিন প্রকার বস্তু অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে।[১] কিন্তু তার জন্যে হালাল, হারাম ও লেনদেনের ব্যাপারে শরীয়তের

১. - ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ঃ ২/১২৮, রিসালাতুল হালালে ওয়াল হারাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ): ১১-১৬

বিধানাবলীর জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। আপনি যেমন তালাক ও পৈত্রিক সম্পত্তি বন্টনের মাসআলার ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরামের কাছে যান, তেমনি উপরোক্ত মাসআলার ব্যাপারেও হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও মুফতী সাহেবদের খেদমতে যাবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, এ যুগেও হালাল বস্তু বিদ্যমান আছে এবং হালাল উপার্জন সম্ভব।

৫. বান্দার হক ও সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া

শাইখ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী মূলতঃ হকসমূহ যথাযথ ভাবে পালন করার নাম হচ্ছে দ্বীন।[১]

হক দু'প্রকার। যথাঃ হক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ। এ দু'য়ের সমষ্টিকে একত্রে হুকূকুল ইসলাম বলা যায়। এ নামে (হুকূকুল ইসলাম) হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর একটি সুন্দর পুস্তিকাও রয়েছে।

হক্কুল্লাহর সম্পর্ক যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সাথে, এজন্যে এটি যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হক্কুল ইবাদ (যার মাঝে সামাজিক শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের দিকটি মুখ্য) এ হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি লংঘিত হলে বান্দার হকও নষ্ট হয় এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার হুকুমেরও বিরোধিতা হয়। এর চাইতে বড় যে দিকটি এখানে লক্ষ্যণীয়, তা হল বান্দার হক তাওবার দ্বারাও মাফ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মাফ না করবে।

হক্কুল ইবাদের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি খেয়াল খুব কমই দেওয়া হয়। মানুষ এটাকে দ্বীনের কাজই মনে করে না। তথাকথিত অনেক দ্বীনদার প্রকৃতির লোককে দেখা যায়, তারা ইবাদতের ব্যাপারে খুব তৎপর, কিন্তু দ্বীনের এ অংশের প্রতি একেবারে উদাসীন।

অথচ কুরআন-হাদীসের বহু জায়গায় হক্কুল ইবাদ যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে এবং সামাজিক শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাছাড়া হক্কুল ইবাদের ব্যাপারে ঔদাসিন্য প্রদর্শনের প্রতি কঠিন আযাবের সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من

১.– আল বালাগ ঃ আরেফী সংখ্যা ২৩৯

أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه النسائي برقم ٤٩٩٥ والترمذي ٢٦٢٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

"মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে এবং মুমিন ঐ ব্যক্তি, যাকে লোকেরা স্বীয় জান-মালের ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করে।"–সুনানে নাসায়ী ঃ হাদীস ৪৯৯৫, জামে তিরমিযী ঃ হাদীস ২৬২৭

আবূ শুরাইহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

والله لايؤمن، والله لايؤمن، والله لايؤمن، قيل: ومن يارسول الله؟ قال: الذي لايأمن جاره بوائقه. رواه البخاري برقم ٦٠١٦.

"আল্লাহ তা'আলার শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ তা'আলার শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ তা'আলার শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে ? ইরশাদ হল, সে ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"–সহীহ বুখারী ঃ হাদীস ৬০১৬

সুনানে আবূ দাঊদ, (হাদীস ৪৬৮২)-এ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود برقم ٤٦٨٢، وسكت عنه هو والمنذري بعده، وإسناده صالح لا بأس به.

"মুসলমানদের মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ ঈমানদার সে ব্যক্তি, যার আখলাক-চরিত্র সবচাইতে উত্তম।"–সুনানে আবূ দাঊদ ঃ হাদীস ৪৬৮২

ঈমানের পূর্ণতা সৎচরিত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, আখলাকে যে যত উন্নত হবে, তার ঈমানও হবে তত পরিপূর্ণ। অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায় যে, সৎচরিত্র ঈমান পূর্ণতার ফল স্বরূপ। অতএব যার ঈমান যত পরিপূর্ণ হবে, তার আখলাকও হবে তত উন্নত। এমন নয় যে, কোন ব্যক্তি ঈমানে পরিপূর্ণ, অথচ তার আখলাক-চরিত্র ঠিক নেই।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

---

১. –মাআরিফুল হাদীস ঃ ১/১৪৫

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود برقم ٤٧٨٨، وسكت عنه هو والمنذري بعده، وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، كما في «عون المعبود» ١٣: ١٠٧ عن الترغيب والترهيب للمنذري.

"নিশ্চয়ই একজন মুমিনব্যক্তি সৎচরিত্রের বদৌলতে একজন রোযাদার ও সারারাত্রি ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।"আবূ দাঊদ ঃ ২/৬৬১, হাদীস ৪৭৮৮

এর কারণ হল, একজন রোযাদার ও ইবাদতকারীর যতটুকু চেষ্টা-মুজাহাদা করতে হয়, মানুষের সাথে সদাচারীর জন্যে তার চাইতে অধিক মুজাহাদা ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কেননা, প্রতিটি মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। সে জন্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। তাই অসহ্যকর হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সাথে সদাচারে যত্নবান হওয়া অনেক মুজাহাদা ও সহনশীলতারই পরিচায়ক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

"মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই, তাকে যুলুম-নির্যাতন করে না, আবার অন্যের হাতে অত্যাচারিত হতে দেয় না। যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার প্রয়োজন মিটাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট-মুসীবত দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোন মুসীবত দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন করবেন।"

–সহীহ বুখারী ঃ ১/৩৩০, হাদীস ২৪৪২, সহীহ মুসলিম ঃ ২/৩২০, হাদীস ২৫৮০

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

قال رجل يارسول الله! إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، قال: يارسول الله! فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولاتؤذي بلسانها جيرانها، قال: هي في الجنة. رواه أحمد برقم ٩٣٨٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم ٩٥٤٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨: ٣٠٨ برقم ١٣٥٦٢: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات.

"এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলার ব্যাপারে বলা হয় যে, সে নফল নামায, নফল রোযা ও দান খয়রাত খুব বেশী করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলল, অমুক মহিলার ব্যাপারে বলা হয়, সে নফল নামায, নফল রোযা ও দান-খয়রাত খুব বেশী করে না, কয়েক টুকরা পনির দান করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখে কোন কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন, এ মহিলা জান্নাতী।"

-মুসনাদে আহমাদ ঃ ৩/১৮৪ হাদীস ৯৩৮৩, শুআবুল ঈমান ঃ ৭/৭৯ হাদীস ৯৫৪৬।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت

حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم، فطرح عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيحه ٢: ٣٢٠ والترمذي برقم ٢٤١٨ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح.

"তোমরা কি জান দরিদ্র কে ? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো দরিদ্র ঐ ব্যক্তিকে বলি, যার নিকট কোন অর্থকড়ি নেই, নেই কোন ধন-সম্পদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মাঝে দরিদ্র সে ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে স্বীয় নামায, রোযা ও যাকাতের ন্যায় নেক আমল নিয়ে আসবে। কিন্তু এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, সে দুনিয়াতে কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল, কাউকে প্রহার করেছিল। এখন সে সব হকদার ও পাওনাদারকে অত্যাচারের বিনিময়ে তার সাওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। যদি বিনিময় আদায়ের পূর্বে সাওয়াব শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারদের গোনাহ (পাওনা পরিমাণ) তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

–সহীহ মুসলিম ঃ ২/৩২০, হাদীস ২৫৮১, জামে তিরমিযী ঃ ২/৬৭, হাদীস ২৪১৮

এ হল বান্দার হক ও সামাজিক শিষ্টাচার লংঘণের করুণ পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন। বান্দার হক ও আল্লাহ তা'আলার হক যথাযথ আদায় করার তাওফীক দিন।

সামাজিক শিষ্টাচার তথা আদব-কায়দা, আচার-আচরণ জানার জন্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) রচিত 'আল-আদাবুল মুফ্রাদ' এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) লিখিত পুস্তিকা 'আদাবে মু'আশারাত' বার বার অধ্যয়ন করা উচিত।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর ভাষ্যানুযায়ী পুরো আদাবে মুআশারাতের সারকথা হল, নিজের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চলন দ্বারা কারো উপর চাপ সৃষ্টি না করা; কাউকে পেরেশান না করা অথবা কাউকে বিড়ম্বনায় না ফেলা। মোদ্দাকথা, কারো সামান্যতম কোনরূপ কষ্টের কারণ না হওয়া।

তিনি বলেন, এটাই হল হুসনে আখলাক তথা সৎচরিত্রের সারমর্ম। যে ব্যক্তি এ মৌলিক কথাটি অন্তরে জাগরুক রাখবে, তার আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। তবে হ্যাঁ, এর সাথে আরেকটি কাজ করতে হবে, তা হল প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাবতে হবে যে, আমার এ আচরণ (কথা বার্তা) কারো

কষ্টের কারণ হবে না তো ? এতটুকু করতে পারলে ভুল অনেক কমে যাবে। বরং কিছুদিন পর মন-মানসিকতায় সঠিক উপলব্ধি জাগ্রত হবে। তখন আর ভাবতে হবে না, এগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।[১]

৬. পীর-মুরীদীর মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন

হযরত থানভী (রহঃ) স্বীয় পুস্তিকা 'কাসদুস সাবীল' এ লিখেছেন, "কতক মানুষ এ উদ্দেশ্যে বাইআত হয় যে, পীর সাহেব তাবীয-কবযে খুব অভিজ্ঞ। তাই প্রয়োজনের সময় তার কাছ থেকে তাবীয-কবয নেওয়া যাবে অথবা পীর সাহেবের দু'আ কবূল হয়, ফলে মামলা-মুকাদ্দমা ইত্যাদিতে কামিয়াবীর জন্যে পীর সাহেব দ্বারা দু'আ করাবে আর সিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছা মাফিক হয়ে যাবে, যেন প্রভুত্ব পীর সাহেবের হাতের মুঠোয়!

কেউ আবার এ উদ্দেশ্যেও বাইআত হয় যে, আমি নিজে পীর সাহেবের থেকে এমন জিনিস শিক্ষা গ্রহণ করব, ফলে আমিও বরকতময় হয়ে যাব। আমি ঝাড়ফুঁক দিলে, হাত বুলিয়ে দিলে রোগী পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ এ প্রকৃতির লোকদের ধ্যান-ধারণায় বুযুর্গী হল আমালিয়্যাত তথা ঝাড়ফুঁক, তাবীয-কবয ইত্যাদির নাম। যেহেতু বুযুর্গীর সাথে এগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, এসব একমাত্র দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম, তাই এ ধরনের পীর-মুরীদী ফাসাদ বৈ কিছুই নয়।"[২]

ভেবে দেখার বিষয়! যে পীর-মুরীদীর মহান উদ্দেশ্য ছিল অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করতঃ তাতে আখেরাতের মহব্বত সৃষ্টি করা; অবশেষে সে পীর-মুরীদীকেই যদি দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানানো হয়, তাহলে তা পুরো বিষয়বস্তুকে পাল্টিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি!?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি কার না জানা আছে?

إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله ، و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

১.–আদাবে মুআশারাত–ইসলাহী নেসাব ঃ ৪৫৭

২.–বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১১১–১১২, কাসদুস সাবীল–ইসলাহী নেসাব ঃ ৫০৪

"সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত হিসেবেই ফল পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করল (অর্থাৎ কেবল আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হিজরত করল) সে মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দিকেই হিজরত করল। আর যে ব্যক্তি পার্থিব কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করল, তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যই ধরা হবে।"

–সহীহ বুখারী ঃ ১/১৩, হাদীস ৫৪, সহীহ মুসলিম ঃ ২/১৪০ হাদীস ১৫৫

বুঝা গেল কোন আমল সঠিক হওয়া না হওয়া এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ একটি সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হবে, যখন তা নেক নিয়তে করা হবে। পক্ষান্তরে যে সৎকর্মটি অসৎ উদ্দেশ্যে বা খারাপ নিয়তে করা হবে, তা সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হবে না, বরং নিয়ত মাফিক বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা সৎকর্ম বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা আমলের সাথে সাথে নিয়ত এবং যাহেরের সাথে সাথে বাতেনের প্রতিও লক্ষ্য করেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রতিটি আমলের মূল্যায়ন হয় ব্যক্তির নিয়ত অনুপাতে। তাঁর দরবারে সে আমলটিই কাজে আসবে, যা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। দ্বীনী পরিভাষায় একেই বলা হয় ইখলাস। এ ইখলাস প্রতিটি আমল কবূল হওয়ার পূর্ব শর্ত। অগণিত আয়াতে ও অসংখ্য হাদীসে ইখলাসের উপর জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং,পার্থিব উদ্দেশ্যে পীর-মুরীদীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুধু দুনিয়াই হাছিল হতে পারে। পীর-মুরীদীর যে আসল উদ্দেশ্য তথা আমল ও নফসের সংশোধন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন–তা কস্মিন কালেও ভাগ্যে জুটবে না।

৭. মসনূন যিকির এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের পরিবর্তে বুযুর্গদের ওযীফা এবং হাদীসে বর্ণিত নয় এমন দু'আসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া

এ ভুলের ব্যাখ্যায় পরে যাওয়া যাক। তার আগে এখানে যিকির ও দু'আর হাকীকত (তত্ত্ব) এবং হাদীসে বর্ণিত যিকির ও দু'আসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলছি। এ বিষয়ের উপর হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর জ্ঞানগর্ব, অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ রয়েছে, যা তিনি 'মাআরিফুল হাদীস' কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা হিসেবে লিখেছেন। তিনি লিখেন ঃ

"নবুওয়তে মুহাম্মাদীর অন্যতম অবদান হচ্ছে, আব্‌দ ও মা'বূদের (বান্দা ও আল্লাহর) মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করা এবং তার স্থায়িত্ব দান করা। যে সম্পর্ক নেহায়েত দুর্বল, নিষ্প্রাণ, ম্লান, অধঃমৃত, বরং মৃত, নির্জীব ও ম্রীয়মান ছায়ার ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। যার মাঝে ছিল না ইয়াকীন-বিশ্বাসের শক্তি, শৌর্য-বীর্য, ছিল না মহব্বতের উষ্ণতা। ছিল না আব্‌দ ও মা'বূদের মধ্যকার নির্জনতার সম্পর্ক। অবর্তমান ছিল অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা। অনুভূতিটুকুও ছিল না স্বীয় দরিদ্রতা, মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা ও নিঃসঙ্গতার। পাওয়া যেত না তাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার বদান্যতা, পূর্ণক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর গায়েবী ভাণ্ডারের বিপুলতার জ্ঞান। পুরো মিল্লাত ও উম্মতের সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে আল্লাহ তা'আলাকে শুধু বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, কঠিন মুসীবত ও পেরেশানীতেই স্মরণ করা এবং তাঁর নিকট দু'আ প্রার্থনা করার রেওয়াজ রয়ে গিয়েছিল।

ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝেও এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাত্র কয়েকজনই ছিলেন, যাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতেন, তাঁকে হাযের-নাযের মনে করতেন। তাঁদের সম্পর্ক এত প্রাণবন্ত ছিল যে, তাঁরা আল্লাহকেই সত্যিকারের কর্মসমাধাকারী, উদ্ধারকর্তা, সাহায্যকারী ও মুক্তিদাতা মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর তাঁদের ভরসা ও আস্থা এমন ছিল, যেমন একজন শিশুর আস্থা তার স্নেহময়ী মাতার উপর, কোন গোলামের আস্থা তার মনীবের উপর এবং শক্তিশালী বাদশাহের উপর থাকে।

নবুওয়তে মুহাম্মাদীর অবদান এই যে, সে উক্ত সম্পর্ককে কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে নিয়ে এসেছে, ছায়াকে আসল রূপদান করেছে। যা ছিল রেওয়াজ মাত্র, তাকে হাকীকতে পরিণত করেছে। জীবনে দু'চারবার অথবা কয়েক বছরে যে আমল মাঝে মধ্যে পালিত হত, নবুওয়তে মুহাম্মাদী তাকে সকাল-সন্ধ্যার ব্যস্ততা বানিয়েছে, করে দিয়েছে তাকে নিত্য পালনীয় কাজে, বরং একজন মুমিনের জন্যে পানি-বাতাসের ন্যায় অপরিহার্য বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে, যা ছাড়া জীবন বাঁচানো অসম্ভব। যাদের অবস্থা ছিল (لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا) 'তারা আল্লাহ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করত' (সূরা নিসাঃ ১৪২) তারাই নবুওয়তি ছোঁয়ায় এত উন্নতি লাভ করল যে, তাঁদেরই ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে ঃ (اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ) 'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।' –সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১

যারা শুধু কঠিন বিপদ-আপদের সময়ই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করায় অভ্যস্ত ছিল, وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ যখন তাদেরকে মেঘমালা সাদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে।' (সূরা লোকমান ঃ ৩২) তারাই আবার এমন হয়ে গেল যে, تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا 'তাঁদের পার্শ্ব শয্যা থেকে (রাতে) আলাদা থাকে। তাঁরা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়।' –সূরা সিজদা ঃ ১৬

আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা যাদের ছিল বিরাট মুজাহাদার ব্যাপার, সম্পূর্ণ স্বভাব বিরোধী। কুরআনের ভাষায়, তাদের অবস্থা ছিল كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ। 'যেন তারা আকাশে আরোহন করছে।' এখন উল্টো তাঁদের জন্যে আল্লাহ বিস্মৃতি এবং তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকা কঠিনতম মুজাহাদা এবং কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আযাব হয়ে দেখা দিয়েছে। আগে যারা যিকির-ইবাদতের পরিবেশে পিঞ্জীরার পাখির ন্যায় অস্থির ও ছটফট করত, এখন তারা যিকির ও দু'আয় বাধাগ্রস্থ হলে পানি বিহীন মাছের ন্যায় কাতরাতে থাকে।

আবদ্ ও মাবূদের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করার জন্যে এবং এ সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্যে নবুওয়তে মুহাম্মাদী যে মাধ্যম অবলম্বন করেছে, তার শিরোনাম দু'টি ঃ এক– যিকির, দুই– দু'আ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরের ব্যাপারে জোর তাগিদ করেছেন, তার ফাযায়েল ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন, তার হেকমত ও গোপন নিগুঢ়তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন। এসব কিছুর পর যিকির শুধু ফরয এবং আইনের বইয়ে রয়ে যায়নি, বরং জীবনের একটি বুনিয়াদী প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। মনুষ্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, আত্মার খোরাক এবং হৃদয়ের মহৌষধে পরিণত হয়েছে।

এসব যিকির এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, যদি যিকিরের প্রতি সামান্যতমও গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে পুরো জীবনটাই একটা ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ যিকিরে রূপান্তরিত হবে। কোন সময়, কোন কাজ, কোন অবস্থা যিকিরমুক্ত বা যিকিরবিহীন পাওয়া মুশকিল হবে।

যদিও ব্যাপক অর্থে সমস্ত নেক আমল যিকিরের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যিকিরের সবচাইতে বড় প্রকাশস্থল এবং উত্তম নমুনা হচ্ছে দু'আ। তবে নবুওয়তে মুহাম্মাদী এ দু'আকে দ্বীনের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দ্বীন-ধর্ম, নবুওয়ত, রূহানিয়াতের বিশাল ইতিহাস সামনে রেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে,

নবুওয়তে মুহাম্মাদী দু'আর শাখা ও বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এতে এনেছে সংস্কার ও সঞ্জীবনী শক্তি, করেছে উন্নতি ও পূর্ণতা দান। নবুওয়তে মুহাম্মাদী এ দু'আর যে প্রাণ, শক্তি, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, আকর্ষণ, প্রফুল্লতা ও সক্ষমতা দান করেছে, তার বিরল দৃষ্টান্ত এর আগে কোন যুগেই পাওয়া যায় না।

নবুওয়তে মুহাম্মাদী যে সব বস্তুর খতমকারী ও পূর্ণতাদানকারী দু'আর বিভাগটি তারই অন্তর্ভুক্ত। এ বিভাগটিও তাঁর খতমে নবুওয়তের একটি দলীল এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বঞ্চিত, নিঃগৃহীত মানবতাকে দ্বিতীয়বারের মত দু'আর দৌলত প্রদান করলেন। **বান্দাকে তার প্রভুর সাথে কথোপকথনের সুবর্ণ সুযোগ করে দিলেন। দু'আর দৌলতই নয় শুধু, বরং পুরো জীবনের আনন্দ, স্বাদ, তৃপ্তি ও ইযযত-সম্মান দান করেছেন। নিঃগৃহীত ও উপেক্ষিত মানবতা পুনরায় প্রভুতুষ্টির অনুমতি পেল। প্রভু দরবার থেকে ভেগে যাওয়া এবং পলাতক আদম সন্তান আবার স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, মুনীবের আশ্রয় স্থলে এই বলতে বলতে ফিরে আসল ঃ**

بنده آمد بردرت بگریخته × آبروئے خود به عصیان ریخته

'গোনাহের কারণে স্বীয় ইযযত-আবরু মিটিয়ে দিয়ে আমি ক্রন্দনরত গোলাম তোমার দরবারে উপস্থিত।'

নবুওয়তে মুহাম্মাদীর সংস্কার এবং তার কর্মপূর্ণতা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তিনি আমাদেরকে দু'আ করতেও শিখিয়েছেন। তিনি মানবতার ভাণ্ডারকে, পৃথিবীর সাহিত্যেকে দু'আর এমন সব মনি-মুক্তা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার নযীর আস্‌মানী কিতাবের পর কোথাও পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট এমন বাক্যে দু'আ করেছেন, যার চাইতে অধিক ক্রিয়াশীল এবং বাগ্মী শব্দ, যার চাইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত শব্দ কোন মানুষ দেখাতে পারবে না। এসব দু'আও স্বতন্ত্র মু'জিযা এবং নবুওয়তের দলীল। এসব দু'আর শব্দাবলীই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এগুলো কোন একজন নবীর মুখ থেকেই উচ্চারিত। এগুলোতে আছে নবুওয়তের নূর, নবীর ইয়াকীন, পরিপূর্ণ বান্দার আকুতি, প্রেমের আধার বিশ্ব অধিপতির উপর পূর্ণ আস্থা, তাঁর ভালোবাসার গৌরব, নবুওয়তি প্রকৃতির নিষ্পাপতা, সরলতা,ব্যথিত ও ব্যাকুলপারা হৃদয়ের কাকুতি মিনতি। রয়েছে একজন মুখাপেক্ষী ব্যক্তির বারংবার কামনা, প্রভু দরবারে আদব রক্ষাকারীর সতর্কতা, অন্তরের আঘাত ও ব্যথার জ্বলন। মুশকিলকুশা (আল্লাহ তা'আলা)-এর সাহায্য ও আশার ইয়াকীন ও আনন্দ।

তাছাড়া মানবতার নবী মানুষের পক্ষ হতে মানবীয় প্রয়োজনসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেসব যন্ত্রণ্ডতের এমন প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষ প্রতিটি স্থান ও সময়ে পাঠযোগ্য দু'আসমূহে পাবে তাদের অন্তরের অভিব্যক্তি, পাবে তাদের অবস্থার মুখপাত্র এবং স্বীয় প্রশান্তির সামগ্রী। বহু এমন প্রয়োজনেরও সন্ধান পাবে, যেসব প্রয়োজনের প্রতি সহজে মানুষের খেয়াল যাওয়া মুশকিল।"–মাআরিফুল হাদীস ঃ ৫ম খণ্ড (ভূমিকা)

আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এর লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বলে লম্বা হওয়া সত্ত্বেও সবটুকুই উল্লেখ করা হল। মনোযোগের সাথে লেখাটি পড়ে থাকলে যিকির ও দু'আর মূলতত্ত্ব এবং কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হয়ে ফুঠে উঠবে। তদুপরি যিকির ও দু'আর ব্যাপারে আমাদের অনীহা ও উদাসীনতা অবর্ণনীয়।

কুরআন হাদীসের শেখানো দু'আ যিকির পরিত্যাগ করে আমরা নতুন নতুন ওযীফা-খতমের পিছনে পড়ে আছি। খতমে জালাল, খতমে খাজেগাঁ, খতমে তাসমিয়া এবং আরো কত খতমের উদ্ভব হয়েছে। আমি বলছি না যে এগুলো পড়া ঢালাও ভাবে না জায়েয, তবে কুরআন হাদীসের দু'আর সাথে এগুলোর তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দু'আসমূহ বাদ দিয়ে শুধু এ সকল খতম পড়ার কোন যুক্তিকতা নেই।

আবার এ খতমগুলো শুধু বালা-মুসীবতের সময়ই পড়া হয়, তাও আবার নিজে না পড়ে অন্যের দ্বারা পড়ানো হয়।

বিশেষভাবে দু'আর ব্যাপারে আমরা অনেক গলত রসম-রেওয়াজে পতিত আছি, এগুলো আমাদেরকে সংশোধন করতে হবে। আর এর জন্যে সর্বাগ্রে জানতে হবে দু'আ সম্পর্কীয় শরয়ী নীতিমালা। নিম্নে দু'আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

দু'আসমূহকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ঃ

১। 'দু'আউল মাসআলা' নিজের সব সময়ের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নিকট চেয়ে দু'আ করা।
২। কুরআন-হাদীসের শেখানো বিভিন্ন সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট দু'আসমূহ।
৩। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ব্যাপক দু'আসমূহ, যেগুলো কোন সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে সুনির্ধারিত নয়।

প্রথম প্রকার দু'আ ঃ এ প্রকার দু'আর ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। শুধু দু'আর আদব ও শর্তাবলীর প্রতি খেয়াল রেখে যে কোন বাক্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রকারের দু'আ করা যায়।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

ليسأل أحدكم ربه حاجته، حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي برقم ٣٨٤٧ من التحفة، وروى نحوه ابن حبان في صحيحه كما في «كنز العمال» ٢: ٦٥.

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু চেয়ে নাও। এমনকি লবণের প্রয়োজন পড়লে, জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে, তাও আল্লাহ তা'আলার কাছে চেয়ে নাও।" -জামে তিরমিযী ঃ ২/২০১ হাদীস ৩৮৪৭

সবকিছু আল্লাহ তা'আলার দরবারে চাওয়ার নির্দেশ এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ পর্যন্ত মঞ্জুর না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব সাধারণ জিনিসও হাসিল হবে না। যদিও ঈমানী দুর্বলতার কারণে আজ আমরা উপায় অবলম্বনের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আছি।

দ্বিতীয় প্রকার দু'আ ঃ শরীয়ত এ পর্যায়ের দু'আসমূহকে যে শব্দ, সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছে ঠিক সে ভাবেই এ দু'আগুলো পড়তে হবে।

এ প্রকারের দুআসমূহ 'হিসনে হাসীন' ও 'মুনাজাতে মকবূল'-এর পরিশিষ্টসহ অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে। এ দু'আসমূহ ওযীফার ন্যায় এক সাথে, এক বৈঠকে পড়ার নয়, বরং হাদীসে যে দু'আ, যে সময় বা অবস্থায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক সেভাবেই পড়তে হবে। ওযীফার ন্যায় পড়বে না।

সমাজে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, মানুষ তৃতীয় প্রকার দু'আসমূহ যেমন ওযীফার আকারে পড়ে, তেমনি দ্বিতীয় প্রকার দু'আসমূহকেও ওযীফার ন্যায় আদায় করে থাকে। 'হিসনে হাসীন' কিতাবটি দ্বিতীয় প্রকার দু'আ সম্বলিত (শুধু ৫ম পরিচ্ছেদ তৃতীয় প্রকার দু'আর অন্তর্ভুক্ত) এও দৈনিক এক মনযিল করে পড়ার ভুল রেওয়াজ প্রচলিত আছে। অথচ সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, তা কোন ওযীফার কিতাব নয়, বরং বিভিন্ন অবস্থায় যে সব মাসনূন দু'আ রয়েছে, সেগুলোর শিক্ষা এবং সে মোতাবেক আমল করার জন্যে এ কিতাব রচিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমাদের উস্তাদ মুহ্তারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস সাহেব মিরাঠী (রহঃ)-এর কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'তরজমায়ে হিসনে হাসীন বতরতীবে জাদীদ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ

" 'হিসনে হাসীন'-এর সংকলক আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহঃ)। তিনি এ গ্রন্থে আদইয়া (দু'আসমূহ) ও আযকার (যিকিরসমূহ) একত্রিত করেছেন। তাঁর এ সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল, দিবা-রাত্রির বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি কাজের যে সব দু'আ, আয়াত ও যিকির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে–তা যেন লোকেরা যথাযথভাবে পড়ে; যাতে দিবা-রাত্রির শত কর্ম-ব্যস্ততার মাঝেও সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ জাগরুক থাকে। এটাই ছিল দু'জাহানের সরদার মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ। হাদীস শরীফে আছে ঃ كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকির (স্মরণ) করতেন।'

কাজেই দৈনিক ওযীফা হিসেবে 'হিসনে হাসীনের' এক মনযিল পড়ে নেওয়ার দ্বারা সংকলকের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কারণ সংকলক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন কাজের দু'আ, আয়াত ও যিকিরসমূহ একত্রিত করেছেন। এগুলো পৃথক পৃথক একত্রিত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যেন 'হিসনে হাসীন'-এর পাঠকগণ তা মুখস্থ করে নেন এবং যখন সে সময় আসবে এবং সে কাজগুলো করতে আরম্ভ করবে, তখন যেন সেগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম এ দু'আ ও যিকিরগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন। এতদুদ্দেশ্যেই মুহাদ্দেসীনে কেরাম সেসব রেওয়ায়াত সংকলন করেছেন হাদীস গ্রন্থের পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে। সে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সংকলক হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে তালাশ করে করে একত্রিত করে দিয়েছেন প্রতিটি কাজ ও যরুরতের সময়ের দু'আ, আয়াত ও যিকিরসমূহকে।

যেমন, রাতে শয়নের পূর্বেকার আয়াত ও দু'আসমূহ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। বিছানায় শয়ন করে পড়ারগুলো ভিন্ন; ঘুম না আসা পর্যন্ত শয্যায় শুয়ে পড়ার দু'আসমূহকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন, ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার দু'আসমূহ পৃথক, ঘুম থেকে হঠাৎ চোখ খুলে যাওয়ার সময়ের দু'আসমূহ পৃথক, পার্শ্ব পরিবর্তন করলে সে সময়ের পৃথক, ভাল বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে সে সময়ের দু'আসমূহ পৃথক বয়ান করেছেন।

এখন যদি কোন ব্যক্তি রাত বা দিবাভাগের কোন অংশে অথবা কোন একটি কাজ করার সময় এসব দু'আর সবগুলোকে একসাথে পড়ে নেয়, তাহলে হাদীস বর্ণনাকারীদের এসব দু'আ পৃথক পৃথক বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। মুহাদ্দেসীনে কেরামের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না। সংকলক হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে অনুসন্ধান করে পৃথক পৃথক সময় ও কাজের যে দু'আগুলোর বিবরণ দিয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না। সর্বোপরি আসল ও মুখ্য উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শের অনুসরণ করা এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকির করার উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। অথচ এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে দুনিয়া-আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতা সম্পৃক্ত।

আসল উদ্দেশ্য হতে বঞ্চিত হওয়া একটি ভুল ধারণার পরিণাম। ভুলটি হচ্ছে 'হিসনে হাসীন'কে আমলিয়াত তথা ঝাড়ফুঁক বা ওযীফার কিতাব মনে করা। এ ধারণাটিই জন মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সেই বদ্ধমূল ধারণাকে এবং তা যে প্রভাব বিস্তার করে আছে, সেটাকে জন মস্তিষ্ক হতে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে আমার (মাওলানা ইদরীস মিরাঠী) এ উদ্যোগ। আমি এ উদ্দেশ্যে হিসনে হাসীনের সমস্ত দু'আ, আয়াত ও যিকিরগুলোকে সে সব কাজ ও সময়ের শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছি, যে সব কাজ ও সময়ে সেগুলো পড়া শরীয়তে কাম্য। যাতে এটা পড়ার সময়ই পাঠক অনুভব করতে পারে যে, এ কিতাব দিবা-রাত্রির বিভিন্ন কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততার সময় পাঠযোগ্য দু'আ, আয়াত ও যিকিরসমূহের সমষ্টি। আমাদের উচিত সবগুলো বা যতটুকু সম্ভব হয় মুখস্থ করে নেওয়া। এ কাজগুলো করার সময় পূর্ণমনযোগ সহকারে দু'আ পড়া, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের সৌভাগ্য ও সফলতা এবং দুনিয়া-আখেরাতে তার ফলাফল ও বরকত নসীব হয়।"

তৃতীয় প্রকার দু'আ ঃ এ প্রকার দু'আ মানুষ যখন ইচ্ছা তখনই করতে পারে। শুধু মুখে মুখে রটবে না, বরং দু'আয় কি বলা হয়েছে তা বুঝে শুনে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে। এটা তখনই সম্ভব যখন মন উপস্থিত থাকবে, অর্থও বুঝবে। দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে দু'আ করার জন্যে নিজ থেকে না বানিয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত শব্দে দু'আ করাই উত্তম। এ প্রকারের দু'আসমূহ 'হিসনে হাসীন'-এর ৫ম পরিচ্ছেদে, এমনিভাবে **'হিযবে আযম'** 'মুনাজাতে মকবূল' ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে।

কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার দু'আর ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ও উদাসীন। প্রথম প্রকারও শুধু নামে মাত্র আছে। কেননা, শুধু বালা-মুসীবতের সময় কারো দ্বারা দু'আ করাতে পারলেই হল। অথচ দু'আ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, যা প্রতিটি মানুষের জন্যে জরুরী।

এ ইবাদতের জন্যে কিছু আদব ও শর্তও আছে, যা জানা এবং সে মোতাবেক আমল করা একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে মুফতী শফী (রহঃ) রচিত পুস্তিকা 'আহকামে দু'আ' বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ) 'মুনাজাতে মকবুল'–এর ভূমিকায় দু'আর গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনার পর লিখেন ঃ

"দু'আর এত গুরুত্ব ও ফযীলত থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ নয়, বরং অধিকাংশ বিশেষ ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে অনুৎসাহী ও অসচেতন। এমনকি দু'আর যে সাধারণ সময়াবলী আছে, যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, তখনও মুখে মুখে দু'আর শব্দগুলো আউড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আন্তরিক একাগ্রতার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। আর এ কথা স্মরণ রেখে দু'আ করা কল্পনাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবারে একটি আবেদন। আর বার বার আবেদন করতে থাকা সফলতার একটি কার্যকরী এবং অতি উত্তম পন্থা । যেমন নিজ প্রয়োজন নিয়ে দুনিয়ার শাসকদের নিকট বারবার আবেদন-নিবেদন করা স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিলের শক্তিশালী মাধ্যম মনে করা হয়। বারংবার আবেদন-নিবেদনের দ্বারা দিনদিন আশা-আকাংখা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তবে হ্যাঁ, যদি ভয়াবহ বিপদাপদ দেখা দেয় এবং হাত পা চালিয়ে কোন কাজ না হয়, তখন অপারগ হয়ে এক-আধজন তাও খুবই বিরল, আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হয়। তবুও দু'আর পথে নয়, বরং সব চাইতে বেশী এতটুকু যে, কিছু ওযীফা ও আমল শুরু করে দেয়। এগুলো শরীয়ত সম্মত কি না, তা তলিয়ে দেখে না। যদি কেউ এর প্রতি খুব সতর্কতা অবলম্বন করল এবং শরীয়ত সম্মত হওয়ার দিকটাও বিবেচনায় আনল, তবুও এসব ওযীফা-আমলে ঐ বরকত কোত্থেকে হবে, যে বরকত আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের শেখানো দু'আসমূহে রয়েছে? মোটকথা, দু'আর ব্যাপারে বেশ কতগুলো ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি ক্রটি তুলে ধরা হল ঃ

প্রথম ঃ একান্ত অপারগতা ছাড়া দু'আ না করা।

দ্বিতীয় ঃ এমন মুহূর্তেও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের শেখানো দু'আ পরিহার করতঃ নতুন নতুন ওযীফা আদায় করা।

তৃতীয় ঃ অনাগ্রহী ও নিরুৎসাহী হয়ে দু'আ করা এবং দু'আয় মন না লাগানো।

চতুর্থ ঃ দু'আ কবূলের সুদৃঢ় আশা এবং ইয়াকীন না হওয়া।

পঞ্চম ঃ দু'আ কবূলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা এবং সামান্য বিলম্ব হলে নিরাশ হয়ে দু'আ বন্ধ করে দেওয়া।"

তিনি আরো বলেন, "এসব ত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্যে কুরআন-হাদীসে যে সব ব্যাপক অর্থবোধক (جامع) দু'আ রয়েছে, সেগুলোকে একত্রিত করে দেওয়া আমি উপযুক্ত মনে করছি (এবং এটা কল্যাণকামিতা ও সময়ের দাবীও)। কেননা, এগুলো অন্যান্য দু'আ হতে বহু দিক থেকে অগ্রগণ্য।

এক ঃ যখন শাসক নিজেই আবেদনের বিষয়বস্তু বলে দেন তখন তার মঞ্জুরীর ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। তেমনি ভাবে যে সব দু'আ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো নির্দ্বিধায় কবূলের নিশ্চয়তা রাখে।

দুই ঃ সে সব দু'আয় দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনের প্রতি যতটুকু দৃষ্টি রাখা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এ নিয়ে চিন্তা করলেও এত ব্যাপক বিষয় ভিত্তিক দু'আ বানাতে পারব না।

তিন ঃ অনেক সময় দু'আয় বিষয়বস্তুতে বেয়াদবীমূলক আচরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে সে দু'আই এক সময় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এক ব্যক্তি দু'আ করেছিল, আখেরাতে যত আযাব হওয়ার তা যেন দুনিয়াতেই হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং এ ধরনের দু'আ করতে বারণ করেছেন।

মোটকথা, নিজের ইচ্ছামত এবং আন্দাজ করতঃ দু'আ নির্ধারিত করলে এ ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতির আশংকা থাকে। পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীসে যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এ পর্যায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ।"[১]

স্মর্তব্য যে, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নয় এরূপ দু'আতে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন খারাপ দিক না থাকে, তবে সে সব দু'আ করা যদিও জায়েয, কিন্তু কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের মোকাবেলায় এসব দু'আকে শ্রেষ্ঠত্বদান অথবা 'আদইয়ায়ে মাসূরা' হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে এসব দু'আর (অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নয়, এমন দুআসমূহের) পিছনে পড়া কিছুতেই জায়েয হবে না। উপমা স্বরূপ 'হিযবুল বাহারের' কথাই ধরা যাক। এটি একটি খুব সুন্দর ইলহামী দু'আ। এ দু'আর অধিকাংশ শব্দই কুরআন-হাদীসে যদিও বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সরাসরি এভাবে উক্ত দু'আ বর্ণিত নেই।

১. -মুনাজাতে মকবূল ঃ ৭৭-৭৮

হযরত থানভী (রহঃ)-এর অনুমতিক্রমে 'হিযবুল বাহার'টি মুনাজাতে মকবূলের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এ সতর্কীকরণ রয়েছে যে, 'নিঃসন্দেহে এ দু'আ একটি বরকতময় দু'আ। তবে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের মর্যাদা এবং প্রভাব-ক্রিয়া এর চাইতে অনেক বেশী। স্মরণ রাখবেন, লোকজন এ ব্যাপারে খুব ভুল করে থাকে।'[১]

অতঃপর হযরত থানভী (রহঃ) লোকদের বাড়াবাড়ি দেখে এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, 'সাধারণভাবে লোকদের অন্তরে 'হিযবুল বাহার' সম্পর্কে বিশ্বাস এত গাঢ় যে, আদইয়ায়ে মাসূরা সম্পর্কেও এতটুকু নেই। এটা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি। তাই এর ওযীফা বন্ধ রাখা দরকার।[২]

কিন্তু আদইয়ায়ে মাসূরার প্রতি যত্নবান হয়ে এবং তার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস রেখে যদি উপরোক্ত দুআও পড়ে, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যিকির ও দু'আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠানো। যাকে আমরা 'দুরূদ পাঠ' করা বলে থাকি। এ দুরূদের গুরুত্ব ও ফযীলত কারো অজানা নয়। কুরআন-হাদীসের আলোকে দুরূদের উপর যেসব গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে, সেগুলোর শুধু নাম তালিকার জন্যেও প্রয়োজন স্বতন্ত্র গ্রন্থের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া-অনুগ্রহ যে, তিনি সাহাবীদের আবেদন-নিবেদনে অথবা আবেদন-নিবেদন ছাড়াই আমাদেরকে দুরূদ শরীফের শব্দ শিখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষা এবং তাঁর শিখানো শব্দ ছেড়ে আমরা দুরূদে তাজ, দুরূদে মাহী, দুরূদে তুনাজ্জিনা, দুরূদে ফতূহাত, দুরূদে শিফা, দুরূদে খাইর, দুরূদে তাযিয়া[৩] আরো নাম না জানা কত দুরূদই না বানিয়েছি(!) এসব দুরূদের কোন কোনটির কিছু শব্দ এমন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। আবার কোনটি বর্জন করা ওয়াজিব।

---

১. মুনাজাতে মকবূল ঃ ২০৮

২. কামালাতে আশরাফিয়া ঃ ৪১

৩.লোকমুখে প্রসিদ্ধ হল 'দরূদে নারিয়া', কিন্তু শুদ্ধ হল 'দুরূদে তাযিয়া' শাইখ ইবরাহীম তাযীর নামানুসারে। আল্লামা নাবহানী 'সাআদাতুদ দারাইন ফিসসালাতি ওয়াসসলামি আলা সায়্যিদিল কাওনাইন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ পৃষ্ঠা ৩৭৬ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরূদ শরীফসমূহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া ভিন্ন কিতাব আকারেও তা বিদ্যমান আছে।

মোদ্দাকথা, দুআ, দুরূদ ও যিকির-আযকার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ইবাদত। প্রত্যেকের জন্যেই ইবাদত। শুধু বুযুর্গ, আলেম ও মসজিদের ইমাম সাহেবদের বেলায়ই ইবাদত নয়। এসব ইবাদতের পদ্ধতি, আদব ও শর্তাবলীও শরীয়ত বলে দিয়েছে। এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। বর্তমানে কিছু কিছু লোককে এমনও দেখা যায়, যারা দুআ, দুরূদ ও যিকির-আযকারকে হেয় নযরে দেখে, যা সম্পূর্ণ ঈমান বিরোধী কাজ। অথচ তারাই কঠিন বিপদে পড়লে নিজে দুআ, দুরূদ ও যিকির-আযকার না করে শুধু অন্যের নিকট দৌড়ায়।[২] প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে দুআ, দুরূদ ও যিকির-আযকারের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা একান্ত অপরিহার্য এবং এগুলোকে বাস্তবায়িত করাও ফরয। শুধু বালা-মুসীবত, আপদ-বিপদের সময়ই দু'আ, দুরূদ ও যিকির-আযকার ইত্যাদি পড়বে না, বরং সর্বাবস্থায় এ সবের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কেননা, এগুলোই হল আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন!

৮. বুযুর্গদের ওসীলা দিয়ে দু'আ করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন

পীর-মুরীদীর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি কাজ অধিক প্রচলিত, তা হল তাসাওউফ ধারার বুযুর্গদের ওসীলা দিয়ে দু'আ করা এবং তাঁদের নামের যে শাজারা রয়েছে (যা এক প্রকার দু'আ সম্বলিত) তা পড়া। এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ) 'কাসদুস সাবীল' গ্রন্থে বলেন ঃ

'দরবেশদের মধ্যে (পীর-মুরীদীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে) যে সব প্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কতগুলো আছে ভাল, যদি আকীদা বিশ্বাসে কোনরূপ ত্রুটি না থাকে, যেমন শাজারা পাঠ করা। এতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের নামের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা হয়। এরূপ

২. বুযুর্গদের নিকট দুআ চাওয়া জায়েয। আমার উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, অন্যের কাছে দুআ চেয়ে নিজে দুআ করা থেকে উদাসীন হওয়া আদৌ ঠিক নয়, বরং নিজেও দুআ করবে এবং দুআর কারণে (দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কাজে) প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া ভুল, বরং দুআর সাথে সাথে প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে।

ওসীলা দিয়ে দু'আ করার বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু শাজারা পড়তে গিয়ে যদি এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, তাঁদের নাম পড়ার ফলে তাঁরা আমাদেরপ্রতি খেয়াল রাখবেন। তাহলে এটা হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, ভিত্তিহীন আকীদা।"১

উল্লেখ্য, বুযুর্গদের ওসীলা দিয়ে এ উদ্দেশ্যে দুআ করা যে, তাঁরা এ ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। এরূপ বিশ্বাস রাখা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁদের উসীলা দিয়ে দু'আ করা সুস্পষ্ট শিরক।

এমনিভাবে কোন বুযুর্গের 'হক্ক' ও মান-মর্যাদার ওসীলা দিয়ে দু'আ করা। যেমন এরূপ বলা যে, 'হে আল্লাহ! অমুকের হকের ওসীলা দিয়ে আমি দু'আ করছি, তুমি আমার কাজ সমাধা করে দাও অথবা অমুকের সম্মান, মর্যাদার ওসীলায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দাও।' এ প্রকারের তাওয়াসসুল (ওসীলা দিয়ে দু'আ করা) যদিও কোন কোন বুযুর্গ হতে বর্ণিত আছে, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম একে মাকরূহ বলেছেন। স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তার শিষ্যগণ হতেও মাকরূহ বলে বর্ণিত আছে। এজন্যে এরূপ তাওয়াসসুল হতে বিরত থাকা উচিত।

বৈধ তাওয়াসসুলের পদ্ধতি হল, দু'আর মাঝে কোন বুযুর্গের ওসীলার কথা উল্লেখ করা। যেমন এরূপ বলা, 'হে আল্লাহ! আমি ওমুক বুযুর্গের ওসীলায় দু'আ করছি, আমার দু'আ কবূল কর, অথবা ওমুক বুযুর্গের ওয়াস্তে আমার দু'আ কবূল কর।' নিয়ত এই থাকবে যে, আমার জানা মতে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা এবং তাঁদের সাথে আমার মহব্বত আছে। ঐ মহব্বতের বদৌলতে দু'আ কবূল করে নেওয়ার দরখাস্ত করছি।২

৯. সাধারণ ব্যক্তির জন্যে তাসাওউফের উচ্চাঙ্গ এবং সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সম্বলিত কিতাবপত্র পড়া

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, "একজন দ্বীনদার আলেম, যিনি ইলমে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও মানতেক ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী এবং তিনি তাসাওউফ শাস্ত্রের কোন যোগ্য বুযুর্গের সংশ্রবে ছিলেন–এ ধরনের আলেম ব্যক্তি যদি তাসাওউফের উচ্চ ও সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর কিতাবপত্র দেখে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যে এসব কিতাবাদি দেখা দ্বীন-ঈমান ধ্বংসের কারণ হবে। এ জন্যে এ প্রকার পুস্তকাদি কিছুতেই না দেখা উচিত। যেমন মাওলানা রুমী (রহঃ)-এর 'মাসনবী' 'দেওয়ানে হাফেয' অথবা অন্যান্য বুযুর্গদের মালফূযাত (বাণী সংকলন), মাকতূবাত (পত্রাবলী), যেগুলোর মধ্যে তাসাওউফের সূক্ষ্ম কথাবার্তা, ওয়াজ্দ ও হালত তথা বিশেষ অবস্থাসমূহের উল্লেখ রয়েছে যা সাধারণতঃ মানুষের বোধগম্যের বাইরে।"৩

---

১ –কাসদুস সাবীল–ইসলাহী নেসাব ঃ ৫২৩
২ –তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম শরহু সহীহে মুসলিম ঃ ৫/৬২০, শামী ঃ ৬/৩৯৭
৩ –কাসদুস সাবীল–ইসলাহী নেসাব ঃ ৫২৪, বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১১৫

হাকীমুল উম্মত (রহঃ) 'তারবিয়াতুস সালেক' গ্রন্থে এও বলেছেন যে, 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' সহ এ স্তরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা সবার জন্যে উপকারী নয়।'[১]

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এরই আরেক কিতাব 'কীমিয়ায়ে সাআদাত', 'সৌভাগ্যের পরশমণি' নামে এটি বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে তাঁরই এক স্বনামধন্য শাগরিদ আল্লামা আব্দুল গাফের ফারসী এক দীর্ঘ অভিমতে লেখেন, 'সত্য কথা হল, আমাদের উস্তাদের (গাযযালীর) এ কিতাব না লেখাই ভাল ছিল।' তিনি আরো বলেন যে, 'এ কিতাব সাধারণ মানুষের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।' –সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১৪/৩২২-১২৩

শাইখুল ইসলাম, শাইখুল আরব ওয়াল আজম, হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)ও স্বীয় মাকতূবাতে লেখেন, 'হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) সালেকের জন্যে তাসাওউফের কিতাব পড়তে নিষেধ করতেন।'

হযরত মাদানী (রহঃ) এ ব্যাপারে পরিষ্কার লিখেছেন যে, 'বুযুর্গদের কিছু কিতাবপত্র এমন আছে, যেগুলো তাসাওউফের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় এবং বিশেষ অবস্থাদি সম্পর্কে রচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব বুযুর্গদের ন্যায় সম্মানের আসনে সমাসীন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের কিতাবপত্র দেখা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী।'

তিনি আরো বলেন, 'ইলমে তাসাওউফের প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন হল হালে তাসাওউফের। এ উদ্দেশ্যেই চেষ্টা-মুজাহাদা করা উচিত।[২]

অর্থাৎ, তাসাওউফের পরিভাষাগত জ্ঞান এবং তাসাওউফ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর জ্ঞান লাভ করা উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হল হালে তাসাওউফ তথা আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সংশোধন। ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি। এসবের জন্যে মেহনত-পরিশ্রম করা কর্তব্য।

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যে অতি উঁচু স্তরের সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সম্বলিত কিতাব পড়ার এ নিষেধাজ্ঞা তাদের ব্যক্তিগত মনগড়া কোন মতামত নয়, বরং হাদীস শরীফেও সূক্ষ্ম বিষয়াবলী সাধারণ লোকদের গোচরীভূত করতে বারণ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে এ সম্পর্কে একাধিক হাদীস ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু এবং তাসাওউফের পরিভাষাগত বিষয়াবলীর উপর লিখিত কিতাবাদি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ মানে এই নয় যে, তাসাওউফের কোন কিতাবই পড়া

১ – তারবিয়াতুস সালেক ঃ ২/১১৯৩–১১৯৪
২ –মাকতূবাতে শাইখুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) ঃ ১/১৮৬-১৮৯

যাবে না, বরং তাসাওউফের যেসব পুস্তক জনসাধারণের বোধগম্য এবং মাকাসেদে তাসাওউফ-ইসলাহে আকাঈদ, ইসলাহে আমল (ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি বা সমাজনীতি সম্পর্কিত) ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির মাসআলা বিষয়ক পুস্তকাদি পড়া-পড়ানো প্রত্যেকের জন্যে জরুরী। طلب العلم فريضة على كل مسلم 'দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয' হাদীসখানার অন্তর্ভুক্ত। হযরত থানভী (রহঃ) ও হযরত মাদানী (রহঃ)-এর রচনাবলী, পত্রাবলী ও বাণী সংকলনগুলোতেও স্থানে স্থানে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১০. হাদীস বর্ণনায় অসতর্কতা

'তালীমুদ্দীন' পুস্তকে পীর-মুরীদী সম্পর্কিত ত্রুটিসমূহের বিবরণে উল্লেখ আছে, 'একটি ত্রুটি হল এই যে, হাদীস বয়ান করতে গিয়ে নেহায়েত অসতর্কতা অবলম্বন করা হয়। হাদীসের যাচাই-বাছাই মুহাদ্দেসীনের নিকট করা উচিত। উর্দু, ফারসী বা আরবী অনির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে হাদীসের নাম পেয়ে তা দিয়েই দলীল-প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই, কিন্তু লোক মুখে সেগুলো হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। যেমন[১] أنا عرب بلا عين এ ধরনের আরো বহু উক্তি আছে, যেগুলোর শব্দ ও অর্থগত কোন ভিত্তিই নেই। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

–তা'লীমুদ্দীন–ইসলাহী নেসাব ঃ ৩০৪–৩০৫

হযরত থানভী (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে। এটি একটি মুতাওয়াতির (বহু সূত্রে বর্ণিত) হাদীস। উক্ত হাদীসের অর্থ হল, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে (আমার দিকে এরূপ বিষয়ের সম্বন্ধ করবে যা আমি বলিনি) সে যেন স্বীয় ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

–সহীহ বুখারী ঃ ১/২১, হাদীস ১১০, সহীহ মুসলিম ঃ ১/৭, হাদীস ৩

---

১. অর্থাৎ আমি عين বিহীন আরব (عرب), যার অর্থ দাঁড়ায় আমি رب (প্রভু)। এই হল মিথ্যুক, দাজ্জাল ও মুলহিদদের অবস্থা, যারা রাসূলেরই ভাষায় রাসূলকে প্রভু প্রমাণ করছে। কোন কোন মুলহিদ ও যিন্দীক এরূপ জাল হাদীসও বানিয়েছে যে, أنا أحمد بلا ميم অর্থাৎ, আমি মীম বিহীন আহমাদ, যার মানে হয় আমি, أحد (একক প্রভু)। ওদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হোক।

সহীহ্ মুসলিম ঃ ১/৮ হাদীস ৫–এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদও বর্ণিত আছে ঃ

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শ্রবণ করে তা-ই (যাচাই ছাড়া) বলে বেড়ায়।'

আরো একটি হাদীস সহীহ বুখারী ঃ হাদীস ১২৯১ এবং সহীহ মুসলিম ঃ ১/৭ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

'আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন স্বীয় ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'

সহীহ্ বুখারী ঃ হাদীস ৩৫০৯–এ হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসক্বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل.

'সব চাইতে মারাত্মক মিথ্যাচার এই যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে বাদ দিয়ে নিজেকে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করবে অথবা স্বপ্নে এমন বস্তু দেখার দাবী করবে যা সে দেখেনি। কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি এমন কথা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়।'

'আত-তাকাশশুফ' গ্রন্থে হযরত থানভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোচনায় হাদীস বয়ানে অসতর্কতার ব্যাপারে সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'যদি প্রবল সুধারণার ভিত্তিতে কারো সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারীরা ভুল বর্ণনা করেছেন, তাহলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এরূপই ঘটেছে। এ পথেই তাঁদের বাণী ও লেখাতে কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে যদি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কেউ

উক্ত প্রকারের হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জাহেলদের অভ্যাস, তাহলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন অবকাশ নেই।'[১]

বর্ণনাকারীদের প্রতি প্রবল সুধারণার কারণে যে সব বুযুর্গদের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের অজ্ঞান্তে জাল হাদীস এসেছে বলে হযরত থানভী (রহঃ) ইঙ্গিত করেছেন, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী সেসব বুযুর্গদের মধ্যে বড় পীর শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং ইমাম গায্যালী (রহঃ)ও রয়েছেন।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) রচিত 'গুনয়াতুত তালেবীন' সম্পর্কে 'নিবরাসের' স্বনামধন্য গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল আযীয ফারহারভী (রহঃ) বলেন, الأحاديث الموضوعة في غنية الطالبين وافرة 'গুনয়াতুত তালেবীন' কিতাবে অনেক মাওযূ (জাল) হাদীস রয়েছে।' –নিবরাস ঃ ৪৭৫

শাইখুল হাদীস মাওলানা সারফরায খান সফদর 'ইত্‌মামুল বুরহান ফী রদ্দি তাওযীহিল বয়ান' কিতাবে বলেন, "নিশ্চয়ই হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তৎকালীন যুগের বড় বুযুর্গ, কারামতবিশিষ্ট ওলী, ইস্‌লাহের পাঠদানকারী এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। তবে তিনি রিজাল শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না। হাদীসের সহীহ-যয়ীফকে মুহাদ্দেসীনে কেরামের ন্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে জানতেন না। মুহাদ্দেসগণ হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সূফিয়ায়ে কেরাম সাদাসিদে নেককার হওয়ার কারণে মানুষের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত সুধারণা পোষণ করে থাকেন। নিজেদের পুত-পবিত্র এবং নির্মল অন্তঃকরণের ন্যায় অন্যদেরকেও ধারণা করেন যে, আমরা যেমন মুখলিস ও সত্যবাদী, সকল বর্ণনাকারীগণও তেমনিই হবেন। এ জন্যে তাদের ব্যাপারে তলিয়ে দেখতে যান না।"–ইতমামুল বুরহান ঃ ২৮১

আর ইমাম গায্যালী (রহঃ) নিজেই স্বীয় পুস্তিকা 'কানূনুত তাবীল' পৃষ্ঠা ১৬-এ বিনয় স্বরূপ নয় বরং বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, وبضاعتي في علم الحديث مزجاة 'ইলমে হাদীসে আমার পুঁজি সামান্য।'

উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন'–এ অনেক জাল হাদীস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম মাযারী, ইমাম আবূ বকর তুরতুশী, ইমাম যাহাবী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা ইবনুল

১. –আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৪০৩, হাদীস ২৬৩।

জাওযী, আল্লামা সুয়ূতী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যাবীদী, আল্লামা লাখনোভী (রহঃ) প্রমুখ সতর্ক করেছেন।[১]

যেহেতু ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-এ সহীহ হাদীসের সাথে বাতিল, মাওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও রয়েছে যার সংখ্যা একেবারে কম নয়, এই জন্যে মুহাদ্দেসীনে কেরাম ভিন্ন কিতাব রচনা করে সেগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন ঃ একটি কিতাব আরবী 'ইহইয়া'-এর টীকায় ছাপানো আছে ঃ 'আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফিল আসফার বিতাখরীজি মা-ফিল ইহয়াই মিনাল আহাদীসি ওয়াল আখবার"। যারা ইহ্ইয়া–এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তাদের উচিত ছিল মুহাদ্দেসীনে কেরামের কিতাবসমূহের সহযোগিতা নিয়ে সে সব বাতিল, মাওযূ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলো তরজমা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া (এবং অনুবাদকের ভূমিকায় তা উল্লেক করে দেওয়া) অথবা টীকার মধ্যে সে সব রেওয়ায়াতগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া । কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, তাঁরা এর কোনটি করেননি।

যাহোক উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতে তাঁদের অজান্তে জাল হাদীস প্রবেশ করায় গ্রন্থকারের মর্যাদাহানী হবে না এবং গ্রন্থও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বলেই গণ্য হবে। তবে হাদীসসমূহ উক্ত কিতাবগুলোতে আছে বলেই চোখ বুজে নেওয়ার মত নয়, বরং হাদীসের বাছবিচারের জন্যে হাদীস বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে থানভী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. ইত্তিবায়ে সুন্নাতের অর্থ বুঝতে ভুল করা

শরীয়তে সুন্নাতের ইত্তিবা (অনুসরণ) যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা কারো অজানা নয়। সে বিষয়ে আলোকপাত করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত শরীয়তের অনুসরণের দাবী করা একেবারেই অবান্তর। কেননা, সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত শরীয়তের অনুসরণ সম্ভব নয়।

এখানে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হল, 'সুন্নাতের অনুসরণ'-এর অর্থ বুঝতে অনেকে ভুল করে থাকে। এ ভুলের সংশোধন জরুরী। আর এর জন্যে আবশ্যক হল সুন্নাত শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং ব্যবহার ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১. উক্তিসমূহের জন্যে দ্রষ্টব্য– সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১৪/৩৩০, ৩৩২, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১০/৫৫২, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ১/২৮, আল-আজবিবাতুল ফাযিলা ঃ ৩৫, আত-তা'লীকাতুল হাফিলা ঃ ১১৮–১২০, মুকাদ্দিমাতু মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত্তালীম ঃ ৪৮–৫৩

সুন্নাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ

১. সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ এবং সুন্নাতের গুরুত্ব ও অনুসরণ সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে সব স্থানে সুন্নাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে তার অর্থ হল ঃ

المنهج النبوي الحنيف في جميع أمور الدين من العقائد والعبادات والمعاملات، والآداب، والأخلاق ونحوها.

'দ্বীনী বিষয়াদি যথা ঃ আকীদা, ইবাদত, লেনদেন ও আদব-আখলাক ইত্যাদিতে অবলম্বিত নববী পথ ও পদ্ধতি।'

এখন সে নববী পথ ইলমে ফিক্হের আলোকে ফরযও হতে পারে, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাবও হতে পারে। কিংবা এমন জরুরী হুকুমও হতে পারে, যা বাদ পড়লে কোন মানুষ মুসলমানই থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফের যেখানেই সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি তাকীদ দেওয়া হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ-পদ্ধতি অবলম্বন কর। তোমাদের আকীদা তাঁর আকীদার ন্যায় হোক; তোমাদের ইবাদত হোক তাঁর ইবাদত সাদৃশ; তোমাদের লেনদেন, আদব-আখলাক সবকিছু তাঁর আদব-আখলাক ও লেনদেনের রূপ ধারণ করুক। তোমাদের জাহের ও বাতেন তাঁর যাহের ও বাতেনের অনুরূপ হোক। এক কথায় সুন্নাতের অনুসরণের অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা যে শরীয়ত লাভ করেছি সে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ।[১]

সুন্নাতের এ অর্থ হিসেবে ফরয ও ওয়াজিবকেও সুন্নাত বলা যায়। হাদীস শরীফে, এমনিভাবে সাহাবী ও তাবেঈদের বাণীসমূহে ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে সুন্নাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছেও বটে। এ বিষয়টি যথাযথ ভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

পূর্বোক্ত অর্থ হিসেবেই বলা হয়ে থাকে যে, দাড়ি রাখা নবীর সুন্নাত। অর্থাৎ নববী পথ-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তবে তার হুকুম কি হবে (?) সে কথা স্পষ্ট যে, এটি একটি ওয়াজিব আমল। তাকে সুন্নাত বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, মাঝে মধ্যে দাড়ি না রাখাও জায়েয।

২. সুন্নাত শব্দের ব্যবহার কখনো এমন বিষয়াবলীর উপর হয়, যা হুকুমের দিক থেকে ওয়াজিব স্তরের নীচে এবং মুস্তাহাব স্তরের উপরে। যেমন বলা হয়, উযূতে অমুক অমুক কাজ সুন্নাত, নামাযে অমুক অমুক কাজ সুন্নাত।

৩. কখনো সুন্নাত শব্দ আদব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত, মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত, পানাহারের সুন্নাত, পোশাক পরার

১.-জামেউল উলূমে ওয়াল হিকাম ঃ ২৩০, আসসুন্নাতুন নাবাবিয়্যা ওয়া মাদলূলুহাশ শরয়ী ঃ ৭-১৯

সুন্নাত, ঘুম ও জাগ্রত হওয়ার সুন্নাত, ঘরে প্রবেশ এবং ঘর হতে বের হওয়ার সুন্নাত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থে যে সব কাজ সুন্নাত, সেগুলো ঐ সুন্নাতেরই অংশ বিশেষ, যার অর্থ ১ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। শরীয়তে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি এসব সুন্নাতসমূহ দ্বীনের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ঈমান-ইসলামের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এগুলো বড়ই ক্রিয়াশীল। তাই সুন্নাত ও আদব নাম দেখেই এসবের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া কিংবা এসবের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া বড় ধরণের ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদর্শ। আমরা তাকে আদব-আখলাক ইত্যাদির ব্যাপারে (মা'আযাল্লাহ) আদর্শ না মানার কোন প্রশ্নই আসে না।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা (রহঃ) শুধু আরব বিশ্বের নয়,বরং সারা মুসলিম জাহানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের অন্যতম। তিনি স্বরচিত 'আসসুন্নাতুন নাবাবিয়্যা ওয়া মাদলূলুহাশ শরয়ী' (পৃষ্ঠা ঃ ২০) পুস্তিকায় বলেন ঃ

"এখানে উল্লেখ্য যে, এ যুগের কতিপয় (নামধারী) আলেম ও মুফতী, যারা সুন্নাত আদায়ে শিথিলপন্থী বলে সুপ্রসিদ্ধ, তাদেরকে যখন সুন্নাত বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে উঠে যে, এটা সুন্নাত মাত্র, যা বর্জন করা যায়। তারা ফিক্হের পরিভাষায় সুন্নাতের নেতিবাচক দিকটি নিয়েছেন- তা হল বর্জন করা জায়েয। পক্ষান্তরে ইতিবাচক দিকটি পরিহার করেছেন। সেটি হল অনুসরণ-অনুকরণের দিক। মূলতঃ একজন মুসলমানের জন্যে এরূপ আচরণ শোভণীয় নয়। কেননা ,এ উম্মতের পূর্বসূরীরা শরীয়তে কাম্য সবগুলো কাজই করতেন। যদিও তা মুস্তাহাব পর্যায়েরই হোক না কেন। ফরয হিসেবে করতে বলা হল, না ওয়াজিব হিসেবে, না মুস্তাহাব হিসেবে-তারা অনুসরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যবধানে যেতেন না।

বস্তুতঃ সুন্নাতসমূহ ফরয ও ওয়াজিবের দুর্গ স্বরূপ। সুন্নাত পালনকারীর জন্যে তা পুণ্য ও নূর বৃদ্ধির মাধ্যম। সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণ মহব্বতের আলামত ও দলীল। তাই সুন্নাতের আকাংখা এবং তা আঁকড়ে ধরা বড় গণীমত, সুন্দরতম গুণ ও সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত। অতএব হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরুন।

আমাদের এক ভ্রাতৃ আলেমের ঘটনা। তিনি একবার এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তার চিকিৎসার জন্যে একজন পাকিস্তানী শ্মশ্রুধারী ধার্মিক

ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হল। সুচিকিৎসার ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন শহরস্থ অধিকাংশের ন্যায় শ্মশ্রুবিহীন। অতঃপর পাকিস্তানী ডাক্তার তাকে লক্ষ্য করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে বললেন, أين اللحية يا شيخ؟ শাইখ! আপনার দাড়ি ? উত্তরে বললেন, দাড়ি রাখা সুন্নাত।' অর্থাৎ, মুণ্ডানো জায়েয (তার মতানুসারে)।[1] ডাক্তার প্রতি উত্তরে বললেন, 'শাইখ! সুন্নাত, ওয়াজিব আমি চিনি না। আমি জানি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা। আমরা তাঁরই মহব্বত, অনুসরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বনে দাড়ি রাখি। তিনিই আমাদের আদর্শ। তিনিই আমাদের ইমাম।' এ ব্যাপারে শাইখের তুলনায় ডাক্তারই ছিলেন অধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী।"

ইসলামের প্রতিটি সুন্নাত ও আদবের ব্যাপারে একজন মুসলমানের মন-মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত। যদিও তা ফরয বা ওয়াজিব স্তরের নাই হোক।

৪. সুন্নাত শব্দটি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব কাজের বেলায়ও বলা হয়ে থাকে, যেসব কাজ তাঁর দুনিয়ার প্রতি সর্বোচ্চ অনাসক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকত। যেমনঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা, যখন যা জুটত তাই পানাহার করা, এ নিয়ে মাথা না ঘামানো। চট বা চাটাইয়ে শয়ন করা ইত্যাদি।

আমার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের সে অংশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা, যার সামান্য আঁচ করা যাবে নিম্নোক্ত ক'টি হাদীস থেকে।

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ماشبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه كما في مشكاة المصابيح ص ٤٤٦.

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ লাগাতার দু'দিন পেট ভরে যবের রুটি পর্যন্ত খায়নি। আর এমতাবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়।'—সহীহ বুখারী ওমুসলিম—মিশকাতঃ ৪৪৬

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ربما يأتي علينا

---

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শরয়ী দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ) রচিত 'ডারহী কা উজুব' নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

الشهر أو أكثر، لانوقد في بيوتنا نارا، وإنما هما الأسودان: الماء والتمر. رواه مسلم في صحيحه ٢: ٤٢٠.

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, 'আমাদের কখনো এমন হত যে, একমাস বা তারও অধিকদিন চুলায় আগুণ জ্বলত না। শুধু খেজুর আর পানি দিয়ে দিন কাটত।'–সহীহ মুসলিম ঃ ২/৪২০

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لايارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، رواه أحمد برقم ٦١٢٨٦ والترمذي برقم ٢٤٥١، وقال : هذا حديث حسن، وعلي بن يزيد ـ راويه ـ يضعف في الحديث .

আবূ উমামা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে মক্কা উপত্যাকাকে স্বর্ণ করে দিতে চাইলে আমি বললাম, না হে প্রভু! আমি তো একদিন খাব, আরেক দিন উপবাস থাকব। যখন উপবাসের পালা আসবে তখন আপনার দরবারে কাকুতি মিনতি করব এবং আপনাকে স্মরণ করব। আর যখন কিছু জুটবে তখন আপনার প্রশংসা করব এবং শোকর আদায় করব।" –তিরমিযীঃ ২/৬০, হাদীস ২৪৫১, মুসনাদে আহমাদঃ হাদীস ২১৬৮৬

عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مايسرني أن لي أحدا ذهبا، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي دينار أو نصف دينار إلا لغريم. رواه الدارمي في «سننه» ٢: ٢٢٣، وإسناده حسن، وأصل الحديث في الصحيحين بأطول منه.

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উহুদ পাহাড়ের সমান আমার স্বর্ণ হবে এবং তা

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব, আর ইন্তেকালের সময় আমার নিকট অর্ধেক দিনারও অবশিষ্ট থাকবে–এতে আমি মোটেও আনন্দিত নই। তবে পাওনাদারের জন্যে থাকলে সে কথা ভিন্ন।' – দারেমী ঃ ২/২২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত তিন প্রকার সুন্নাতের ন্যায় এ চতুর্থ প্রকার সুন্নাতের ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেননি। তবে কারো পক্ষে যদি হককুল্লাহ ও হককুল ইবাদে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটানো ব্যতীত এ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে এটা তার জন্যে সাওয়াব ও সৌভাগ্যের কারণ হবে।

৫. কেউ কেউ সুন্নাত শব্দটি সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব কাজের ব্যাপারেও বলে থাকে, যা তিনি ইবাদত হিসেবে পালন করেননি, শরীয়তের বিধান বর্ণনার জন্যেও করেননি অথবা চতুর্থ প্রকার সুন্নাত হিসেবেও পালন করেননি। কোন সুনির্দিষ্ট কারণেও করেননি, বরং স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে করেছেন। যেমনঃ লুঙ্গি পরিধান করা, মসজিদ পাকা না করা, আরোহণের জন্যে উট, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা, খেজুর খাওয়া ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে এসব কাজের ব্যাপারে সুন্নাত শব্দের ব্যবহার হয়নি। এসব কাজ সুন্নাত অনুসরণে উৎসাহ এবং সুন্নাত বর্জনে হুঁশিয়ারি সম্বলিত হাদীসসমূহের আওতা বহির্ভূত।

তবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস অতি উত্তম অভ্যাস। সে সব অভ্যাসের কোনটিকে ঘৃণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সম্পূর্ণ হারাম। এতে ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এগুলো অবলম্বন করা উম্মতের জন্যে সুন্নাত। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো অবলম্বনের নির্দেশ দেননি এবং খুলাফায়ে রাশেদীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনও এসব নিছক অভ্যাসগত কাজকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি।[১]

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ

"বকরী পালন করা সুন্নাত, তবে সুন্নাতে আদিয়া তথা নিছক অভ্যাসগত সুন্নাত; ইবাদত সংক্রান্ত সুন্নাত নয়।। (অনুসরণের ক্ষেত্রে) ইবাদত সংক্রান্ত সুন্নাতই মুখ্য। তবে যদি কেবল মাত্র মহব্বতে সুন্নাতে আদিয়া পালন করে তাহলে তা

---

১ –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১/২৭৮, ১০/৪০৯–৪১১, ১১/৬৩২, ২৩/১১১, ১১২, ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ঃ মাকতূব নং ২৩১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৪/২২৯

সওয়াব ও বরকত শূন্য হবে না। অবশ্য এতে বাড়াবাড়ি এবং সুন্নাতে ইবাদতের ন্যায় গুরুত্বারোপ করা যাবে না।

কেউ কেউ এই তালাশে রাত দিন লেগে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি কত বড় ছিল ? ইত্যাদি , ইত্যাদি। কোন আশেক যদি শুধু মহব্বতের খাতিরে এগুলোর সন্ধান করে তাহলে সে কথা ভিন্ন।

অবশ্য মানুষ এ সবের ফিকিরে পড়ে দ্বীনের জরুরী বিষয়াবলীর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করে থাকে। এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। সবকিছুকে তার সীমারেখায় রাখা উচিত।" –মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ঃ খণ্ড ৫, কিস্ত ১, পৃষ্ঠা ৮৯, মালফূয ৯৩

সুন্নাত শব্দের এসব অর্থ বর্ণনার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দিয়েছে যে, অনেকেই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে নিপতিত। তারা উলামায়ে কেরামের নিকট এ হাদীস প্রায়ই শুনে থাকে ঃ

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. رواه الترمذي برقم ٢٦٧٧، وقال : هذا حديث حسن.

'যে ব্যক্তি আমার একটি মৃত সুন্নাতকে জীবিত করবে, পরবর্তীতে উক্ত সুন্নাতের উপর আমলকারী সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। এতে তাদের সাওয়াব সামান্যতম হ্রাস পাবে না।' –জামে তিরমিযী ঃ ২/৯৬, হাদীস ২৬৭৭

যখন তারা উক্ত হাদীসখানা উলামায়ে কেরামের মুখে শুনতে পায়, তখন তারা মনে করে যে, মিষ্টি ও লাউ খেলেই উক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং উক্ত সাওয়াব এবং এ প্রকারের অন্যান্য সাওয়াব যা সুন্নাত জীবিত করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে ,তা এ প্রকার সুন্নাতের ব্যাপারে নয়।[১]

এখানে বিশেষভাবে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, তা হল সুন্নাতকে আঁকড়েধরা এবংতার অনুসরণ করার ফযীলতের ব্যাপারে হাদীসে আছে ঃ

---

১ ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ঃ মাকতূব নং ২৩১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৪/২২৯, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১/২৭৮, ১০/৪০৯–৪১১, ১১/৬৩২, ২৩/১১১, ১১২,

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد (رواه الطبراني في المعجم الأوسط، قال الإمام المنذري فى "الترغيب والترهيب" ١: ٨٠ بإسناد لا بأس به .

'আমার উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ (বিদআত ও মূর্খতা, অন্যায়-অপরাধ ইত্যাদি) ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি একজন শহীদের সাওয়াব পাবে।'[১]

এ হাদীসের অর্থ সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি উম্মতের ঈমানী বিপর্যয়ের সময় আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত (লেনদেন), আদব-আখলাক মোটকথা নববী পথ-পদ্ধতি

১. –আল মু'জামুল আওসাত–মাজমাউয যাওয়ায়েদ ঃ ১/৪১৮। এ হাদীসটি সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করা হয়ঃ من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد

'আমার উম্মতের মধ্যে যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন আমার সুন্নাতকে যে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে।'

উল্লেখ্য, সনদের আলোকে এ হাদীসের নির্ভরযোগ্য শব্দ সেটিই যা মূল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঃ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد

'আমার উম্মতের মধ্যে যখন ফিৎনা-ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়াব পাবে।'

সাধারণভাবে এ হাদীসটি যে শব্দে (একশত শহীদের সাওয়াব) উল্লেখ করা হয়, তার সনদ (সূত্র) দুর্বল। –মীযানুল ই'তিদাল ঃ ১/৫১৯

لأنه من غرائب الحسن بن قتيبة، وقد ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ١: ٥١٨، وأورد في ترجمته اللفظ المذكور ثم قال: قال ابن عدي: أرجو أنه لابأس به، قلت – الذهبي– بل هو هالك. قال الدار قطني في رواية البرقاني: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال العقيلي : كثير الوهم. انتهى .

وقد أورد المنذري الحديث في الترغيب والترهيب ١: ٨٠ كما يلي : «عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. رواه البيهقى من رواية الحسن بن قتيبة، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لابأس به إلا أنه قال: فله أجر شهيد». وهذا من المنذري إعلال للرواية المشهورة، وترجيح لرواية : أجر شهيد.

وعلى هذا فلا ينبغي رواية هذا الحديث بلفظ (فله أجر مئة شهيد) تاركا اللفظ المقبول، ولا يقال: إن الضعيف يقبل في الفضائل، فإن ذلك إذا كان ضعفه =خفيفا، وأما هذا فضعفه شديد كما تبين من أقوال الأئمة في الحسن بن قتيبة، كيف وقد خالف لفظه اللفظ الوارد بسند أصح منه، والله أعلم.

মোতাবেক পুরো দ্বীনের উপর অটল থাকবে, সে শহীদের সাওয়াব পাবে। কেননা, সুন্নাতের প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কাফেরদের সাথে মোকাবেলার চাইতে কম কষ্টকর নয়, বরং বহুলাংশে আরো কঠিন এবং দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।[১]

কেউ কেউ এ হাদীসটিকে এভাবে পেশ করে থাকেন, 'যে ব্যক্তি কোন মৃত সুন্নাতকে জীবিত করবে, সে শহীদের সাওয়াব পাবে।' স্মরণ রাখবেন, এটিও সম্পূর্ণ ভুল। কোন একটি মৃত সুন্নাত জীবিত করার সাওয়াব পূর্বোক্ত হাদীসে (১২৬ নং পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হয়েছে। বাকী থাকল শহীদের সাওয়াবের কথা। তা একটি মাত্র মৃত সুন্নাত জীবিত করার ব্যাপারে নয়। বরং এই সাওয়াব পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে গেলে দ্বীনের উপর নব্বী পথ-পদ্ধতি মাফিক দৃঢ়ভাবে আমল করার ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনী বিষয়গুলোকে যথার্থভাবে বুঝার তাওফীক দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ-পদ্ধতির উপর সুদৃঢ় থাকার তাওফীক দিন। আমীন!

ইত্তিবায়ে সুন্নাত সংক্রান্ত আরেকটি ভ্রান্তির অবসান

বিদআত, কুসংস্কার ও কুপ্রথা সুন্নাত পরিপন্থী। একথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো অজানা নয়। তবে একটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা হয় না। তা হল, অনেকে ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের অনুসরণ–অনুকরণের নামে অতিরঞ্জিত করে থাকে। ফলে সুন্নাত নয় এমন কিছু জিনিসকেও সুন্নাত মনে করে। অথচ যা সুন্নাত নয়, তাকে সুন্নাত মনে করাও বিদআত। তাই এ ব্যাপারেও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

উদাহরণ স্বরূপ, টুপির কথাই ধরা যাক। নবাী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পুরো উম্মতের মধ্যে টুপি পরিধানের সুন্নাতটি চলে আসছে। কিন্তু হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডারে কোথাও কোন বিশেষ প্রকারের টুপিকে সুন্নাত টুপি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। বলা হয়নি এ প্রকার টুপি সুন্নাত আর এ প্রকার টুপি খেলাফে সুন্নাত।

১.– জামিউল উলূমে ওয়াল হিকাম ঃ ২৩০, মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ১/২৫০

ومعلوم عند أهل العلم بالعربية الفرق الكبير بين «سنة من سنتي» وبين «سنتي».

এ ব্যাপারে মাসআলা হল, সমাজে যাকে টুপি নামে চিনে, আর তা বিজাতীয় কোন ইউনিফর্মও নয় এবং শরীয়ত সম্মত পোশাক সম্পর্কিত কোন মূলনীতি বিরোধীও নয়, এধরনের যে কোন টুপি দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

এখন যদি কেউ বলে, 'চার কল্লি বিশিষ্ট টুপিই সুন্নাত। এছাড়া কোন টুপি সুন্নাত নয়। বা পাঁচ কল্লি বিশিষ্ট টুপিই সুন্নাত, অন্য সকল টুপিই খেলাফে সুন্নাত। অথবা কিস্তি টুপিই সুন্নাত, অন্যগুলো সুন্নাত পরিপন্থী।' তাহলে এ ধরনের কথাবার্তা একেবারেই বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে এবং এটি বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সুন্নাত নয় এমন জিনিসকে সুন্নাত বলাও বিদআত।[১]

এমনিভাবে পাগড়ী পরিধান করা পোশাক সংশ্লিষ্ট একটি মুস্তাহাব আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন প্রমুখদের সাধারণ অভ্যাস ছিল পাগড়ী পরিধান করা। তাঁরা সচরাচর সব সময় পাগড়ী পরতেন। বিশেষভাবে যখন মজলিস সমাবেশে যেতেন। আর সে হিসেবে নামাযেও পাগড়ী পরিধান করে থাকতেন।

এমন একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যাবে না, যেখানে শুধু নামাযেই পাগড়ী পরার কথা আছে। তাই যদি কেউ পাগড়ীকে নামাযের সুন্নাত বলে অথবা পাগড়ী ছাড়া নামায পড়াকে মাকরূহ বলে, তাহলে মূলতঃ যা সুন্নাত নয় তাকে সুন্নাত বলার কারণে অজান্তেই সে বিদআতের শিকার হয়ে যাবে।[২]

এমনিভাবে মাথা মুণ্ডানোর বিষয়টি ধরা যাক। হজ্জের ইহরাম খোলার সময় চুল ছাটার চাইতে মুণ্ডানো উত্তম এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়ও মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত অথবা চুল খাটো করার চাইতে মুণ্ডানো উত্তম—এর কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

১. ١– يتبين ذلك بالوقوف على الأحاديث والآثار المتعلقة بالقلنسوة، مع معرفة حكمها من حيث الإسناد ومن حيث الفقه، وبالوقوف على أقوال أهل العلم المحققين بهذا الصدد ، ولي مقال مستقل في هذه المسألة قد أشبعت فيه البحث، ولله الحمد.

২. ٢– نص على أصل المسئلة في نفع المفتي والسائل: ٢٤٥، وامداد الفتاوى ٤: ٢٢٩، والأحاديث الواردة في فضل الصلاة بالعمامة كلها موضوعة أو مطروحة، كما فصلت الكلام فيها في رسالتي: الدعامة في أحاديث و آثار فضل العمامة نقلا عن أهل الفن، ومن ظن أن الأحاديث الواردة فيه ما بين ضعيف وشديد الضعف، فقد خلط بينهما وبين الأحاديث الواردة في فضل العمامة عامة، من غير تقييد بالصلاة.

হাদীসে অথবা সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে কোথাও নেই। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় মাথা মুণ্ডানোকে সুন্নাত বলা বিদআতেরই অন্তর্ভুক্ত।[১]

এমনিভাবে নখ কাটার কথাও উল্লেখ করা যায়। নখ কাটা সুন্নাতে মুআক্কাদা বরং ওয়াজিব। কিন্তু কি নিয়মে নখ কাটতে হবে, কোন্ আঙ্গুল হতে শুরু হয়ে কোন্ আঙ্গুলে শেষ হবে, এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীস নীরব। বুযুর্গানে দ্বীন বিভিন্ন হেকমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন নিয়ম বাতলিয়েছেন, যা মুবাহ তথা বৈধতার মান রাখে অথবা সর্বোচ্চ মুস্তাহ্সানে ফুকাহা বলা যেতে পারে। তাই বলে কোন বিশেষ নিয়মকে সুন্নাত বলার অবকাশ নেই।[২]

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। অবশেষে আমি পাঠকদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছি, তা হল—ঈমান ও ইসলাম মূলতঃ অনুসরণ-অনুকরণের নাম, জযবা পূর্ণ করার নাম নয়।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা একমাত্র উদ্দেশ্য। এটি নিজের মনগড়া চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। যে কোন নিয়মে নেক কাজ করার দ্বারাও অর্জিত হয় না। যদি তাই হত তাহলে আসমানী কিতাবের কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না কোন রাসূলেরও। কুরআন-হাদীসের হেদায়াত ছাড়াই একজন মানুষ আল্লাহওয়ালা হতে পারত। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তাই শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে রাসূলের মাধ্যমে আমরা যে শরীয়ত ও সুন্নাত লাভ করেছি, সে শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত করতে হবে আমাদের জীবনকে। তবেই হাছিল হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

---

১. ١—قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى٢١:١١٧-١١٨: حلق الرأس على وجه التعبد والتدين والزهد، من غير حج ولا عمرة بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة ...انتهى.

وأخطأ غير واحد في نقل مذهب أئمتنا في هذه المسئلة، كما وقع في العالمكيرية، ٥: ٣٥٧ وغيرها فلا ينبغي الاغترار، بل يجب الكشف عن منشأ الخطأ هناك. وليراجع امداد الفتاوى ٤:٢٢٩ و٢٢٤.

২. ٢—نص على عدم ثبوت شيء في كيفية قلم الأظافر غير واحد من الأئمة، فليراجع المقاصد الحسنة للسخاوي ٣٦٢، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ٢:٤١١.

যে কোন নিয়মে যে কোন নেককাজ করে নেওয়াই যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যথেষ্ট হত তাহলে শরীয়তের পক্ষ হতে ইবাদত করার কোন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল না। এমনি ভাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে নামায, রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইবাদতের জন্যে সময় নির্ধারণের কোন অর্থই হত না।

উদাহরণস্বরূপ ঃ কোন ব্যক্তি সুবহে সাদেকের সামান্য পর পর্যন্ত পানাহার করল, অপরদিকে সূর্যাস্তের দু' ঘন্টা পরও ইফতার করল না, তবুও তাকে শরীয়তে রোযাদার বলবে না। যদি যে কোন পদ্ধতিতে নেক কাজ সম্পাদন করা ইবাদত হত, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে রোযাদার না বলার কোন অবকাশ ছিল না। অথবা যে ব্যক্তি ১০/১৫ মিনিটে ঈশা নামায আদায় করে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ঘুমায়, শরীয়ত তাকে নেককার বলে। আর যে ব্যক্তি সারা রাত তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকে কিন্তু ঈশার ফরয আদায় করে না, শরীয়ত তাকে ফাসেক বলে। যে কোন পদ্ধতিতে নেক কাজ করাই যদি ইবাদত হত, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিই বড় বুযুর্গ হত। ফাসেক হওয়ার তো কোন প্রশ্নও উঠত না।

এমনি ভাবে শরীয়াতের মৌলিক ও শাখা পর্যায়ের যে কোন বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলেও এ কথাটি উত্তরোত্তর অকাট্য ও সুস্পষ্ট হতে থাকবে যে, ঈমান ও ইসলাম শুধু শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণের নাম। তাই আমাদের ঈমানী কর্তব্য হল—শুধু নিয়ত খালেস বা মূল কাজটি ভাল—এতটুকুতেই হাত গুটিয়ে না নেওয়া, বরং তার সাথে সাথে উক্ত কাজ সম্পর্কিত শরীয়ত ও সুন্নাতের যে সব হেদায়াত ও দিক নির্দেশনা আছে, সেগুলোও যথাযথ পালন করা।

শুধু এ গূঢ় রহস্যটি (শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণই ঈমান-ইসলাম) ভাল ভাবে বুঝে নিলে ইনশাআল্লাহ শরীয়ত পরিপন্থী বা সুন্নাত পরিপন্থী যে কোন (কুফরী, শিরকী, বিদআতী বা ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ) কথা ও কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

১২. কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত এবং যিকির আযকারের মজলিসে চিল্লা-ফাল্লা ও লাফা-লাফি করা

কুরআন কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

"যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন পাঠ করা হয় তাঁর কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের উপর ভরসা করে।"—সূরা আনফাল ঃ ২

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। আর আপন মনে স্বীয় পালন কর্তার স্মরণ করতে থাক। ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম ; সকালে ও সন্ধ্যায় আর বেখবর থেকো না।" —সূরা আরাফ ঃ ২০৪-২০৫

সূরা যুমারে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

"আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের চামড়ার উপর লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।" —সূরা যুমার ঃ ২৩

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

"আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন ; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।"
—সূরা মায়িদা ঃ ৮৩

যিকির–আযকার, তেলাওয়াত ও ওয়ায–নসীহতের মাহফিলগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রত্যেক মুহাক্কিক বুযুর্গের অবস্থা তা–ই হত যা উক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। অবস্থা বলতে অন্তরে খোদাভীতি সঞ্চারিত হওয়া, লোম কাঁটা দিয়ে উঠা, শরীর ও মন নরম হওয়া এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠা ইত্যাদি। এগুলোই মূলতঃ ঈমানের বিকাশ। এসব অবস্থা প্রশংসিত।

পক্ষান্তরে অনেকের অন্তর হল কঠিন। যিকির–আযকার, তেলাওয়াত ও ওয়ায–নসীহত ইত্যাদিতে তাদের অন্তর কোমল হয় না ; অন্তরে খোদাভীতির উদ্রেক হয় না। অন্তরের এ অবস্থা নিন্দনীয়। মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করে, অধিক পরিমাণে যিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন আনা শরীয়তে একান্ত কাম্য।

উপরোক্ত দু'প্রকারের লোক ছাড়াও তৃতীয় আরেক প্রকারের লোক রয়েছে। তারা যিকির–আযকার, তেলাওয়াত ও ওয়ায–নসীহতের মজলিসে চিৎকার দিয়ে উঠে, লাফাতে আরম্ভ করে, উন্মাদের ন্যায় বিভিন্ন কীর্তিকলাপ করতে থাকে। এরূপ কর্মকাণ্ড কতিপয় এমন বুযুর্গদের মুরীদদের মাঝেও পাওয়া যায়, যারা মৌলিকভাবে হকপন্থী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথে রয়েছেন।

স্মর্তব্য যে, অভ্যন্তরীণ শক্তির অভাবের কারণে যদি তারা সহ্য করতে না পারে এবং যিকির–আযকার, তেলাওয়াত ও ওয়ায–নসীহতে প্রভাবিত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায় এবং এসব কীর্তিকলাপ তাদের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে তাদেরকে অপারগ ধরা হবে।

কিন্তু এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও আছেন যাঁরা আত্মিক দিক থেকে সুদৃঢ়। তাঁদের অন্তর খোদাভীতিতে টুইটুম্বর হওয়া সত্ত্বেও চিৎকার করেন না, লাফালাফি করে না। তবে অত্যধিক প্রভাবিত হওয়ার সময় তাঁদের শরীর শিউরে উঠে, লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, চোখে অশ্রু দেখা দেয়–এ প্রকৃতির লোকই পরিপূর্ণ, মুহাক্কিক ও বিজ্ঞ। পূর্বোক্তদের তুলনায় তাঁরা অনেক অনেক গুণে উত্তম।

আর যারা ইচ্ছাপূর্বক চিৎকার, লাফ–ফাল ও নাচানাচি করে এবং একে তারা সাওয়াবের কাজ মনে করে অথবা লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করে, যাতে লোকেরা তাকে বড় বুযুর্গ মনে করে, তাহলে তাদের এ কাজ সম্পূর্ণ বিদআত ও রিয়ার শামিল হবে। আর এ দুটোই শিরকের প্রকারভুক্ত।[১]

ইচ্ছাপূর্বক চিৎকার ও লাফালাফির ব্যাপারে ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ

وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة، وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق:من آثار الزندقة، وقول أهل المخرقة، والله المستعان

"তথাকথিত সূফীরা উক্ত বিষয়ে এমন সব বিদআত সৃষ্টি করেছে, যেগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সঠিক পথের দাবীদারদের অনেকের উপর প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। সে ফলশ্রুতিতে অনেকেরই পক্ষ হতে পাগল ও বালকসুলভ আচরণ, যেমন তালে তালে নৃত্য ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এর অশুভ পরিণতি এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, তাদের কেউ কেউ একে ইবাদতে শামিল করে এবং আমলে সালেহ তথা পুণ্যকর্ম বলে সাব্যস্ত করে। আরো বলে যে, এটা অবস্থার উন্নতি সাধন করে। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এগুলো চরম ইসলামবিদ্বেষী যিন্দীকদের প্রভাব এবং নির্বোধদের প্রলাপ।"

—ফাতহুল বারী ঃ ২/৩৬৮, রিসালাতুল মুসতারশিদীন–এর টীকা ঃ ১১৩–১১৪

ইমাম শাতেবী (রহঃ) এ সম্পর্কে 'আল ইতিসাম'–কিতাবে আল্লামা আবু বকর আজুররী থেকে উদ্ধৃত এক দীর্ঘ আলোচনায় উল্লেখ করেন ঃ

ما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ، وينعقون ويتناشون، وهذا كله من الشيطان، يلعب بهم، هذا كله بدعة وضلالة.

---

[১] মাজমূউল ফাতাওয়া ঃ ১১/৬–১৩, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ঃ ১৬২–১৬৫, পান্দেনামা বাকী ঃ ৪৫–৪৬)

"ওয়ায–নসীহতের সময় অধিকাংশ মূর্খরা যে চিৎকার করে উঠে, লাফ–ফাল দেয়, মাতাল–মাতাল ভাব করে, এ সবই শয়তানী কর্মকাণ্ড। শয়তান ওদের সাথে খেলা করে। এগুলো বিদআত (দ্বীনে নতুন আবিষ্কার) ও ভ্রষ্টতা।" —আল ইতিসাম ঃ ১/৩৫৬

ইলমে তাসাওউফের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম শাইখ সোহরাওয়ারদী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আওয়ারিফুল মাআরিফ'–এ এ পর্যায়ের বানোয়াট লাফালাফি ও নাচানাচির করুণ পরিণতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, এরূপ প্রকাশে একে তো আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এখন তিনি মাগলুবুল হাল তথা অপ্রকৃতিস্থ, আত্মভোলা বুযুর্গ বনে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ এতে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়, যাতে তারা তাকে বুযুর্গ মনে করে। এ ধরনের আরো অনেক ক্ষতির দিক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

ويكثر شرح الذنوب في ذلك. فليتق الله ربه، ولايتحرك إلا إذا صارت حركته حركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلى الإمساك، وكالعاطس الذي لايقدر أن يرد العطسة، وتكون حركته بمثابة النفس الذي يدعوه إليه داعية الطبع قهرا.

"এ ব্যাপারে গোনাহের ব্যাখ্যা হবে অনেক দীর্ঘ। (যিকিরকারী বা যিকিরের মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তি) আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। ইচ্ছাপূর্বক সামান্যও নড়বে না (লাফ–ফাল দিবে না)। তবে যদি তার অবস্থা এমন রোগীর মত হয়, যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া ইচ্ছা করলেও বন্ধ করতে পারে না। কিংবা হাঁচি দাতার ন্যায় হয়, যে হাঁচিকে রোধ করতে পারে না, অথবা তার নড়াচড়া যদি শ্বাসের ন্যায় হয়ে যায়, যে শ্বাস গ্রহণে সে প্রকৃতিগতভাবে বাধ্য (তাহলে ভিন্নকথা)।"

—আওয়ারিফুল মাআরিফ ঃ ১১৮–১১৯, বাব ২৫

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যে সকল লোক তেলাওয়াত শুনে চিৎকার দিয়ে উঠে, লাফ–ফাল দেয়, তাদের পরীক্ষা এভাবে হতে পারে যে, তাদের একজনকে দেয়ালের উপর বসিয়ে

দাও, আর এমতাবস্থায় কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের ব্যবস্থা কর। এরূপ পরিস্থিতিতেও যদি সে ওয়াজ্দ তথা বিশেষ অবস্থার কারণে দেয়াল হতে পড়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে যে সে ওয়াজ্দের দাবীতে সত্যবাদী।[১]

আলোচনার শেষাংশে একথাটিও উল্লেখ করছি যে, এ চিৎকার, লাফালাফি ও নাচানাচি যদি গান বা এধরনের মজলিসে হয় (যা আজকাল বহু পীর–মুরীদদের মধ্যে 'সামা'–এর নামে প্রচলিত) তাহলে তা কোন ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ছাড়াই সরাসরি হারাম বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে ২৩২–২৩৫ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৩. স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইল্‌হামকে শরীয়তের দলীল মনে করা অথবা এগুলো অর্জন করার পিছনে লেগে থাকা

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ তাসাওউফ পন্থীদের মধ্যে একটি রোগ এ–ও যে, খাব–স্বপ্নের প্রতি তারা খুব গুরুত্বারোপ করে থাকে। ভাল স্বপ্ন কম দেখতে পাওয়াকে তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হতে দূরে সরার আলামত মনে করে। ভাল স্বপ্ন দেখলে তাসাওউফ ও সুলূকের আসল উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে ভেবে গর্ববোধ করতে থাকে। উত্তরোত্তর ভাল স্বপ্ন দেখার লালসায় থাকে। আর কোন মন্দ স্বপ্ন দেখলে পেরেশান হয়ে যায়। অথচ শরীয়তে স্বপ্নের না এই মান আছে, যার কারণে তাকে আসল উদ্দেশ্য মনে করা যায় এবং না এই মর্যাদা আছে, যার ফলে পেরেশান হওয়া যায়।

তার চাইতে বড় আফসোসের কথা হল যে, কতক মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ এই স্বপ্নকে শরীয়তের দলীলের মর্যাদা দিয়ে থাকে। নিজের স্বপ্ন, পীর সাহেবের স্বপ্ন বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্ন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট আমল, অভিমত ইত্যাদি শক্তিশালী বা দুর্বল করার জন্যে প্রমাণ দিয়ে থাকে। স্বপ্নের ভিত্তিতে পীর মনোনীত করে থাকে। স্বপ্নের ভিত্তিতে আরো না জানি কত কি ঘটিয়ে থাকে!

অথচ দ্বীনের কোন মাসআলাতেই শরীয়ত স্বপ্নকে দলীলের মর্যাদা দেয়নি। দুনিয়াবী ব্যাপারেও স্বপ্ন মোতাবেক আমল করার জন্যে এ শর্তারোপ করেছে যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু কুরআন হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোন দলীলের পরিপন্থী না হতে হবে এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন মূলনীতিরও খণ্ডন করা যাবে না।

১—মাজমূউল ফাতাওয়া ঃ ১১/৭–৮ , আল ইতিসাম ঃ ১/৩৪৮–৩৫৮

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب.

"ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয়। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে হয়। কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে থুথু দেবে, আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এ দুঃস্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবেও না। আর ভাল স্বপ্ন দেখলে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং এ স্বপ্নের কথা একান্ত বর্ণনা করতে হলে মহব্বতের লোকদের নিকটই বর্ণনা করবে।"

—সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৬

অন্য হাদীসে আছে ঃ

الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرأ نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس.

"স্বপ্ন তিন প্রকার। এক, ভাল স্বপ্ন—এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুসংবাদ স্বরূপ। দুই, শয়তানের পক্ষ হতে পেরেশানকারী স্বপ্ন। তিন, কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখে তাহলে সে যেন উঠে নামায আদায় করে এবং মানুষের কাছে সে স্বপ্ন বর্ণনা না করে।" —সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৯, জামে তিরমিযী ঃ ২/৫৩ হাদীস২২৭০

এ হাদীস দু'টির আলোকে স্বপ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ভাল স্বপ্নও সুসংবাদই মাত্র, কোন দলীল নয়। আর এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্বপ্ন কোন দলীল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যদি কোন প্রকারের স্বপ্ন দলীল হতে পারত, তাহলে শুধু প্রথম প্রকারটিই হত যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তবে কোন্‌টি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, শরীয়ত তার কোন পরিচয় দেয়নি। শুধু এতটুকু বলেছে যে, সেটি ভাল স্বপ্ন। আর এ কথা সকলেই জানে যে, পার্থিব ব্যাপারে মানুষ যদিও ভাল–মন্দ বিবেক দ্বারা

বুঝতে পারে, কিন্তু দ্বীনী ব্যাপারে ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরীয়তের কোন দলীল ব্যতীত সম্ভব নয়। এজন্যে কোন স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বলতে গেলে শরীয়তের কোন না কোন দলীলের আশ্রয়ই নিতে হবে। কাজেই স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে না।

উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত হাদীসে মন্দ স্বপ্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, শরীয়ত পরিপন্থী কথা বা শরীয়ত বিষয়ক দলীলবিহীন কথা নিশ্চয়ই মন্দ। এ প্রকার স্বপ্ন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী নিশ্চিত ভাবে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা দ্বারা প্রমাণ দিল, সে যেন প্রকারান্তরে শয়তানের কথা দ্বারাই প্রমাণ দিল।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বিদআতীদের ভ্রান্ত দলীলসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح، فقال لنا: اتركوا كذا، واعملوا كذا، ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي كذا ، وأمرني بكذا، فيعمل بها، و يترك بها، معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا... فلو رأى في المنام قائلا يقول: إن فلانا سرق فاقطعه، أوعالم فاسئله، أواعمل بما يقول لك فلان، أوفلان زنى فحده، وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل، حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي.....

ويحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي، فلما رآه، قال: علي بالسيف والنطع. قال: و لم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية، فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا

أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام، فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحيى المهدي، وقال: اخرج عني، ثم صرفه و أبعده...

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم ، فلا بد من النظر فيها أيضاً ، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالعمل بما استقر، وإن أخبر بمخالف فمحال، لأنه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائ النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه.

"এ সকল বিদআতীদের মধ্যে দলীলের বিচারে সবচাইতে দুর্বল হল সে দল, যারা তাদের আমল ও হুকুম গ্রহণের ভিত্তি বানিয়েছে এসব স্বপ্নকে। এ স্বপ্নের ভিত্তিতেই কোন আমলের দিকে অগ্রসর হয় বা পশ্চাদপদ হয়। আর বলে থাকে যে, আমরা অমুক নেককার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা অমুক কাজ করো না অথবা অমুক কাজ কর।" তাসাওউফের দাবীদারদের মধ্যে এসব বেশী হয়ে থাকে।

কখনো বা তাদের কেউ বলে থাকে, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে এরূপ বলেছেন। তিনি আমাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সে শরীয়তের সীমা লংঘন করতঃ স্বপ্ন মোতাবেক আমল করে বা কোন কাজ বর্জন করে। এ সবই ভুল। কেননা, শরীয়তে কোন অবস্থাতেই নবীগণের স্বপ্ন ব্যতিরেকে কারো স্বপ্ন মোতাবেক নির্দেশ জারী করা যায় না। অবশ্য আমাদের কাছে শরীয়তের যে বিধানাবলী রয়েছে, স্বপ্নকে সেগুলোর মানদণ্ডে বিচার করা হবে। যদি শরীয়ত সে স্বপ্নকে সমর্থন করে তাহলে সে মোতাবেক আমল করা যেতে পারে। নতুবা তা পরিত্যাগ করা, তা হতে বিরত থাকা আবশ্যক। স্বপ্নের উপকারিতা শুধু এতটুকুই যে, তা দ্বারা সুসংবাদ বা সতর্কতার নসীহত গ্রহণ করা। স্বপ্নের মাধ্যমে নতুন কোন বিধান লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়......।

সুতরাং, কেউ যদি কাউকে বলতে শুনে যে, 'নিশ্চয় অমুক ব্যক্তি চুরি করেছে, তুমি তার হাত কেটে দাও ; অমুক ব্যক্তি আলেম, তুমি তার কাছ থেকে ইলম আহরণ কর ; অমুক ব্যক্তির কথা মত কাজ কর অথবা অমুক ব্যক্তি যেনা-ব্যভিচার করেছে, তুমি তাকে হদ্দ (দণ্ড) লাগাও ইত্যাদি; তাহলে

স্বপ্ন দর্শনকারীর জন্যে সে মোতাবেক কাজ করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তার কোন সাক্ষী থাকবে। সাক্ষী ছাড়া স্বপ্ন মোতাবেক করলে সে শরীয়ত গর্হিত কর্মসম্পাদনকারী বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন ওহী নেই......।

বর্ণিত আছে, একদা বিচারপতি শরীক ইবনে আবদুল্লাহ খলীফা মাহদীর দরবারে গেলেন। খলীফা তাকে দেখেই একজনকে নির্দেশ দিলেন ঃ তরবারী দিয়ে আগন্তুককে আক্রমণ কর। বিচারপতি বললেন ঃ অপরাধ কি? হে আমীরুল মুমিনীন! বাদশা বললেন, আমি স্বপ্নে তোমাকে আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরে থাকতে দেখেছি। আমার এ স্বপ্ন তাবীরকারকের নিকট বর্ণনা করলে সে আমাকে বলেছে যে, (তুমি) প্রকাশ্যে আনুগত্য দেখাও আর আড়ালে বিরোধিতা করে থাক।

জবাবে শরীক ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার স্বপ্ন খলীলুল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)এর স্বপ্ন নয়। আর তাবীরদাতা ইউসুফ (আঃ) নয়। এরূপ মিথ্যা স্বপ্নের ভিত্তিতে মুমিন-মুসলমানদের গর্দান উড়িয়ে দেবেন? খলীফা মাহদী এতে লজ্জিত হন এবং বলেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও! তারপর তাকে দূরে সরিয়ে দেন.........।

আর কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন হুকুম করছেন, তাহলে সে ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা, যদি সে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত) শরীয়ত সমর্থিত কোন হুকুম পালনের কথা স্বপ্নে শুনে থাকে, তাহলে হুকুম পালন শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেকই হল, (স্বপ্নের কারণে নয়) আর যদি স্বপ্নে শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম পালনের কথা শুনে থাকে, তাহলে এ শ্রবণ অবশ্যই ভুল। কেননা, এটা অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর জীবদ্দশার শাশ্বত শরীয়তকে তিনি স্বপ্নে রহিত করে দেবেন। এরূপ ধারণা কুরআন হাদীস এবং উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল। কাজেই যদি স্বপ্নে কেউ শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু দেখে, তাহলে সে মোতাবেক কোন আমল করা যাবে না।"

—আল ইতিসাম ঃ ১/৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪

আর এ হাদীস ঃ من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখল। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"[১]

তার মধ্যে যদিও দেখার সত্যতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কথা ঠিক ঠিকভাবে শোনা, সঠিকভাবে বুঝা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যথাযথ স্মরণ থাকা, সেগুলোর কোনটির সত্যতা অথবা তাতে শয়তানের কোন প্রকার প্রভাব না থাকার নিশ্চয়তা এ হাদীসে দেওয়া হয়নি।[২]

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) উল্লেখ করেন ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন— اشرب الخمر 'তুমি মদপান কর।'

তখন আলী আল্ মুত্তাকী (রহঃ মৃত্যু ৯৭৫হিঃ) জীবিত। তাঁর নিকট তা'বীর জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لاتشرب الخمر 'তুমি মদপান করো না।' আর শয়তান তোমার নিকট ব্যাপারটি পাল্টিয়ে দেয়। তাছাড়া ঘুমের সময় ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়। জাগ্রত অবস্থায়ই যেহেতু কোন বহির্গত কারণে বা শ্রোতার নিজের কারণে বক্তার বক্তব্যের বিপরীত শ্রবণ করা সম্ভব। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় তা আরো স্বাভাবিক।"

—ফয়যুল বারী ঃ ১/২০৩

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ অসিয়ত করেছেন ঃ

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما،كتاب الله وسنة نبيه.

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম, যতদিন তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এক ঃ আল্লাহ তাআলার কিতাব, দুই ঃ তাঁর নবীর সুন্নাত।"

—মুআত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) ঃ ৩৬৩, তামহীদ ঃ ২৪/৩৩১

১—সহীহ বুখারী ঃ ২/১০৩৬, হাদীস ৬৯৯৪, সহীহ মুসলিম ঃ ২/২৪২, হাদীস ৫৮৭৩

২—ফয়যুল বারী ঃ ১/২০৩, শরহে মুসলিম লিন্নবৰী ঃ ১/১৮, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ঃ ৪/৪৫২—৪৫৩

তিনি এ কথা ইরশাদ করেননি যে, তোমরা স্বপ্নযোগে আমার পক্ষ থেকে যা লাভ করবে সে মোতাবেক আমল করবে, (নাঊযুবিল্লাহ) স্বপ্নের দ্বারা কুরআন–হাদীস বর্জন করবে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে নতুন নতুন কথা দ্বীন–ইসলামে দাখেল করবে। নাঊযুবিল্লাহ।

মোটকথা, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়াবলীর সত্য–মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের জন্যে শরীয়ত যেহেতু শরীয়ত ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কোন মানদণ্ড নির্ধারণ করেনি, কাজেই এটি শরীয়তের কোন স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে না, বরং শরীয়তের আলোকেই তার যাচাই বাছাই হবে। তাছাড়া স্বপ্নতো স্বপ্নই। এ মর্মে সকল বিবেকবানদের ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্ন পার্থিব কর্মকাণ্ডেও তেমন কোন গুরুত্ব রাখে না। সুতরাং স্বপ্নকে শরীয়তের কোন বিষয়ে দলীল গণ্য করা একই সাথে বিবেক ও শরীয়তের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম

কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকেও তথাকথিত কতক তরীকতপন্থী স্বপ্নের ন্যায় বড় করে দেখে। কাশ্‌ফের মাধ্যমে কোন কথা জানতে পারাকে বুযুর্গীর সনদ মনে করে থাকে। আর কেউ কেউ তো অতিরঞ্জিত করতঃ কাশ্‌ফ ও ইলহামকে শরীয়তের দলীলই মনে করে এবং শুধু কাশ্‌ফ ও ইলহাম অর্জন করার জন্যে সুন্নাত নয়, এমন অনেক মুজাহাদায় লিপ্ত হয়। অথচ কুরআন–হাদীসে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামকে কখনো এই মান দেওয়া হয়নি। দ্বীনী ব্যাপারে তাকে দলীলের মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডেও সে মোতাবেক আমল করার জন্যে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার বিষয়বস্তু কুরআন–সুন্নাহ বা শরীয়ত পরিপন্থী না হতে হবে এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন নীতিমালা ও ধারা খণ্ডিত না হতে হবে।

কাশ্‌ফ

অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্‌ফ বলা হয়। এ কাশ্‌ফ কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনো বাস্তব পরিপন্থী হয়। তাই এটি শরীয়তের কোন দলীল তো নয়ই, উপরন্তু একে শরীয়তের দলীলসমূহের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী।

এমনিভাবে কাশ্‌ফ ইচ্ছাধীন কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে অথবা সাওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশ্‌ফ হওয়ার জন্যে বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্‌ফ তো ইবনুস সায়্যাদের মত দাজ্জালেরও হত। সুতরাং কাশ্‌ফ বুযুর্গ হওয়ারও দলীল হতে পারে না।[১]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী (রহঃ) বলেন, "বুযুর্গদের যে কাশ্‌ফ হয়ে থাকে তা তাঁদের ক্ষমতাধীন নয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন। কত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছেলে হযরত ইউসূফ (আঃ)এর কোন খবর তাঁর ছিল না। অথচ খবর না পাওয়ার কারণে যে কষ্ট তিনি পেয়েছেন তা সবারই জানা, কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যদি কাশ্‌ফ ইচ্ছাধীন কোন কিছু হত, তাহলে ইয়াকুব (আঃ) কেন কাশ্‌ফের মাধ্যমে খবর পেলেন না? আর যখন বিষয়টি জানার সময় হল তখন বহু মাইল দূর হতে হযরত ইউসুফ (আঃ)এর জামার ঘ্রাণ পর্যন্ত পেতে লাগলেন।

সুতরাং, কাশ্‌ফ যখন কারো নিজ ইচ্ছাধীন নয়, তখন এটাও অপরিহার্য নয় যে, বুযুর্গদের সর্বদা কাশ্‌ফ হতেই থাকবে। বাস্তব কথা হল, কাশ্‌ফ হওয়া কোন ফযীলতের কথা নয়। এমনকি যদি কোন কাফেরও রিয়াযাত মুজাহাদা করে, তাহলে তারও কাশ্‌ফ হয়ে থাকে। পাগলেরও কাশ্‌ফ হয়ে থাকে।—ইল্‌ম ও আমল—বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ২১৫–২১৬

মাওলানা থানভী (রহঃ) আরো বলেন ঃ লোকেরা কাশ্‌ফ হওয়াকে বড় কৃতিত্ব মনে করে। অথচ নৈকট্য অর্জনে এর কোন ভূমিকা নেই। কাশ্‌ফের সাথে কারো স্বভাবতই সম্পর্ক থাকে, কারো থাকে না। যেমন কেউ প্রকৃতিগতভাবেই দূরদর্শী হয়, আর কেউ হয় নিকটদর্শী। কাশ্‌ফের সাথে কতকের স্বভাবগত সম্পর্ক থাকে না, হাজার রিয়াযাত মুজাহাদা করলেও সারা জীবনেও কাশ্‌ফ হয় না।

আসল জিনিস হল আল্লাহ তাআলার গোলামী। আল্লাহর কসম! যদি কারো হাজারো কাশ্‌ফ হয় এবং সে নিজের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে যে, অণুপরিমাণও তার উন্নতি হয়নি। পক্ষান্তরে সে

১—মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুয়া ঃ ১১–১১৪, রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৭–১৯, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ঃ ১৯১–১৯২, শরীয়ত ও তরীকত ঃ ৪১৬–৪১৮, আত–তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৩৭৫, ৪১৯

যদি দু' চারবারও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়ে স্বীয় অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করে, তাহলে পরিস্কার উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলার কিছু না কিছু নৈকট্য লাভ করেছে। সুস্থ রুচিবানরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।[১]

আর কাশ্‌ফ দলীল না হওয়ার ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম শাইখ আবূ সুলাইমান দারানী (রহঃ মৃত্যু ২০৫ হিঃ)এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة.

"প্রায়ই আমার অন্তরে তাসাওউফের কোন ভেদতত্ত্ব উদয় হয়, কিন্তু আমি তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদ্বয়—কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল–এর সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করি না।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ৮/৪৭৩

এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) স্বীয় পত্রাবলীতে বলেন, "ওয়াজ্‌দ ও হাল তথা তাসাওউফের বিশেষ অবস্থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের নিক্তিতে পরীক্ষা না করা হবে, সামান্য মূল্য দিয়েও ক্রয় করি না। অনুরূপ কাশ্‌ফ–ইল্‌হামসমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধ যবতুল্য হওয়াও পছন্দ করি না।"

—ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ঃ ১২৪, মাকতূব নং ২০৭

ইল্‌হাম

ইল্‌হামের পারিভাষিক অর্থ হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইল্‌হাম কাশ্‌ফেরই প্রকার বিশেষ। ইল্‌হাম সহীহ হলে তাকে ইল্‌মে লাদুন্নীও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল ইল্‌হামও স্বপ্নের ন্যায় কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয় এবং কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম–আহকাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু শরীয়ত পরিপন্থীও নয় বা যে ইলহাম শরীয়তের কোন হুকুম–আহকাম সম্পৃক্ত কিন্তু তার পক্ষে শরীয়তে দলীলও বিদ্যমান আছে, শুধু এধরনের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তাআলার

১—আশরাফুস সাওয়ানেহ—বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ২১৬–২১৭

তরফ থেকে হয়েছে, এটি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বলে পরিগণিত হবে, এ ব্যাপারে তাঁর শোকর আদায় করা দরকার। আর যদি ইল্‌হামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তা শয়তানের প্রলাপ মাত্র। এ ধরনের ইল্‌হাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ফরয।[১]

হাদীস শরীফে আছে ঃ

إن للشيطان لمة، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد من الآخر، فليتعوذ من الشيطان الرجيم، ثم قرأ :الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.

"নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়। শয়তানের উদ্রেক হল মন্দ **ওয়াদা** এবং সত্য অস্বীকার করা। ফেরেশতার উদ্রেক হল, কল্যাণের **প্রতিশ্রুতি দান** এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, তাকে **বুঝতে হবে যে,** তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তাই তার প্রশংসা করা উচিত। **আর যে** ব্যক্তি দ্বিতীয়টি অনুভব করবে, তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করতে হবে। অতঃপর তিনি (সূরা বাকারার ২৬৮-নং) আয়াত পাঠ করেন, অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।'[২]

এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইল্‌হাম কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই ইল্‌হাম হক বাতিলের মাপকাঠি হতে পারে না এবং শরীয়তের কোন দলীল হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইল্‌হাম হওয়ার আলামত শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা হক ও ভাল। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে

১ —ফাতহুল বারী ঃ ১২/৪০৫ কিতাবুত্তাবীর, বাব ১০, রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৬-২২, তাবসিরাতুল আদিল্লা ঃ ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইল্‌হাম ওয়াল কাশ্‌ফি ওয়াররুয়া ঃ ১১-১১৪

২ —সুনানে নাসায়ী কুবরা ঃ ৬/৩০৫, হাদীস ১১০৫১, জামে তিরমিযী ঃ ২/১২৮, হাদীস ২৯৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ঃ ৩/২৭৮ হাদীস ৯৯৮

না যে, হক ও ভালোর একমাত্র মাপকাঠি হল কুরআন, সুন্নাত ও শরীয়তের অন্যান্য দলীলসমূহ।

ফিক্হ ও আকাইদ বিষয়ক আইম্মায়ে কেরাম ছাড়াও হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরাম এ কথার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কাশ্ফ ও ইল্হাম শরীয়তের কোন দলীল নয়, বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে কাশ্ফ ও ইল্হামের বিচার-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। পিছনে কাশ্ফের আলোচনায় ইমাম আবূ সুলাইমান দারানী এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সূফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহঃ মৃত্যু ৯৭৩ হিঃ) স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেছেন যে, ইল্হাম কোন দলীল নয়। তিনি আরো বলেন—

قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا وأضلوا ، ولنا في ذلك مؤلف سميته : حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام ، وهو مجلد لطيف .

"এ ক্ষেত্রে (ইল্হামকে দলীল মনে করতঃ) বহু লোকের পদস্খলন ঘটেছে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আমি এর খণ্ডনে একটি বইও লিখেছি। তার নাম হল, 'হদ্দুল হুসাম ফী উনুকি মান আতলাকা ঈজাবাল আমালি বিল ইল্হাম'। —রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৭

সূফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ সারী সাকাতী (রহঃ মৃত্যু ২৫৩ হিঃ) বলেন— من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط

"যে ব্যক্তি এমন বাতেনী ইলমের (ইল্হাম) দাবী করে, যাকে যাহেরী শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি বিরাট ভুলের মাঝে পতিত আছে।"—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

ইমাম আবূ সাঈদ খাররায সূফী (রহঃ মৃত্যু ২৭৭হিঃ) বলেন—

كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.

"ঐ সকল বাতেনী ফয়েয (ইল্হাম) যা যাহেরের (শরীয়তের) পরিপন্থী, তা ভ্রান্ত।"—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইল্হাম সম্পর্কে একটি সর্ববিদিত মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সবই ইচ্ছাশক্তির বাইরের বস্তু। কাজেই এগুলো শরীয়তের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং শরীয়তের কাম্য বস্তুও হতে

পারে না। যদি শরীয়তে এগুলো কাম্য হত, তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দিতেন। তাছাড়া যদি এগুলো হাছিল হয়েও যায় তবে সেগুলোর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় শরীয়তের দলীল ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই, তাই বিধানের ভিত্তি শরীয়তের দলীলসমূহের উপরই হল, খাব-কাশ্ফ-ইল্হামের উপর নয়।

খাব-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি শরীয়তের দলীল হত, তাহলে এগুলো অর্জন করার নির্দেশও দেওয়া হত। অথচ কুরআন-হাদীসে এগুলো অর্জনের নির্দেশ তো দূরের কথা, উৎসাহ প্রদানের একটি বর্ণ পর্যন্ত বিদ্যমান নেই। আর শরীয়তের ইল্ম অর্জন করার তাকিদ-উৎসাহ এবং ইল্ম থেকে বিরত থাকার নিষেধাজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত-হাদীস বিদ্যমান।

দ্বীনের ভিত্তি যদি কাশ্ফ, ইল্হাম বা স্বপ্নের উপর হত, তাহলে কুরআন-হাদীসেরও কোন প্রয়োজন ছিল না, যরূরত ছিল না শরীয়তের বিভিন্ন গ্রন্থের। দরকার ছিল না উলামায়ে কেরাম, দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াত-তাবলীগ কোন কিছুরই।

খাব-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি দলীল হয় তাহলে যার যা ইচ্ছা সে তা-ই খাব-কাশ্ফ-ইল্হামের দাবী করে আদায় করে নেবে। যার মনে চাইবে সে কাশ্ফ-ইলহামের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে ; তার জমি-জিরাত সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে দিবে অথবা উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিবে। আর দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যখন নিজে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তখন স্বপ্ন বা কাশফের দোহাই দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নিবে। তখন আদালতেরও কিছু বলার থাকবে না, প্রতিপক্ষেরও কিছু বলার থাকবে না; যেহেতু খাব-কাশ্ফ-ইল্হাম স্বীকৃত দলীল!! সুতরাং একটু চিন্তা করা উচিত। এর চাইতে বোকামী, বেদ্বীনী ও বল্গাহীনতা আর কি হতে পারে?

উম্মতের কারো খাব-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি দলীল হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে দ্বীনের খাব-কাশ্ফ-ইল্হামই দলীল হত। কিন্তু তাঁদের কেউ কখনো দ্বীনী মাসআলার ব্যাপারে এ সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি এবং তার ভিত্তিতে দ্বীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধান থেকেও বিমুখ হননি। তাঁদের সম্মুখে যখন শরীয়তের কোন দলীল তুলে ধরা হত, তখন তাঁরা কখনো একথা বলতেন না যে, আমি তো কাশ্ফ-ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে এর বিপরীত জানতে পেরেছি।

এ পর্যন্ত খাব–কাশ্ফ–ইল্হাম শরীয়তের কোন দলীল না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আর যে সকল বেদ্বীন তাসাওউফ দাবীদাররা খাব–কাশ্ফ–ইল্হামকে কুরআন–হাদীসেরও উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকে, তারা শরীয়তের ইল্ম অর্জনের পরিবর্তে একে হেয় করে। শরীয়তের ইলমকে তারা পুঁথিগতবিদ্যা নামে অবজ্ঞা করে। আর তাদের (শরীয়ত পরিপন্থী) সেসব খাব–কাশ্ফ–ইল্হামকে ইলমে লাদুন্নীর নাম দিয়ে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে লাভ হয়েছে বলে মনে করে থাকে। শরীয়তের ইল্মকে তারা বলে জনসাধণের ইলম। (এবং তাদের মতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীন সবাই জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত।) পক্ষান্তরে তাদের কাশ্ফ ইল্হাম ও স্বপ্নকে বলে বিশেষ লোকদের ইল্ম। দ্বীন ও ঈমানের সাথে এ সকল লোকের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। তারা সম্পূর্ণ বেদ্বীন ও দ্বীনদ্রোহী। তাদের কুফরীসমূহের কিছু আলোচনা ১৫৫–১৮৫, ২৫৩, ২৫৮–২৬০ পৃষ্ঠায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৪. পীর সাহেবের কথা ও কাজকে দ্বীনের স্বতন্ত্র দলীল মনে করা অথবা তাঁর সকল কথা ও কাজকে অনুসরণীয় মনে করা[১]

সাধারণ মানুষের বড় ধরণের একটি ভুল এ–ও যে, তারা পীর সাহেবকে নিষ্পাপ মনে করে। সকল কাজে–কর্মে ও কথায় তাঁকে অনুসরণীয় মনে করে থাকে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, যেন তাদের নিকট পীর সাহেবের কথা ও কাজ দ্বীনের স্বতন্ত্র কোন দলীল !

অথচ এটি দ্বীনের ইজমাঈ মাসআলা যে, নবী–রাসূল ব্যতীত আর কেউ নিষ্পাপ নয়। এমনিভাবে এ–ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, পীর সাহেবের কথা ও কাজ শরীয়তের স্বতন্ত্র কোন দলীল নয়। তবে যে পীর সাহেবের যাহের ও বাতেন শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত তিনি অবশ্যই অনুসরণীয়।

---

১. উলামায়ে কেরাম এসম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ)–র 'আল্ ই'তিদাল ফী মুতাবাআতির রিজাল' পুস্তিকাটি দেখতে পারেন। এটি 'তরবিয়াতুস সালেক' ৩/১২–১৫ এবং 'মাআরেফে হাকীমুল উম্মত' ৬৯৫–৬৯৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু তিনি মা'সূম তথা নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে যদি শরীয়ত অসমর্থিত কোন কথা বা কাজ তাঁর থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটিকে দলীল বানিয়ে শরীয়তের মাসআলার বিরোধিতা করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

শরীয়তের মাসআলার মূল উৎস হল কুরআন, হাদীস ও ইজমা। পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে শরীয়তের অন্যান্য দলীলসমূহ। উক্ত সকল প্রকার দলীলে সরাসরি বর্ণিত মাসআলাসমূহ অথবা সে সকল দলীলের আলোকে উৎসারিত মাসআলাসমূহ ফিক্হের কিতাবসমূহে সংকলিত আছে। তাই মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস ও ফিক্হের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই প্রশ্নে পীর ও মুরীদ সকলের একই বিধান।

হক্কানী পীর মাশায়েখের মধ্যে এমন একজনের নামও খোঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি নিজের ভুলত্রুটি নয় বরং ব্যক্তিগত মতামতও দলীল বিহীন অন্যের উপর চাপানোর কোশেশ করেছেন। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁদের চরিত্র ও আদত এতই উন্নত ও পূত-পবিত্র ছিল যে, নিজের মুরীদও ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করলে সাথে সাথে অকপট চিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে সত্যকে গ্রহণ করতেন। এসম্পর্কে অসংখ্য ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

শাইখ নাসীরুদ্দীন দেহলভীর এই ঘটনা তো অতি প্রসিদ্ধ যে, তিনি নিজ পীর নিযামুদ্দীন আওলিয়ার (রহঃ) কোন কাজ সম্পর্কে আপত্তি করতে গিয়ে অন্যান্য মুরীদের নিকট বলেছিলেন ঃ فعل مشایخ حجت نباشد অর্থাৎ পীর মাশায়েখের কর্ম দলীল হতে পারে না। নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) একথা শুনতে পেয়ে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে স্পষ্ট বলে দিলেন ঃ نصیر الدین راست می گوید 'নাসীরুদ্দীন সত্য বলছে।'

—আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল্ চিশতিয়াতিল আলিয়্যা—ইসলাম আওর মূসীকী ঃ ৩৩৩-৩৩৪, তাযকিরাতুর রশীদ ঃ ১/১২৩

নিকটতম অতীতের ইমাম বুযুর্গ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)-এর ব্যক্তিত্বের কথা কে না জানে! লোকেরা তাঁর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা প্রমাণ দিতে চাইলে তাঁরই খাছ মুরীদ মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রহঃ) স্পষ্ট বলেদেন ঃ

"পীর মাশায়েখের কথা ও কাজ দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মুজতাহিদীনে কেরামের

কথা ও কাজ দ্বারা দলীল প্রদান করা যায়। কাজেই শরীয়তের মাসআলার ক্ষেত্রে হযরত হাজী সাহেবের কথা বলে কোন লাভ হবে না।"

—ফাতাওয়া রশীদিয়া ঃ ১/৯৮—ইতমামুল বুরহান ঃ ২৯২

তিনি আরো বলেন ঃ "যদি কারো পীর সাহেব শরীয়ত বিরোধী কোন কিছুর নির্দেশ দেন তাহলে তা মানা জায়েয হবে না, বরং পীর সাহেবকে শোধরিয়ে দেওয়া মুরীদের অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, প্রত্যেকেরই পরস্পরের উপর হক রয়েছে। পীর সাহেব তো আর নিষ্পাপ নন, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পীর সাহেব কোন মাসআলা যা দৃশ্যতঃ শরীয়ত পরিপন্থী বলে মনে হয় তা শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুরীদের জন্যে তা গ্রহণ করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

সুতরাং কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে শোভণীয় নয় যে, পীরের হাতে নিজকে এমন ভাবে সঁপে দিবে যে, কোন আদেশ-নিষেধের খবর থাকবে না।

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

'সৃষ্টিকর্তার নাফরমানিতে সৃষ্টির কোন কথাই মান্য করা যাবে না।' —এই হাদীসের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। কেউ এই বিধানের উর্ধ্বে নয়।

এ কারণেই পীর মাশায়েখ স্বীয় আলেম মুরীদ দ্বারা মাসআলা তাহকীক করেন এবং আপন ভুল ধারণা থেকে ফিরে আসেন।"

—তাযকিরাতুর রশীদ ঃ ১/১২২-১২৩

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) সম্পর্কে মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রহঃ) উক্ত কথাটি তাঁর জীবদ্দশায় বলেছিলেন। তথাপি হাজী সাহেব (রহঃ) তাঁর প্রতি কোনরূপ মন খারাপ করেননি। অধিকন্তু তিনি গঙ্গুহী (রহঃ) সম্পর্কে বলতেন ঃ হিন্দুস্থানে আমার প্রিয় মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেবের বরকতময় অস্তিত্বকে বিরাট গনীমত, মহাদান এবং পরম পাওয়া জ্ঞান করে আপনারা তাঁর ফয়েয ও বরকত হাসিল করুন। কেননা, মাওলানা সাহেব যাহেরী ও বাতেনী সকল গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের আধার এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই তাঁর সকল গবেষণা ও তাহকীক। তাঁর মাঝে প্রবৃত্তির আভাসও নেই।"—কুল্লিয়্যাতে ইমদাদিয়া ঃ ১১৭

হক্কানী পীর মাশায়েখ এবং তাঁদের মুরীদদের মধ্যকার এ প্রকারের ঘটবন্যাবলী সর্বযুগে ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। সারকথা হল, পীর মাশায়েখের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে এমন অতিরঞ্জিত করা যে, তিনি যদি অজান্তে

শরীয়ত পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেন তাহলে তাও পালন করা মূলতঃ সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি একটি মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি যা মুনাফেকদের মাঝে পাওয়া যেত। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

"তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌কে এবংতাঁর রাসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী।"(সূরা তওবা ঃ ৬২)

—আনফাসে ঈসা—বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ৬৪৭

সুতরাং আমাদেরকে এই মুনাফেকী আচরণ থেকে খাঁটি তওবা করতে হবে, যাতে পীর–মুরীদীর নামে আকীদা–বিশ্বাস ও নেক আমলই বরবাদ না হয়ে যায়। কারণ পীর–মুরীদীর আসল উদ্দেশ্যই হল আল্লাহওয়ালাদের সোহবত–সংশ্রব অবলম্বন করে দ্বীন ও ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা।

এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ)–এর বাণী বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ যদি পীর সাহেবের মজলিসেও গীবত হতে থাকে, তাহলে তুমি তৎক্ষণাত সেখান থেকে উঠে যাও। বৃষ্টি যেমন ভাল জিনিস, তাতে গোসল করাও উপকারী, কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলে না ভাগলে আর উপায় নেই।–আনফাসে ঈসা—বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ৬৪৮

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

এখানে একথাটিও স্মরণ রাখা জরুরী যে, কতক বুযুর্গ কোন কোন সময় সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় ভক্ত, অনুরক্ত ও মুরীদদেরকে মুস্তাহাব আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে নিরেট সুন্নাতে আদিয়া যা মুস্তাহাবও নয় (মুবাহ) এমন আমলের প্রতিও জোর তাকীদ করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁদের তরবিয়ত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এরূপ উদ্দেশ্য থাকে না যে, তাঁরা সে সব মুস্তাহাব আমলকে সুন্নাতে মুআক্কাদা সাব্যস্ত করছেন অথবা সে সকল নিছক সুন্নাতে আদিয়া যেগুলো মুস্তাহাবও নয় সেগুলোকে এমন সুন্নাত বলতে চাচ্ছেন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেকের পালন করা উচিত।

যারা এই বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেন না, তারা বুযুর্গদের যে কোন তাকীদ বা উৎসাহ প্রদান দেখে ধোকায় পড়ে অনেক মুস্তাহাব বিষয়কে সুন্নাতে

মুআক্কাদা মনে করতে থাকে, কিংবা কতক নিরেট সুন্নাতে আদিয়া বা মুস্তাহাব কাজকে সুন্নাতে ইবাদত মনে করতে থাকে যা নিতান্তই ভুল। আকাবির উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন কিতাবে এ বিষয়টির প্রতি সতর্কারোপ করেছেন। এ ব্যাপারে সকলের সজাগ থাকা জরুরী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সত্য উপলব্ধি করার এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে ঃ ঈযাহুল হাক্কিস সারীহ ঃ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ঃ ৭৭–৮২, মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ঃ খণ্ড ৩ কিস্ত ১ পৃষ্ঠা ৯৩–৯৪, খণ্ড ৫ কিস্ত ১ পৃষ্ঠা ৮৯–৯০

১৫. খেলাফত পাওয়াকে কামালিয়াত মনে করা

আজকাল ব্যাপকভাবে এ ভুলটিও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যে কোন পীর সাহেবের নিকট থেকে খেলাফত ও ইজাযত পাওয়াকে হক্কানিয়াত ও কামালিয়াতের দলীল মনে করা হয়। অথচ প্রথম কথা তো বিদআতী বা বেদ্বীন পীরের খেলাফতের কোন ধর্তব্যই নেই। আর দ্বিতীয়তঃ যদি খেলাফত ও ইজাযত দাতা কোন হক্কানী বুযুর্গও হন, তবুও জরুরী নয় যে, তাঁর প্রত্যেক খলীফার মধ্যে সব সময় মুসলেহ তথা কামেল পীরের শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে। তাই বাইআত হওয়ার সময় শুধু এতটুকু খোঁজ-খবর নেওয়াই যথেষ্ট নয় যে, পীর সাহেব কোন হক্কানী বুযুর্গের খলীফা কি না ? অধিকন্তু এ খবরও নেওয়া জরুরী যে, তাঁর মধ্যে কামেল পীরের আলামত বিদ্যমান আছে কি না ? বিশেষতঃ তিনি ঈমান, তাকওয়া এবং সুন্নাত ও শরীয়ত অনুসরণে দৃঢ়পদ কি না ?

একথা সুস্পষ্ট যে, খেলাফত ও ইজাযতের মধ্যে কোন বুযুর্গী গচ্ছিত রাখা নেই, বরং হক্কানী বুযুর্গ যার মধ্যে মুসলেহ ও মুরশেদ তথা সংশোধক ও পথপ্রদর্শক হওয়ার শর্ত ও গুণাবলী দেখতে পান, তাকে খেলাফত ও ইজাযত দানে ধন্য করেন। সুতরাং খেলাফত মুসলেহের যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, খেলাফত ও ইজাযত যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। যেমন পড়াশুনা শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ সার্টিফিকেট ছাত্রের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে না, বরং যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতেই সার্টিফিকেট পেয়ে থাকে। খেলাফত ও ইজাযতের বিষয়টিও তদ্রূপ।

খেলাফত দাতা বুযুর্গগণ যেহেতু গায়েব জানেন না যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নাত ও শরীয়তের উপর অটল থাকবেন, না তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে ? তাই

বুযুর্গগণ সাধারণতঃ উপস্থিত বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে ইজাযত ও খেলাফত প্রদান করেন। আর এ বিষয়টি তাদের নিকট স্বীকৃত যে, পীর সাহেবের মাঝে কামেল পীরের শর্তাবলী আছে কি না তার খোঁজ নেওয়া ঐ ব্যক্তির যিম্মায় জরুরী যে বাইআত হবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ "যেমন পাঠ্য বিদ্যা শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় আর তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সার্টিফিকেট প্রদান করায় এখন তার মধ্যে বিদ্যার পূর্ণতা অর্জিত হল, বরং কেবল এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সনদ তথা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় যে, এই সব বিদ্যার সাথে তার এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যদি এখন থেকে সে নিয়মিত অধ্যয়নে মশগুল থাকে তাহলে আশা করা যায়, তার পূর্ণতা হাসিল হবে।

আর যদি সে নিজের উদাসীনতা ও অবমূল্যায়নের কারণে নিজের সেই সম্পর্ক ও যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে তাতে সার্টিফিকেট দাতার কোন দোষ নেই, সব দোষ খোদ সেই ব্যক্তির। তেমনিভাবে যখন কোন বুযুর্গ কাউকে খেলাফত ও ইজাযত দান করেন, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখনই তার মধ্যে সেসব গুণাবলী (যা একজন কামেল পীরের জন্যে জরুরী) পূর্ণাঙ্গরূপে হাসিল হয়ে গেছে, বরং এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজাযত প্রদান করা হয়েছে যে, এখন একান্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী তার হাসিল হয়েছে। যদি সে নিয়মিত সেগুলোর পূর্ণতা অর্জনের খেয়াল ও কোশেশে লেগে থাকে তাহলে আশা করা যায় যে, ধীরে ধীরে গুণাবলীর পূর্ণতা হাসিল হবে।"[১]

হযরত থানভী (রহঃ) এক স্থানে একথাও বলেছেন যে, "খলীফাদের মধ্য থেকে কারো সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমার ইজাযত ও খেলাফতের উপর আস্থা রাখবেন না, বরং এই অধম 'তালীমুদ্দীন' গ্রন্থে কামেল পীরের যে সমস্ত আলমত উল্লেখ করেছে, সেগুলোর আলোকে যাচাই করে আমল করবেন। আমি পরবর্তী দায় দায়িত্বও নিজের কাঁধে রাখতে চাই না।"[২]

তালীমুদ্দীন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বরাতে কুরআন-হাদীসের দলীলের আলোকে কামেল পীরের শর্তাবলী ৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে এসেছি। সেগুলো বার বার দেখুন।

এ আলোচনা দ্বারা আরেকটি ভুলের অবসান হল যে, অনেকে মনে করে থাকে ইজাযত ও খেলাফত কাশ্ফ ও ইল্হামের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে।

১ – আনফাসে ঈসা–আপবীতী ঃ ৭/১৩৮ - ১৩৯
২ – আশরাফুস সাওয়ানেহ ঃ ৩/১৩৫

কাজেই পীর সাহেবের খেলাফত মানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সনদ তথা সার্টিফিকেট। স্বরণ রাখবেন, এধরনের আকীদা সম্পূর্ণ বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ার সাথে সাথে অবাস্তবও বটে। কেননা, হক্কানী বুযুর্গ মুরীদের অবস্থা যাচাই করা ব্যতীত কেবলমাত্র কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের ভিত্তিতে কক্ষনো খেলাফত দেন না। আর তিনি এরূপ করেনই বা কিভাবে, যেখানে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম শরীয়তের কোন দলীলই নয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বুযুর্গীর বুনিয়াদ হল শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ এবং ঈমান ও তাকওয়া, কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম নয় যে, কারো সম্পর্কে কারো কাশ্‌ফ হবে যে, তিনি বুযুর্গ।

এমনিভাবে সাধারণ মানুষের এ আকীদা ও ধারণা ভুল যে, যিনি কোন বুযুর্গের খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেননি, তিনি কামেল বুযুর্গ হতে পারেন না অথবা খেলাফত প্রাপ্ত বুযুর্গ থেকে তিনি অধিক কামেল হতে পারেন না।' কেননা, খেলাফত বিহীন বুযুর্গ যদি শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ, ঈমান ও তাকওয়া এবং খেদমতে দ্বীনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীতে খেলাফতপ্রাপ্ত থেকে অগ্রগণ্য হন, তাহলে বাহ্যতঃ তিনিই অধিক কামেল হবেন। তাই শুধু ইজাযত ও খেলাফতকে বুযুর্গীর ভিত্তি জ্ঞান না করা উচিত এবং খেলাফত না পাওয়াকে বুযুর্গ না হওয়ার দলীল সাব্যস্ত না করা উচিত।

পীর-মুরীদীর নেপথ্যে ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতা

তাসাওউফপন্থীদের একটি বড় জামাআত সম্মানলোভী, তত্ত্ব বিকৃতকারী, শির্ক ও কুফরের এজেন্টও রয়েছে, যারা ধর্মে বিকৃতি সাধন, মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টকরণ, সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রচার-প্রসারের জন্যে তাসাওউফকে মাধ্যম বানিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার রক্ষক, ধারক-বাহক সেজে লোক সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ওদের যে সব কুফরী আকীদা-বিশ্বাস এবং শিরকী মতাদর্শ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, সে সবের তালিকা হবে অনেক দীর্ঘ। দ্বীন বিবর্জিত এরূপ পীরেরা হল প্রকৃত তাসাওউফের ডাকাত। এখনো এরা সমাজে বিদ্যমান। এদের সংখ্যা কম নয়।

এখানে আমি সে সব সূফীদের মধ্যে অতি প্রচলিত কুফরী আকীদা এবং শিরকী মতবাদসমূহের কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। অতঃপর বর্তমান যুগের কতিপয় ধর্মহীন, অধার্মিক পীর নিয়ে আলোকপাত করতঃ আলোচনার ইতি টানব ইন্‌শাআল্লাহ।

১. তরীকতকে শরীয়ত পরিপন্থী মনে করা

সবচাইতে বড় ভ্রান্ত আকীদা, যা পীর-মুরীদীর সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল অনিষ্টের মূল, তা হল তরীকতকে শরীয়তের পরিপন্থী মনে করা। এ কথাটি অতি সুস্পষ্ট যে, পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়ত বলা হয় পুরো দ্বীনকে। এ দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ হল ইস্‌লাহে ক্বলব (অন্তরের সংশোধন) বা তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌স (আত্মশুদ্ধি)। এ ইস্‌লাহ বা তায্‌কিয়ার তরীকাকে (পথ ও পদ্ধতিকে) তরীকত বলা হয়। অন্য শব্দে বিষয়টিকে এভাবে বলা যায় যে, ইস্‌লাহে ক্বল্‌ব বা আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত শরীয়তের বিধানাবলীকে তরীকত বলা হয়। ইস্‌লাহের পথ-পদ্ধতি সবকিছুই শরীয়তে বিধৃত আছে। নতুন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীয়ত প্রদর্শিত পদ্ধতি মোতাবেক ইস্‌লাহ ও আত্মশুদ্ধিই

আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য। শরীয়ত অনুসৃত পদ্ধতি পরিত্যাগ করতঃ ইস্‌লাহ ও আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয় এবং তা আল্লাহ তাআলার নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আলোচনার দ্বারা আমরা একথা জানতে পারলাম যে, তরীকত শরীয়তের পরিপন্থী নয়, বরং তা শরীয়তেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু কিছু বেদ্বীন সূফী নিজেদের ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতার প্রচার-প্রসারের জন্যে এ বিশ্বাস মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে যে, তরীকত ও শরীয়ত দু'টি ভিন্ন জিনিস। তাদের কথার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ ও তরীকা দু'টি। এক—শরীয়ত, দুই—তরীকত। সাধারণ লোকদের জন্যে হল শরীয়ত, আর তরীকত হল মারেফতপন্থীদের জন্যে। কাজেই এমনও হতে পারে যে, একটি বিষয় শরীয়তে নাজায়েয কিন্তু তরীকতে (পীর-মুরীদীতে) তা জায়েয। এজন্যে এসব ধর্মহীন—যারা তাসাওউফের খোলস পরেছে তারা বলে থাকে যে, ফকীরীতে (পীর-মুরীদীতে) শরীয়তের অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

স্মরণ রাখবেন, এ আকীদা সম্পূর্ণ কুফরী এবং ইজমা তথা উম্মতের সর্ব সম্মতিক্রমে এরূপ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি ইসলামের বহির্ভূত। এ আকীদার মধ্যে দ্বীনের অনেক অকাট্য, অতি স্পষ্ট, মুতাওয়াতের ও ইজমা সম্পন্ন বহু আকীদার সরাসরি বিরোধিতা রয়েছে। এধরনের আকীদাসমূহকে শরীয়তের পরিভাষায় 'যরূরিয়াতে দ্বীন' তথা সর্বস্তরের জ্ঞাত ধর্মীয় বিষয়াবলী বলা হয়। যরূরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্গত কোন একটি আকীদা-বিশ্বাসকেও অস্বীকার করা কারো কাফের হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

এ ভূমিকার পর নিম্নোক্ত আলোচনাটি পড়লেই আপনি জানতে পারবেন যে, এ আকীদা (তরীকতকে শরীয়তের পরিপন্থী মনে করা) কত ভয়ংকর কুফরী আকীদা।

এ আকীদা অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও ইজমাঈ আকীদা এবং যরূরিয়াতে দ্বীনের পরিপন্থী। যথা ঃ

১. আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মতের নিকট কি দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন ঃ

هُوَالَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়ী করে তুলতে। যদিও মুশরেকরা এটাকে অপ্রীতিকর মনে করে।"—সূরা তাওবা ঃ ৩৩

কুরআনের পরিভাষায় এই হেদায়াত ও দ্বীনের নামই হল শরীয়ত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

"তারপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব আপনি তার অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু। এটা (কুরআন—যার মধ্যে শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে) মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।" —সূরা জাসিয়া ঃ ১৮–২০

এই বিশেষ শরীয়ত ও দ্বীনের ব্যাপারে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার (নেয়ামত) অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" —সূরা মায়িদা ঃ ৩

অন্যত্র আরো ব্যাখ্যাসহ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" —সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

এসব আয়াত এবং এ ধরণের আরো বহু আয়াতের সারমর্ম হল, আল্লাহ তাআলার নিকট মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে 'ইসলাম', যার সর্বশেষ রূপ হল 'শরীয়তে মুহাম্মাদী'। ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছুই মকবূল ও গ্রহণযোগ্য নয়। আর শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের পর আখেরাতের মুক্তি একমাত্র এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং, যে তরীকত শরীয়তের অংশ নয় বরং পৃথক ও ভিন্ন কোন বস্তু, যার মাঝে শরীয়তের বিরোধিতাও বৈধ, সে তরীকত আল্লাহ তাআলার মনোনীত ইসলাম বহির্ভূত মতবাদ। এ মতাবলম্বীরা মুসলমান নয়, কোন ক্রমেই মুসলমান হতে পারে না।

২. কালিমায় বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমান, সে যতই সাধারণ হোক না কেন, সে জানে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান

আনয়ন ব্যতীত একজন মানুষ কোনক্রমেই মুসলমান হতে পারে না। একথা অস্বীকার করার অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকার করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনের মানে হচ্ছে, তাঁর আনীত শরীয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তের উপর ঈমান আনয়ন ব্যতীত তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের দাবী করা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি শরীয়তের পরিবর্তে কোন এমন তরীকত মান্য করে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের অংশ নয়, বরং তা থেকে বহির্ভূত কোন বস্তু, তাহলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হল না। তাই এ ধরনের লোক কাফের।

৩. কুরআন মাজীদে এমন অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান আছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ফরয এবং তাঁর অবাধ্য হওয়া হারাম।

যারা তরীকতকে শরীয়ত পরিপন্থী মনে করে, তারা শরীয়তে মুহাম্মাদী হতে বিমুখ হয়ে ঐসব আয়াতের বিরুদ্ধাচরণের কারণেও কাফের, ইসলাম থেকে খারেজ।

৪. কালিমা পাঠকারী প্রতিটি মুসলমানের জানা আছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত, তাঁর আনীত শরীয়ত মান্য করা ব্যতীত, কেউ মুসলমান হতে পারে না, পরকালে মুক্তির আশা করতে পারে না। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীসে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমাও রয়েছে। কাজেই শরীয়ত পরিপন্থী যে কোন তরীকতের ধ্বজাধারী এবং 'শরীয়ত আমাদের তাসাওউফ পন্থীদের জন্যে নয়' এর প্রবক্তা 'উমূমে বি'সত' তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকলের জন্যে আবির্ভূত হওয়ার ন্যায় অতি সুস্পষ্ট আকীদাকে অস্বীকার করার কারণেও কাফের।

৫. মুসলমান মাত্রই অবগত যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ শরীয়তে মুহাম্মাদী বর্জনপূর্বক পূর্ববর্তী কোন নবীর শরীয়তের অনুসরণ করে এবং তার মাধ্যমে

মুক্তির আশা করে, তাহলে সেও হবে কাফের। এ বিধান কুরআন মাজীদ, হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী নবীদের কেউ যদি এ যুগে বিদ্যমান থাকতেন, তাহলে তাঁর উপরও শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণ ফরয হত। যখন শরীয়তে মুহাম্মাদীকে বাদ দিয়ে কোন আসমানী শরীয়ত অনুসারীও মুসলমান হতে পারে না, সে ক্ষেত্রে শরীয়তে মুহাম্মাদী পরিত্যাগ করতঃ এমন তরীকত অনুসারী কিভাবে মুসলমান হতে পারে, যে তরীকত শরীয়তে মুহাম্মাদীও নয় এবং কোন আসমানী শরীয়তও নয়?

৬. কুরআন মাজীদের বহু আয়াত ও অনেক হাদীসে পরিস্কার বিবরণ রয়েছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করা, এক কথায় শরীয়ত প্রবর্তন করা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার কাজ। আল্লাহ তাআলা বৈধাবৈধের যে বিধান দিয়েছেন, তা আমরা শরীয়তে মুহাম্মাদী মারফত লাভ করেছি। এ শরীয়ত পরিপন্থী তরীকত মান্যকারীরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্যকে (শয়তান, প্রবৃত্তি বা নিজ পীরকে) শরীয়ত প্রবর্তক মনে করার কারণেও কাফের। কেননা, কেউ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে শরীয়ত প্রবর্তনের যোগ্য মনে করলে সে কুরআন-হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী এবং উম্মতের ইজমাক্রমে বেদ্বীন ও কাফের।

৭. মুসলমান হওয়ার জন্যে কুরআন-হাদীস মান্য করা জরুরী। কুরআন অস্বীকারকারীও মুসলমান হতে পারে না। এমনিভাবে হাদীস অস্বীকারকারীও মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না। এ বিষয়টিও দ্বীনের তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় অতি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদা।

কুরআন-হাদীসে যে সব বিষয়ের বিবরণ বিদ্যমান আছে এবং যেগুলোকে মান্য করতে বলা হয়েছে, সেগুলোই শরীয়তে মুহাম্মাদী। এ শরীয়তভিন্ন কোন তরীকত বা অন্য কোন শরীয়ত অনুসরণ ও মান্য করার অনুমোদন কুরআন-হাদীসে নেই। কাজেই শরীয়তে মুহাম্মাদীকে অস্বীকার করা সরাসরি কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর। শরীয়তে মুহাম্মাদীর পরিবর্তে কোন তরীকত বা অন্য কোন শরীয়ত মান্য করা মানে প্রত্যক্ষভাবে কুরআন-হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা। কাজেই শরীয়ত পরিপন্থী কোন তরীকতে বিশ্বাসী ব্যক্তি এ হিসেবেও কাফের যে, সে একজন কুরআন-হাদীস অস্বীকারকারী।

শরীয়ত পরিপন্থী তরীকত অবলম্বনকারী এবং শরীয়ত নিষ্প্রয়োজনীয় ঘোষণাদানকারী ব্যক্তির কাফের হওয়ার আরো বহু কারণ রয়েছে। কিন্তু এত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য মাসআলার ব্যাপারে এতটুকু বর্ণনাও প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করছি।

অন্যান্য কিতাব ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) রচিত 'মাজমূউল ফাতাওয়া' ১১নং খণ্ড ১৫৬–১৭৩, ২২৫–২২৬, ৪০১–৪৩২, ৪৬৪–৪৬৫ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যাসহ দলীলভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। এখানে এসব উল্লেখ করলে আলোচনা বেশী দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে 'সহীহ মুসলিম'—এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহঃ)–এর একটি যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেন ঃ

"যিন্দীকদের একটি গ্রুপ এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরীয়তের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। তারা বলে ঃ 'শরীয়তের এসব বিধানাবলী নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্যে। আউলিয়া কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের এসব বিধানাবলীর মুখাপেক্ষী নন। (বরং তারা এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে) কারণ, তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য'—এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফরী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তাওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরীয়তের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল, 'আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই।' আর শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিস্কার কুফর।"

তিনি আরো বলেন, "সারকথা হল দ্বীন–ধর্মের মাঝে একথা অকাট্য ও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইজমাও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ, বিধি–বিধান জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। যে বলে, রাসূলের মাধ্যম ছাড়াও রাব্বুল আলামীনের বিধি–বিধান জানার আরো পথ আছে, যেখানে রাসূলের প্রয়োজন হয় না, সে বেদ্বীন, কাফের। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান হচ্ছে হত্যা। তার কাছে এর বেশী জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই।"

তিনি বলেন, "উক্ত গ্রুপের এ মতবাদের মধ্যে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আরো নবী–রাসূল আগমনের স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। অথচ (এটিও দ্বীনের অতি স্পষ্ট ও অকাট্য আকীদা যে) আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর কোন নবী–রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাদের এ কথার

মাঝে 'খতমে নবুওয়তের' অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। তার বিবরণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার অন্তরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, তা সবই আল্লাহ তাআলার বিধান। কাজেই তা বিদ্যমান থাকতে সে আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মুখাপেক্ষী নয়। এরই মধ্য দিয়ে নিজের জন্যে নবুওয়তের বৈশিষ্ট প্রমাণ করল। কেননা, একজন নবীই নবুওয়ত ও রিসালাতের কারণে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী জানার জন্যে অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। আর তারা এ দাবীই করছে।"–তাফসীরে কুরতুবী ঃ ১১/২৮–২৯, ফাতহুল বারী ঃ ১/২৬৭

যাহোক, শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে ব্যবধানকারী, শরীয়ত পরিপন্থী কোন তরীকত অবলম্বনকারী দ্বীন হতে খারেজ। এ বিষয়টি দ্বীনের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে এর বেশী লেখার প্রয়োজন নেই।

তবে এখানে শরীয়তের অনুসরণ অপরিহার্য হওয়া এবং সঠিক তরীকত শরীয়তের শাখা হওয়া এবং শরীয়ত পরিপন্থী যে কোন তরীকত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে হক্কানী সুফিয়ায়ে কেরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করার ইচ্ছা করছি, যাতে সে সব বেদ্বীনদের ব্যাপারে একথাটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, এরা সুফিয়ায়ে কেরামের পথ–পদ্ধতির উপর নেই।

বলা বাহুল্য, সুফিয়ায়ে কেরামের তরীকত ছিল সেটি, যার দিক নির্দেশনা স্বয়ং শরীয়ত প্রদান করেছে। তাঁদের এমন কোন তরীকত ছিল না, যে তরীকতে শরীয়তের বিরোধিতা বৈধ। এ পর্যায়ে তাঁদের বাণীসমূহ এবং তাঁদের বাস্তব জীবনই যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এ যিন্দীকের দল সে সব সুফিয়ায়ে কেরামের নামে লোকদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

শরীয়তের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়ত বিরোধী যে কোন তরীকত ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কেরামের বাণী

১. বিখ্যাত বুযুর্গ সূফীকুল শিরোমণি জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ ইন্তেকাল ২৯৮ হিঃ) বলেন—

الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجل، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعين لسنته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

"আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্যে বন্ধ। শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা চলে এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করে তাঁদের জন্যে উন্মুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে রয়েছে রাসূলের জীবনে অনুপম আদর্শ।"—সিফাতুস সাফওয়া ঃ ২/২৫২, রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

২. জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) আরো বলেন—

علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ، ولم يكتب الحديث ، ولم يتفقه لا يقتدى به.

"আমাদের এই ইলম (ইলমে তাসাওউফ) কুরআন-হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত (অর্থাৎ, এগুলোর ভিত্তি কুরআন-হাদীস)। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনের ইলম অর্জন করেনি এবং হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জন করেনি তাকে আদর্শ বানানো যাবে না।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১১/১৫৪

৩. খ্যাতনামা সূফী আবূ উসমান হিয়ারী (রহঃ ইন্তেকাল ২৯৮হিঃ) বলেন—

من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا .أورده ابن الجوزي في«صفة الصفوة»٤: ٧٢، وحكاه الذهبي في«سير أعلام النبلاء»١١: ١٥١ في ترجمة الحيري، وقال: قلت: وقال تعالى: ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে কথায় ও কাজে নিজের উপর হুকুমদাতা বানাবে, সে হেদায়াতের কথা বলবে। আর যে ব্যক্তি নিজের উপর প্রবৃত্তিকে শাসক বানাবে, সে কুসংস্কারপূর্ণ কথাবার্তা বলবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, "এবং তোমরা যদি তাঁর (মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথামত চল, তাহলে তোমরা হেদায়াত পাবে।"—সিফাতুস সাফওয়াঃ ৪/৭২, সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ১১/১৫১

শাইখ আবূ উসমানের এ উক্তিটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' ১১/১৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করার পর বলেন, আল্লাহ তাআলার এ ইরশাদও বিদ্যমান আছে, "তুমি স্বীয় প্রবৃত্তির পিছনে পড় না। নতুবা সে তোমাকে আল্লাহ তাআলার পথ হতে বিপথগামী করে দেবে।"

৪. প্রসিদ্ধ সূফী শাইখ আবুল হুসাইন নূরী (ইন্তেকাল ২৯৫ হিঃ) বলেন—

من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع، فلا تقربن منه. نقله في «سير أعلام النبلاء»١١:١٥٧.

"তুমি যাকে দেখ যে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে এমন সম্পর্ক হাছিলের দাবী করে যা শরীয়ত পরিপন্থী, তাহলে তুমি তার নিকটেও যেয়ো না।" —সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১১/১৫৭

৫. শাইখ আবূ মুহাম্মাদ মুরতাইশ (ইন্তেকাল ৩২৮ হিঃ) বলেন—

من رأيته يدعى مع الله حالة باطنة، لا يدل عليها أو لا يشهدلها حفظ ظاهر، فاتهمه على دينه.

"যাকে তুমি দেখবে যে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে এমন বাতেনী সম্পর্কের দাবী করে, যার বাহ্যিক অবস্থা তা সত্য বলে সাক্ষ্য দেয় না, তাহলে তাকে তুমি দ্বীনী ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে কর (তাকে অধার্মিক মনে করে নাও)।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১১/৩৪৬

৬. সূফিয়ায়ে কেরামের ইমাম, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী (ইন্তেকাল ২৮৩ হিঃ) বলেন—

الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل موقوف إلا ما كان على السنة وتقوم السنة على التقوى.

"ইলম ছাড়া দুনিয়া পুরোটাই অজ্ঞতা, ইলমও আলেমের বিরুদ্ধে দলীল হবে যদি সে ইলম অনুযায়ী আমল না করে ; আবার আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল সুন্নাতের অনুসরণের উপর। আর সুন্নাতের অনুসরণ তাকওয়া থেকে সৃষ্টি হয়।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ঃ ১১/৩৪৫

৭. তিনি আরো বলেন—

أصولنا ستة: التمسك بالقران، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠: ١٩٠ نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١٠: ٦٤٨.

"আমাদের মূলনীতি ছয়টি ঃ ১. কুরআন মাজীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা ৩.

হালাল রুযী গ্রহণ করা ৪. কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ৫ গুনাহ পরিহার করা ও তওবা করা ৬.হুকূক (আল্লাহ তাআলার হক এবং বান্দার হক) আদায় করা।"–হিলয়াতুল আউলিয়াঃ ১০/১৯০, সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ১০/৬৪৮

৮. শাইখ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ ইন্তেকাল ৫৬১ হিঃ) বলেন—

لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء، أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. قاله في كتابه «فتوح الغيب» كما في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ١٠:٤٥٥.

"সর্বাবস্থায় মুমিনের তিনটি বিষয় অপরিহার্য, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী যথাযথ পালন করা, তাঁর নিষেধাবলী হতে বিরত থাকা এবং ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্ট থাকা।"

—ফুতূহুল গায়ব–মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১০/৪৫৫

৯. শাইখ জীলানী (রহঃ) আরো বলেন—

جميع الأولياء لا يستمدون إلا من كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،ولا يعملون إلا بظاهرهما.

"সকল আউলিয়ায়ে কেরাম শুধু কুরআন–হাদীস থেকেই (শরীয়তের বিধানাবলী) আহরণ করেন এবং কুরআন–হাদীসের যাহের মোতাবেকই আমল করেন।"—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

১০. ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ ইন্তেকাল ১০৩৪ হিঃ) স্বীয় মাকতুবাতে লিখেন—

"স্বীয় যাহেরকে (বাহ্যিক দিককে) শরীয়তের যাহের তথা বাহ্যিক আহকাম দ্বারা এবং বাতেনকে (অভ্যন্তরকে) শরীয়তের বাতেন (আকীদা ও ইসলাহে কল্‌ব সংক্রান্ত বিধানাবলী) দ্বারা সুসজ্জিত রাখুন। কেননা, হাকীকত ও তরীকত দ্বারা শরীয়তেরই হাকীকত ও তরীকত উদ্দেশ্য। এমন নয় যে, শরীয়ত এক জিনিস আর হাকীকত ও তরীকত ভিন্ন আরেক জিনিস। কেননা, এরূপ (ভিন্নতার) ধারণা যিন্দিকী, ইল্‌হাদ ও কুফরী।"

—ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ঃ মাকতূব ঃ ৫৭

১১. 'তাফসীরে রুহুল মাআনী' গ্রন্থে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (রহঃ)এ উক্তিও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إن قوما مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيلون أن المقصود الأصلي وراء الشريعة، حاشا وكلا، نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء، فكل من الطريقة والشريعة عين الآخر، لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة، وكل ما خالف الشريعة مردود، وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة.

"কিছু লোক ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার দিকে ধাবিত। তাদের ধারণা, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শরীয়তের ঊর্ধ্বে। নাঊযুবিল্লাহ! কখনো এমন নয়। নাঊযুবিল্লাহ!! কখনো এমন নয়। আল্লাহ তাআলার নিকট এ ভ্রান্ত আকীদা হতে আশ্রয় কামনা করছি। শরীয়ত ও তরীকত উভয়টি এক ও অভিন্ন। এতদুভয়ের মাঝে যবের মাথা পরিমাণও পার্থক্য নেই। যে বস্তু শরীয়ত পরিপন্থী হবে, তা সর্বদাই পরিত্যাজ্য। যে তরীকতকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে তা ধর্মহীনতা ও যিন্দিকী।"—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৮

১২. হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) আরো বলেন—

تقرر أن طريق الوصول إلى درجات القرب الإلهي جل شانه منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مأمورا بها في آية : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني (سورة يوسف الآية: ١٠٨) والآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. (سورة آل عمران الآية: ٣١) تدل على ذلك أيضا،

وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال، ومنحرف عن المطلوب الحقيقي، وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة،

وشاهد ذلك الآية: وإن هذا صراطي مستقيما. سورة الأنعام الآية: ١٥٣، والاية فماذا بعد الحق إلا الضلال (سورة يونس الآية: ٣٢)، والآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينا. (سورة آل عمران الآية: ٨٥)، وحديث: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر، وحديث: كل بدعة ضلالة، وأحاديث أخر انتهى. نقله الألوسي المفسر في «روح المعاني» ١٦:١٨.

"এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া শরীয়তের পথেই সীমাবদ্ধ, যে শরীয়তের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে আহবান জানিয়েছেন, যে শরীয়ত মোতাবেক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলের জন্যে আদিষ্ট হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'বলে দিন ! এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই—আমি ও আমার অনুসারীরা।' —সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর ; তাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।'

—সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

শরীয়তের পথ ছাড়া সবই বিপথগামীর পথ এবং সত্যিকারের উদ্দেশ্য হতে অনেক দূরে। যে সব তরীকতকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে তা ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ।'

—সূরা আনআম ঃ ১৫৩

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 'আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া।' —সূরা ইউনুস ঃ ৩২

ইরশাদ হয়েছে ঃ 'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'—সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (কে বুঝানোর) জন্যে একটি সরল রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহ তাআলার পথ। তারপর (উক্ত রেখার) ডানে বামে আরো অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলো (শয়তানের) পথ। প্রতিটি পথের মাথায় বসা আছে শয়তান, যে শয়তান লোকদেরকে সে পথের দিকে আহবান করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন, 'নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।' —মুসনাদে আহমাদ ঃ ২/৫

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'চির শাশ্বত বাণী হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কিতাব। সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রাসূলের আদর্শ। সবচাইতে নিকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে দ্বীনে নতুন সৃষ্টি বিষয়। প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) এবং প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে নিপতিত (হওয়ার কারণ) হবে।'

—সুনানে নাসায়ী ঃ ৩/১৮৮, সহীহ মুসলিম ঃ ১/২৮৪—২৮৫

এ বিষয়ে উক্ত আয়াত এবং হাদীসসমূহ ছাড়াও আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।[১]—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৮

১৩. গত শতাব্দীর মুজাদ্দেদে মিল্লাত, শাইখে তরীকত, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ ইন্তেকাল ১৩৬২ হিঃ) স্বরচিত গ্রন্থ 'কাসদুস সাবীল'-এ উপরোক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

'যখন এতটুকু জানা গেল যে, সুলূক ও তাসাওউফের একমাত্র পথ হল শরীয়তের বিধানাবলী যথাযথ পালন করা। আর এ কথাও জানা আছে যে, এগুলোর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তখন এ কথাও বুঝে এসে থাকবে যে, এ পথ শরীয়ত বিরোধী কোন পথ নয়।

কোন কোন মূর্খ বলে থাকে যে, শরীয়ত এক জিনিস, তরীকত আরেক জিনিস এবং উভয় পরস্পর বিরোধী। এ সব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও গোমরাহী। এ প্রকারের আকীদা বিশ্বাস রাখা ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতা। কতক জাহেল ব্যক্তি মনে করে, অমুক কাজ শরীয়তে না জায়েয, কিন্তু তরীকতে তা জায়েয। নাউযুবিল্লাহ !' —কাসদুস সাবীল – বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ১১৩

উক্ত বিষয়ে সূফিয়ায়ে কেরামের এ সকল বাণী পর্যন্তই আলোচনার ইতি টানছি। নতুবা থানভী (রহঃ)এর উক্তি মোতাবেক এ ব্যাপারে বুযুর্গদের হাজারো বাণী ও উদ্ধৃতি রয়েছে। (তালীমুদ্দীন ঃ ১৪৪)

যাহোক, ইসলামে সে তাসাওউফই গ্রহণযোগ্য, যে তাসাওউফের দিক-নির্দেশনা শরীয়ত প্রদান করেছে। শরীয়ত পরিত্যাগ করে নতুন কোন তরীকতের প্রবক্তা হওয়া, শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ জায়েয সাব্যস্ত করা, ইসলামের সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতার শামিল। এটা সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহী এবং ইসলাম বিরোধী কাজ। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সাথে সাথে সমস্ত হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরামের মতাদর্শেরও পরিপন্থী।

২. ইয়াকীন অর্জনের পর আর ইবাদতের প্রয়োজন নেই

এ আকীদা এক নম্বরে উল্লেখিত কুফরী আকীদার নতুন রূপায়ণ। কিছু কিছু সূফী সেই আকীদায় সামান্য পরিবর্তন সাধন করেছে। অতঃপর তা এ

---

[১] মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ)এর এ উক্তিতে যেসব আয়াত ও হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলোর পূর্ণ তরজমা মূল কিতাবের বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাবে উপস্থাপন করেছে যে, 'মানুষ যখন ইবাদত করতে করতে তার অন্তর পরিস্কার, স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে ইয়াকীনের স্তর হাছিল হয়ে যায় ; তখন তার দায়িত্ব হতে ইবাদত মওকূফ হয়ে যায়। সে আর শরীয়তের পক্ষ হতে আদিষ্ট থাকে না।'

ইসলামের সুশীতল ছায়া হতে বেরুনোর জন্যে এটি একটি শয়তানী ধোঁকা মাত্র। এটি সম্পূর্ণ কুফরী ও ধর্মদ্রোহী আকীদা। পুরো উম্মতে মুহাম্মাদী এ ব্যাপারে একমত যে, তিন প্রকার লোক ব্যতীত আর কেউ শরীয়তের বিধানাবলীর আওতামুক্ত নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও পাগল—এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া প্রত্যেকে মৃত্যু অবধি শরীয়তের অনুসরণে বাধ্য।

সূফীকুল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)কে কোন একজন লোক জিজ্ঞেস করেছিল, কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এখন আর আমাদের শরীয়তের অনুসরণের প্রয়োজন নেই। তিনি উত্তরে বললেন— وصلوا ولكن إلى سقر 'হ্যাঁ, তারা পৌঁছে গেছে। তবে জাহান্নামে।'

–শরহু হাদীসিল ইলম (ইবনে রজব (রহঃ) ঃ ১৬, রিসালাতুল মুসতারশিদীন ঃ ৮৩ টীকা

তিনি একথাও বলেছেন যে, 'এমনটি বলা যিনা–ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।'—মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১১/৪২০

কেননা, এ সব কাজ গোনাহ এবং মস্ত বড় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুফরী তো নয়। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মতবাদটি সরাসরি কুফরী ও ধর্মহীনতা।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চাইতে অধিক বিশ্বাস আর কারো হতে পারে না। তথাপি তাদের উপর আমরণ শরীয়ত পালনের দায়িত্ব ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ)এর ব্যাপারে কালামে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَّجَعَلَنِي مُبٰرَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

'বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহ তাআলার দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।' —সূরা মারয়াম ঃ ৩০–৩১

মোটকথা, আল্লাহর নবীর সমান ইয়াকীন বিশ্বাস অর্জন করা কোন উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি নবীকে আজীবন শরীয়তের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মত এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোত্থেকে পেল যে, সে শরীয়তের বিধান হতে মুক্ত, স্বাধীন?

সূরা হিজ্‌র–এর শেষাংশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

'এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার মৃত্যু না আসে।'—সূরা হিজর ঃ ৯৯

এ আয়াতও প্রকৃষ্ট দলীল যে, মানুষ আমরণ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। কারণ উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত আয়াতে ইয়াকীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি সূরা মুদ্দাস্‌সিরে (আয়াত ঃ ৪৭) ইয়াকীন শব্দ মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রত্যক্ষ ইয়াকীন তথা বিশ্বাস মৃত্যুর পরই হাছিল হয়ে থাকে। স্বয়ং মৃত্যুই এমন এক বিশ্বাস্য বস্তু, যার ব্যাপারে মানুষের সামান্যতম দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ও সংশয় নেই।

কতিপয় বেদ্বীন সূফী যখন দেখল, উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়, তখন তারা এ আয়াতের মধ্যে অর্থগত বিকৃতি সাধন ঘটায় এবং বলে যে, 'এ আয়াতে ইয়াকীন দ্বারা মারেফাত বুঝানো হয়েছে। তাই মারেফাত স্তরে পৌঁছার পর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না।'

এরা নিজেদের কুফরী আকীদার সাথে সাথে ইহুদী ষ্টাইলে কুরআন বিকৃতির মত জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত। তারা উম্মতের সর্বসম্মত তাফসীরের (এখানে ইয়াকীন দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য) বিরোধিতা করে একটি নতুন কুফরীর সংযোজন করেছে। তারা এ কথা বুঝতে পারেনি যে, উক্ত আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন। এখন যদি ইয়াকীন দ্বারা মারেফাতের কোন নির্দিষ্ট স্তর বুঝানো হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাছিল ছিলই। তদুপরি তিনি ওফাত পর্যন্ত ইবাদতে অটল ছিলেন এবং কঠিন রোগেও নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আর যদি (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাছিল না থেকে থাকে, তাহলে সে স্তর কোন উম্মতের হাছিল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কোন উম্মত আল্লাহ তাআলার ঐ মারেফাত ও

বেলায়াত স্তরে পৌছতে পারে না, যে স্তরে নবী–রাসূলগণ পৌছেছেন!! বুঝা গেল যে, এখানে ইয়াকীন দ্বারা মারেফাতের কোন স্তর উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, বরং ইয়াকীন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল মৃত্যু যা হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমানিত।[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বিশদ ব্যাখ্যাসহ যুক্তির নিরিখে মাজমূউল ফাতাওয়ায় আলোচ্য আকীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা বলে আমাদের অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আমরা যে কাজই করব তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা এ কথা বলে যে, আমাদের এখন আর নামাযের প্রয়োজন নেই। কেননা, আমরা মূল লক্ষ্যে পৌছে গেছি। অথবা এরূপ বুলি ছাড়ে, আমাদের এখন আর হজ্ব করার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং কাবা আমাদের তাওয়াফ করে থাকে। কিংবা এমন বলে থাকে যে, আমাদের এখন রোযার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের এর কোন দরকার নেই। কিংবা এ ধরনের উক্তি করে যে, আমাদের জন্যে মদপান বৈধ। এটা হারাম কেবল সাধারণ লোকদের জন্যে।

এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে অথবা এ ধরণের আকীদা যারা পোষণ করে, তারা সকল ইমামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের, মুরতাদ। তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যদি এ ধরনের আকীদা–বিশ্বাস অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তাহলে সে হবে মুনাফেক ও যিন্দীক। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে একবার এ আকীদা প্রমাণের পর তাওবার সুযোগ দেওয়া ছাড়াই কতল করে দেওয়া হবে। তবে কেউ কেউ তাওবার সুযোগ দেওয়ার পর হত্যা করার অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।'

—মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১১/৪০১–৪০৩

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন—

من زعم أن له مع الله تعالى حالا أسقط عنه نحو الصلوة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله، وإن كان في الحكم بخلوده نظر، وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر، لأن ضرره أكثر.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কোন বিশেষ অবস্থা বা সম্পর্কের দাবী করে ও বলে যে, এ অবস্থায় তার নামাযের বিধান এবং শুরাপান হারামের

১—মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১১/৪১৮–৪২০, শরহুল ফিক্‌হিল আকবার–মোল্লা আলী কারী ঃ ১২২, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ২/৬১৭, রুহুল মাআনী ঃ ১৪ / ৮৭–৮৮

বিধান রহিত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে কতল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। উপরোক্ত মতাবলম্বী লোককে হত্যা করা শত কাফেরকে হত্যা করার চাইতেও উত্তম। কেননা, এ ধরনের লোক দ্বারা প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।'

—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) ইমাম গাযযালীর (রহঃ) উক্ত উক্তিটি উল্লেখপূর্বক বলেন—

ولا نظر في خلوده، لأنه مرتد، لاستحلاله ما علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهما، ومن ثم جزم في «الأنوار» بخلوده.

'এ ধরণের ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী। তার কারণ হল যে, সে এমন বস্তুকে হালাল মনে করেছে যার হারাম হওয়া শরীয়তে অকাট্য ও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর এমন বিষয় ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, যা ফরয হওয়াও শরীয়তে অকাট্য এবং অতি সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত। তাই 'কিতাবুল আনওয়ার'-এ দৃঢ়তার সাথে লেখা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।'—রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯

যাহোক, দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয় এই যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের পর পরকালের মুক্তি একমাত্র এ শরীয়তের অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়টি তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় দ্বীনের অতি সুস্পষ্ট বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। যে কোন ব্যক্তি শরীয়তের এ পরিধি ও গণ্ডি হতে বের হয়ে যাবে, সে যে নামেই আত্মপ্রকাশ করুক—হাকীকত ও তরীকতের পোশাকে আত্মপ্রকাশ করুক অথবা ইয়াকীন ও মারেফাতের নামেই প্রকাশ পাক, সে কোনক্রমেই মুসলমান হতে পারে না, পরকালে মুক্তি পেতে পারে না।

৩. যাহের বাতেন

শরীয়তের গণ্ডি হতে বেরুনোর জন্যে প্রবৃত্তি পূজার তাড়নায় কিছু বেদ্বীন সূফী এক নম্বরে উল্লেখিত কুফরী আকীদার নতুন আরেকটি রূপদান করে থাকে। তারা সে কুফরী মতবাদকে এ শিরোণামে প্রকাশ করে যে, এক হল কুরআন-হাদীসের যাহেরী অর্থ, আরেক হল তার বাতেনী অর্থ। শরীয়তের অনুসারীরা হল যাহেরের অনুসারী। কিন্তু আসল জিনিস হল

কুরআন-হাদীসের বাতেনী অর্থ। যেমন এ কথা বলা, কুরআন মাজীদে যে নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার আসল হাকীকত ও তত্ত্ব হল আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। তবে যে নামায রুকূ, সিজদা, কিয়াম, কিরাআত ইত্যাদি ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ নিয়ে গঠিত এবং মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত, সে নামায হল যাহেরী নামায, যা শরীয়তে কাম্য নয়। অথবা এরূপ বলা যে, তা হল সাধারণ লোকদের নামায, আর বিশেষ লোকদের নামায হল অন্তরের যিকির।

এমনিভাবে কুরআন মাজীদে যে রোযার হুকুম এসেছে, তার মূল হাকীকত হল তাকওয়া এবং আল্লাহ তাআলার ভয়। পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা যাহেরী রোযা। এ রোযা শরীয়তে কাম্য নয়। অথবা এরূপ বলা যে, সে রোযা সাধারণ লোকদের রোযা। আর বিশেষ লোক যাদের তাকওয়া ও খোদাভীতির মর্যাদা হাছিল হয়েছে, তাঁদের আর রোযার প্রয়োজন নেই।

এমনিভাবে, কুরআন মাজীদে যে জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে জাহান্নাম দ্বারা মুসলমানরা যা মনে করে থাকে তা উদ্দেশ্য নয়। বরং জাহান্নাম হল আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে অনুভূত ব্যথার নাম।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে শরীয়তের যত পরিভাষা রয়েছে, সেগুলোর কোন না কোন নতুন এক অর্থ বানিয়ে দাবী করা যে, কুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য এটিই, মুসলমানরা এ সব পরিভাষা দ্বারা যে অর্থ বুঝে থাকে, তা কখনো উদ্দেশ্য নয়।

এ আকীদার ব্যাপারে ইমাম নাসাফী (রহঃ) সুবিখ্যাত কিতাব 'আল আকাইদুন নাসাফিয়া'—এ লেখেন ঃ

والنصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد

'কুরআন-হাদীসের বাণীসমূহ স্বীয় যাহেরী (বাহ্যিক) অর্থেই ধর্তব্য হবে। সে যাহেরী অর্থ ছেড়ে ঐ অর্থ করা, যা বাতেনী সম্প্রদায় দাবী করে থাকে, তা কুফরী ও ধর্মহীনতা।'—আল্ আকাইদুন নাসাফিয়া—নিব্‌রাস ঃ ৫৬৩

প্রকাশ থাকে যে, এ আকীদা উদ্ভাবনের সূচনা বাতেনী ফিরকা ঘটিয়েছে। তাদেরকে বাতেনিয়া এজন্যেই বলা হয়, যেহেতু তাদের দাবী ছিল কুরআন মাজীদ হতে বাহ্যতঃ যে অর্থ বুঝে আসে, যে অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলামের সূচনা কাল

থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যে অর্থ বুঝে আসছে, মূলতঃ তা আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রত্যেক শব্দ দ্বারাই একটি বাতেনী অর্থের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, সেটাই কুরআনের আসল অর্থ।

স্মরণ রাখবেন, এ ধরনের আকীদা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা। বাতেনীরা মুসলমানদের কোন বিদআতী দল নয়। বরং উম্মতের ইজমার আলোকে এরা ইসলাম বহির্ভূত ফিরকা। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইমাম গায্যালীর (রহঃ) 'ফাযাইহুল বাতেনিয়া' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন দল উপদলসমূহের উপর লিখিত বিশাল গ্রন্থাবলীতে এ সব আকীদার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে খণ্ডন করা হয়েছে।

এ পর্যায়ের আকীদাগুলো ভ্রান্ত ও কুফরী, এ ব্যাপারে কোন দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু নিম্নোক্ত দু'টি কথা স্মরণ রাখলেই যথেষ্ট।[১]

১. প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই জানে যে, কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত কোন মানুষ মুমিন হতে পারে না। কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ এই নয় যে, শুধু কুরআনের শব্দাবলীর উপর ঈমান আনয়ন করলেই চলবে, বরং শব্দ ও অর্থ, উভয়ের উপর একযোগে ঈমান রাখা একান্ত জরুরী।

উদাহরণস্বরূপ, এখন যদি কোন ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমার أَقِيمُوا الصَّلوٰةَ (নামায কায়েম কর) এ আয়াতের ঈমান আছে। কিন্তু সে নামাযকে স্বীকৃতি দেয় না, নামায আছে বলে মানে না। তাহলে তো স্পষ্ট যে, তার ঈমান শুধু শব্দের উপর হল, অর্থের উপর নয়। অর্থের উপর যদি ঈমান থাকত, তাহলে সেও অন্যান্য মুমিনদের ন্যায় নামাযের স্বীকৃতি দান করত। সুতরাং নামায ফরয হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যান করতঃ এ দাবী করা যে, আমার এ আয়াতের উপর ঈমান আছে—এ দাবী সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এ বিষয়ও সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হল, তাঁকে আল্লাহ তাআলার সত্য নবী

---

১ আলেমদের জন্যে এ ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) রচিত গ্রন্থ 'ইকফারুল মুলহিদীন ফী শাইয়িম মিন যরূরিয়াতিদ দ্বীন' অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর আনীত শরীয়তকে মনেপ্রাণে সঠিক জ্ঞান করা। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবকে আল্লাহ তাআলার কিতাব হিসেবে বরণ করা। তিনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ শিক্ষা দিয়েছেন তা যথাযথ ও সত্য বলে গ্রহণ করা।

যদি কেউ বলে যে, 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যে আয়াত أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ পৌছিয়েছেন, তা সত্য, কিন্তু আয়াতের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং যে বাস্তব নামায শিক্ষা দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি ঠিক বলেননি। নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল'। তাহলে কোন নির্বোধও কি বলবে যে, এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখে?

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআনের তেলাওয়াত, ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছে, তারা যেন এ সব কিছুর উপর ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু আয়াতের শব্দ তেলাওয়াতের উপর ঈমান রাখবে, আয়াতের অর্থ শিক্ষা দানের উপর ঈমান রাখবে না, সে ঈমানের গণ্ডি হতে খারেজ, একজন ধর্মদ্রোহী, দ্বীনে বিকৃতি সাধনকারী ওবেদ্বীন।

বাতেনী সূফীদের বাতেনী নামায

এ কুফরী মতবাদের ধ্বজাধারী সূফীদের দ্বীন বিকৃতির ফিরিস্তী অনেক লম্বা। এমনকি এরা নামাযের মত অকাট্য আমলকেও অস্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। অথচ এ নামাযের ব্যাপারে কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। এ নামাযকে কুরআন-হাদীসের ভাষায় ঈমান-ইসলামের প্রতীক এবং অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় নামাযও (ফরয হওয়া, নামায ও রাকাআত সংখ্যা সবই) দ্বীনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিষয়। মুসলমান মাত্রই সমভাবে এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। তদুপরি তথাকথিত সূফীরা এ নামাযকে উক্ত মতবাদের (বাতেনিয়্যাতের বিশ্বাস) আড়ালে প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আর এ জন্যে তারা নামায সংক্রান্ত আয়াতসমূহে বাতেনিয়্যাতের অন্তরালে বিকৃতি সাধন করে আরেক নতুন কুফরীর সংযোজন করে।

তাদের নামায সম্পর্কিত কিছু বিকৃতি সাধনের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ

"এ যুগে নামায ও কুরআন মাজীদের সীমাহীন অবমাননা হচ্ছে। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বিশেষ লোকদের মধ্যেও সংখ্যায় অতি কম পাওয়া যাবে, যারা সঠিক ভাবে নামায বিশেষতঃ জামাআতের সাথে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট, বরং তথাকথিত অনেক ফকীর দরবেশদের তো ধারণা যে, 'বাতেনী নামাযই যথেষ্ট, যাহেরী নামাযের কোন দরকার নেই'–এর দ্বারা নামায যে ফরয তা পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করা হয়। ফলে, নিঃসন্দেহে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ!

এদের মাঝে যারা সামান্য শিক্ষিত, তারা আবার কুরআনের আয়াত বিকৃতিতে লিপ্ত হয়। কখনো اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ دَآئِمُوْنَ (যারা সবসময় নামায আদায় করে) আয়াত দ্বারা যুক্তি দেখায় যে, 'দেখুন যাহেরী নামায তো সব সময় সম্ভব নয়। তাই এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতেনী নামায।'

কখনো আবার وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (সবচাইতে বড় হল আল্লাহর যিকির) আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেয় যে, 'নামাযও ভাল কাজ। কিন্তু তার চাইতেও বড় হল আল্লাহ তাআলার যিকির। কাজেই বড় থাকতে ছোটর আর প্রয়োজন কি ?'

বন্ধুরা! এটা প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিতা। যদি তা-ই না হয়, তবে প্রথম যুগের পীরগণ এবং সকল পীরের মুরুব্বী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এমনটি বুঝতে পারলেন না ? সারাটি জীবন কেন নামায আদায় করতে থাকলেন ? তাছাড়া সমগ্র কুরআন-হাদীস নামায ফরযের নির্দেশাবলীতে পরিপূর্ণ। সেখানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা হয়নি। কোন অবস্থাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। শুধু শরীয়তের বিধি মোতাবেক যারা শরীয়তের বিধিমুক্তদের (যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি) কথা স্বতন্ত্র।

তারা যে আয়াতকে বিকৃতি করে যুক্তি প্রদান করেছে, তা সম্পূর্ণ অবান্তর। প্রথমত ঃ তাদের যুক্তি 'যাহেরী নামায সব সময় হতে পারে না' ঠিক নয়। প্রত্যেক জিনিসের স্থায়িত্ব সে জিনিসের মোতাবেক হয়ে থাকে। যেমন, যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি আমাদের এখানে সব সময় আসে। তাহলে কি তার সর্বক্ষণ আসতে থাকা জরুরী ? বরং উদ্দেশ্য হল আগমনের যে সময় নির্ধারিত থাকে, সে সময় কোন প্রকার অনুপস্থিতি ছাড়া সে এসে থাকে। অনুরূপ যাহেরী নামাযের স্থায়িত্বও বুঝতে হবে। নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত না হওয়া মানেই দাওয়াম তথা স্থায়িত্ব।

এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ তাআলার যিকির নামায থেকেও বড় এবং বড় থাকতে ছোটর কি প্রয়োজন ?' এটিও সম্পূর্ণ নিরর্থক বক্তব্য। (কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য নামাযের ফযীলতের বিবরণ দেওয়া যে, নামাযে অমুক অমুক বরকত রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, নামাযও আল্লাহ তা'আলার যিকির। আর আল্লাহ তা'আলার যিকির অবশ্যই বড়। এ জন্যে নামাযের মধ্যে এ বরকত এসেছে। কুরআন মাজীদেই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ 'আমাকে স্মরণ করার জন্যে নামায পড়' সুতরাং এ বক্তব্যে নামাযের প্রতি উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে। এতে নামাযকে হেয় করা হয়নি।

যদি তাদের কথা মেনে নেয়াও হয়, তবুও এটা জরুরী নয় যে, বড় থাকতে ছোটর প্রয়োজনই হবে না। যদি উভয়ই ফরয হয় তাহলে কেন প্রয়োজন হবে না ? যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তির দুই ছেলে। একজন বড়, আরেকজন ছোট। তাহলে তাদের উক্ত বিধি মোতাবেক ছোট ছেলেকে গলাটিপে মেরে ফেলতে হবে।"১

সংক্ষেপে কথা হল, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতদ্বয় ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি নিজেই আমাদেরকে এ যাহেরী নামায শিখিয়েছেন। যে নামায মসজিদে জামাআতের সাথে দৈনিক পাঁচ বার আদায় করা হয়। যে নামায বিভিন্ন শর্ত, রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদব নিয়ে গঠিত। যে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ আদবের মধ্যে রয়েছে খুশু-খুযু তথা একাগ্রতা। এ নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাতেনী নামায শিক্ষা দেননি। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট এ যাহেরী নামাযই শিখেছেন এবং তাঁরাও পরবর্তীদেরকে এ নামাযই শিখিয়েছেন।

এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে পরবর্তী যুগে। সকল মুসলমান নামায বলতে একবাক্যে এ যাহেরী নামাযকেই বুঝে থাকে। সুতরাং, এ নামাযকে অস্বীকার করা এবং কাল্পনিক বাতেনী নামাযের বাহানা করা রাসূল, কুরআন ও উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করার নামান্তর। যদি উক্ত আয়াত দ্বারা নামায ফরয না হওয়াই প্রমাণিত হত, তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি বুঝতেন, না এ সব ধর্মদ্রোহীরা বুঝত ? আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন! اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

১ -তালীমুদ্দীন-বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ৬৪১-৬৪২

তাদের নামায সম্পর্কিত কিছু বিকৃতি সাধনের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ

"এ যুগে নামায ও কুরআন মাজীদের সীমাহীন অবমাননা হচ্ছে। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বিশেষ লোকদের মধ্যেও সংখ্যায় অতি কম পাওয়া যাবে, যারা সঠিক ভাবে নামায বিশেষতঃ জামাআতের সাথে আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট, বরং তথাকথিত অনেক ফকীর দরবেশদের তো ধারণা যে, 'বাতেনী নামাযই যথেষ্ট, যাহেরী নামাযের কোন দরকার নেই'–এর দ্বারা নামায যে ফরয তা পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করা হয়। ফলে, নিঃসন্দেহে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ!

এদের মাঝে যারা সামান্য শিক্ষিত, তারা আবার কুরআনের আয়াত বিকৃতিতে লিপ্ত হয়। কখনো اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ دَآئِمُوْنَ (যারা সবসময় নামায আদায় করে) আয়াত দ্বারা যুক্তি দেখায় যে, 'দেখুন যাহেরী নামায তো সব সময় সম্ভব নয়। তাই এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতেনী নামায।'

কখনো আবার وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (সবচাইতে বড় হল আল্লাহর যিকির) আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেয় যে, 'নামাযও ভাল কাজ। কিন্তু তার চাইতেও বড় হল আল্লাহ তাআলার যিকির। কাজেই বড় থাকতে ছোটর আর প্রয়োজন কি ?'

বন্ধুরা! এটা প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিতা। যদি তা-ই না হয়, তবে প্রথম যুগের পীরগণ এবং সকল পীরের মুরুব্বী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এমনটি বুঝতে পারলেন না ? সারাটি জীবন কেন নামায আদায় করতে থাকলেন ? তাছাড়া সমগ্র কুরআন-হাদীস নামায ফরযের নির্দেশাবলীতে পরিপূর্ণ। সেখানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা হয়নি। কোন অবস্থাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। শুধু শরীয়তের বিধি মোতাবেক যারা শরীয়তের বিধিমুক্তদের (যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি) কথা স্বতন্ত্র।

তারা যে আয়াতকে বিকৃতি করে যুক্তি প্রদান করেছে, তা সম্পূর্ণ অবান্তর। প্রথমত ঃ তাদের যুক্তি 'যাহেরী নামায সব সময় হতে পারে না' ঠিক নয়। প্রত্যেক জিনিসের স্থায়িত্ব সে জিনিসের মোতাবেক হয়ে থাকে। যেমন, যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি আমাদের এখানে সব সময় আসে। তাহলে কি তার সর্বক্ষণ আসতে থাকা জরুরী ? বরং উদ্দেশ্য হল আগমনের যে সময় নির্ধারিত থাকে, সে সময় কোন প্রকার অনুপস্থিতি ছাড়া সে এসে থাকে। অনুরূপ যাহেরী নামাযের স্থায়িত্বও বুঝতে হবে। নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত না হওয়া মানেই দাওয়াম তথা স্থায়িত্ব।

এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ্ তাআলার যিকির নামায থেকেও বড় এবং বড় থাকতে ছোটর কি প্রয়োজন ?' এটিও সম্পূর্ণ নিরর্থক বক্তব্য। (কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য নামাযের ফযীলতের বিবরণ দেওয়া যে, নামাযে অমুক অমুক বরকত রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, নামাযও আল্লাহ তা'আলার যিকির। আর আল্লাহ তা'আলার যিকির অবশ্যই বড়। এ জন্যে নামাযের মধ্যে এ বরকত এসেছে। কুরআন মাজীদেই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ 'আমাকে স্মরণ করার জন্যে নামায পড়' সুতরাং এ বক্তব্যে নামাযের প্রতি উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে। এতে নামাযকে হেয় করা হয়নি।

যদি তাদের কথা মেনে নেয়াও হয়, তবুও এটা জরুরী নয় যে, বড় থাকতে ছোটর প্রয়োজনই হবে না। যদি উভয়ই ফরয হয় তাহলে কেন প্রয়োজন হবে না ? যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তির দুই ছেলে। একজন বড়, আরেকজন ছোট। তাহলে তাদের উক্ত বিধি মোতাবেক ছোট ছেলেকে গলাটিপে মেরে ফেলতে হবে।"[১]

সংক্ষেপে কথা হল, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতদ্বয় ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি নিজেই আমাদেরকে এ যাহেরী নামায শিখিয়েছেন। যে নামায মসজিদে জামাআতের সাথে দৈনিক পাঁচ বার আদায় করা হয়। যে নামায বিভিন্ন শর্ত, রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদব নিয়ে গঠিত। যে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ আদবের মধ্যে রয়েছে খুশু-খুযূ তথা একাগ্রতা। এ নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাতেনী নামায শিক্ষা দেননি। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট এ যাহেরী নামাযই শিখেছেন এবং তাঁরাও পরবর্তীদেরকে এ নামাযই শিখিয়েছেন।

এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে পরবর্তী যুগেও। সকল মুসলমান নামায বলতে একবাক্যে এ যাহেরী নামাযকেই বুঝে থাকে। সুতরাং, এ নামাযকে অস্বীকার করা এবং কাল্পনিক বাতেনী নামাযের বাহানা করা রাসূল, কুরআন ও উম্মতের ইজমাকে অস্বীকার করার নামান্তর। যদি উক্ত আয়াত দ্বারা নামায ফরয না হওয়াই প্রমাণিত হত, তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি বুঝতেন, না এ সব ধর্মদ্রোহীরা বুঝত ? আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন! اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

১ -তালীমুদ্দীন-বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত ঃ ৬৪১-৬৪২

হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরাম ও যাহেরে শরীয়ত

এ ব্যাপারে আগেও আলোচনা হয়েছে যে, হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরাম শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন। তাঁরা শরীয়তের যাহেরী বিধি-বিধান, যেগুলোর সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এবং বাতেনী বিধি-বিধান যেগুলোর সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে, সবগুলোই স্বীকার করেন এবং তা যথাযথ পালন করেন।

তাঁরা কখনো শরীয়তের কোন উক্তির বিকৃতি সাধন করেন না। তাঁদের কেউ এমনও বলেননি যে, 'অমুক আয়াত বা হাদীসের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উদ্দেশ্য অমুক বাতেনী অর্থ।'

তবে তাঁদের কেউ কেউ আয়াতের যাহেরী অর্থ, যার উপর মুসলিম উম্মাহর ঈমান-বিশ্বাস, তা মেনে নেওয়ার সাথে সাথে বহু আয়াতের অধীনে সামান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন বাতেনী অর্থও উল্লেখ করেছেন, যে অর্থ স্বতন্ত্রভাবে শরীয়তের ভিন্ন দলীল দ্বারাও প্রমাণিত আছে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা এমনটি বলেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) এসব আয়াতের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়।[1] তাই হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরামের এ কর্মপদ্ধতি দেখে কারো এই ভেবে প্রতারিত হওয়া উচিত নয় যে, তাঁরা ঐ বাতেনী সূফীদের পক্ষপাতি, যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম সূফিয়ায়ে কেরামের এ ধরনের উক্তির ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা

---

১. যেমন হাদীস শরীফে আছে ঃ

" যে ঘরে কুকুর থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"

এ হাদীস সম্পর্কে অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় সূফীদেরও আকীদা যে, এ হাদীসে কুকুর পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ঘরে কুকুর রাখা রহমতের ফেরেশতার আগমণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। কিন্তু কতক সূফী এ হাদীসের ভিত্তিতে মানুষকে এ কথাও বলে থাকেন যে, চিন্তা করে দেখুন! কুকুরের প্রতি ফেরেশতাদের এত ঘৃণা কেন ? কুকুরের অসৎগুণাবলী যথাঃ অপবিত্রতা, লোভ ও হিংসা ইত্যাদির কারণে এই ঘৃণা।

সুতরাং, যদি এই অসৎগুণাবলীর কারণে যাহেরী ঘরে কুকুর রাখা জায়েয না হয়, তাহলে বাতেনী ঘর অন্তরে কিভাবে সে সব অসৎগুণাবলী লালন করা জায়েয হবে ?

এই বুযুর্গ সূফী উক্ত হাদীসের অধীনে উপদেশমূলক যে হেদায়াত দান করলেন তা সামান্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই ছিল। আর এ কথা সবারই জানা আছে যে, অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে উক্ত অসৎগুণাবলী থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং সেই বুযুর্গ কোন ভুল কথা বলেননি এবং তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে– তাও অস্বীকার করেননি।

করেছেন। আলোচনাটি উপকারী হওয়ার কারণে দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এখানে পেশ করা হল। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'উলূমুল কুরআন' এ বলেন ঃ

"সূফিয়ায়ে কেরাম হতে কুরআন কারীমের আয়াতের ব্যাপারে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত আছে, যেগুলো দেখতে তাফসীর বলে মনে হয়। কিন্তু তা আয়াতের যাহেরী ও মাসূর (কুরআন সুন্নাহ–এ বর্ণিত) অর্থের বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন কুরআন কারীমের ইরশাদ ঃ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ 'তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।' –সূরা তাওবা ঃ ১২৩

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে কতক সূফী বলেছেন ঃ قاتلوا النفس فإنها تلي الإنسان. 'নফসের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কেননা, নফস মানুষের নিকটবর্তী।'

এ প্রকারের বাক্যসমূহকে কিছু লোক কুরআনের তাফসীর মনে করে। অথচ মূলতঃ তা তাফসীর নয়। সুফিয়ায়ে কেরামের কখনো এ উদ্দেশ্য নয় যে, 'কুরআন কারীমের আসল উদ্দেশ্য এ-ই। যে অর্থ যাহেরী শব্দ দ্বারা বুঝে আসছে, তা উদ্দেশ্য নয়।' বরং তারা কুরআন কারীমের যাহেরী অর্থের উপর (যা তার আসল উৎস দ্বারা প্রমাণিত) পরিপূর্ণ ভাবে ঈমান রাখেন। এ কথাও স্বীকার করেন যে, কুরআন মাজীদের তাফসীর তো তা-ই। কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেদের ভাবনাপ্রসূতঃ উক্তিসমূহ উল্লেখ করেন, যা তেলাওয়াতের সময় তাদের মনে আসে এবং সেগুলো বাস্তবে শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারাও প্রমাণিত।

তাই উপরোক্ত আয়াতে সুফিয়ায়ে কেরামের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম এখানে উদ্দেশ্য বহির্ভূত। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম উক্ত আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ আয়াত থেকেই মানুষের এ কথাও চিন্তা করা উচিত যে, তার সবচাইতে নিকটবর্তী অবাধ্য হল নফস ও প্রবৃত্তি, যে তাকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করে থাকে। কাজেই কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সাথে সাথে নফসের বিরুদ্ধেও জিহাদ করা জরুরী। (আর নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করা জরুরী–এ বিষয়টি ভিন্ন শরয়ী দলীল দ্বারাও প্রমাণিত)

নিকটতম অতীতের সুপ্রসিদ্ধ কুরআন ব্যাখ্যাকার আল্লামা মাহমূদ আলূসীর (রহঃ) তাফসীর গ্রন্থে সূফিয়ায়ে কিরামের উক্ত প্রকারের আলোচনা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সূফিয়ায়ে কেরামের এ প্রকৃতির উক্তিসমূহের উৎসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সূফীদের থেকে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যেসব বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা মূলতঃ সে সব সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত, যা সালেকীনের অন্তরে উদ্রেক হয়। সে সব ইঙ্গিত এবং কুরআন কারীমের যাহেরী

অর্থ যা মূলতঃ উদ্দেশ্য, এতদুভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। সূফিয়ায়ে কেরামের এ বিশ্বাস থাকে না যে, যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বাতেনী অর্থই উদ্দেশ্য। কেননা, এরূপ বিশ্বাস তো বাতেনী মুলহিদদের (ধর্মদ্রোহীদের), যারা এ বিশ্বাসকে পুরো শরীয়ত অস্বীকারের মাধ্যম বানিয়েছে।

আমাদের সূফীদের এ আকীদার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর হবেই বা কিভাবে? যেখানে সূফিয়ায়ে কেরাম এ মর্মে জোর তাগিদ দিয়েছেন যে, কুরআন মাজীদের যাহেরী তাফসীরই সর্ব প্রথম হাছিল করতে হবে।(রূহুল মাআনী ঃ ৭/১)

সূফিয়ায়ে কেরামের এ প্রকার উক্তির ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী ঃ

১. সে উক্তিগুলোকে কুরআনের তাফসীর সাব্যস্ত না করা, বরং এ বিশ্বাস রাখা যে, কুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য তা-ই, যা তাফসীরের আসল উৎস দ্বারা বুঝে আসে। আর এ উক্তিগুলো শুধুমাত্র ভাবনা প্রসূতঃ। যদি সেগুলোকে কুরআন কারীমের তাফসীর মনে করা হয়, তাহলে এটা হবে গোমরাহী। তাই তো আমরা দেখতে পাই, ইমাম আবূ আবদুর রহমান সুলামী 'হাকায়েকুত তাফসীর' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে গ্রন্থে এ প্রকারের উক্তিসমূহ ছিল। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে ইমাম ওয়াহেদী (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখবে যে এটা কুরআনের তাফসীর, সে কাফের।" –ইতকান ঃ ২/১৮৪

২. এ প্রকার উক্তিসমূহের মধ্য হতে শুধু ঐ উক্তিগুলোকেই সঠিক বলে গণ্য করা হবে, যার কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের যাহেরী অর্থ বা শরীয়তের কোন সর্বজন স্বীকৃত উসূল তথা মূলনীতি খণ্ডন না হয়। আর যদি সে সব উক্তিসমূহের নেপথ্যে দ্বীন ইসলামের কোন স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তাহলে এটা হবে ইল্হাদ ও ধর্মদ্রোহিতা।

৩. এ প্রকারের উক্তিসমূহ শুধু ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত আয়াতের শাব্দিক বিকৃতির সীমায় না পৌঁছে। আর যদি কুরআন কারীমের কোন শব্দকে হেরফের করে কোন কথা বলা হয়, তাহলে তাও ইলহাদ ও বেদ্বীনী হবে।

৪. অতীতে 'বাতেনিয়া' নামে মুলহিদদের এক দল অতিবাহিত হয়েছে। তাদের দাবী ছিল, 'বাহ্যিক ভাবে কুরআন কারীমের যে অর্থ বুঝে আসে মূলতঃ তা আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রত্যেক শব্দ দ্বারাই একটি বাতেনী অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সেটিই কুরআনের আসল তাফসীর।' এ রূপ আকীদা উম্মতের ঐকমত্য অনুযায়ী কুফরী ও ইলহাদ। কাজেই যে ব্যক্তি সূফিয়ায়ে কেরামের কোন উক্তির ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস রাখবে সে বাতেনী দলভুক্ত হবে।

উক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি নযর রেখে সূফিয়ায়ে কেরামের উক্তিগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে।"—উলূমুল কুরআন ঃ ৩৫৩ - ৩৫৬

যাহের বাতেন সম্পর্কিত কুফরী আকীদার আরেক রূপ

বাতেনী অর্থ সম্বন্ধীয় উক্ত আকীদা-বিশ্বাসকে কিছু লোক এ শিরোনামেও প্রকাশ করে থাকে যে, 'আসল উদ্দেশ্য হল আত্মিক সংশোধন। আমাদের অন্তর যখন পবিত্র, তখন কোন অসুবিধা নেই। শরীয়তের বাহ্যিক বিধি-বিধান পালন করা আমাদের জরুরী নয়।'

উক্ত আকীদাও সম্পূর্ণ কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা। এটা ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানাবলীকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ কথা সকলেই জানে যে, দ্বীনের কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানা, কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর আর কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" – সূরা বাকারা ঃ ৮৫

স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত বিধানাবলী (যাকে সাধারণতঃ যাহেরে শরীয়ত বলা হয়) তাও যথাযথ পালন করতে হবে। যাহেরে শরীয়তের উপর আমল করা ব্যতীত, আকীদা ও আমলের ইসলাহ ব্যতিরেকে মুখে শুধু এ দাবী করা যে, আমার অন্তর পবিত্র, এটি ডাহা মিথ্যা কথা হবে। কেননা, তার অন্তর যদি পবিত্রই হত তাহলে সে অবশ্যই শরীয়তের সকল হুকুম আহকামের অনুসরণ করত।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

"শুনে রেখো! শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক। তা নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। খবরদার! সে টুকরোটি হচ্ছে অন্তর।"—সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সুতরাং, যদি তার অন্তর পবিত্র হত, সঠিক হত, তাহলে সে তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধীয় শরয়ী বিধি-বিধানের অনুসারী হত। আসল কথা হল, অন্তরের বিষয়টি যেহেতু গোপন, তাই তার ইসলাহ ও সংশোধনের দাবী করা সহজ। এই বাহানায় শরীয়তের বিধি-বিধান হতে বেঁচে থাকাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। অতএব তাদের অন্তর পবিত্র কি-না, তাদের সাথে আমাদের এ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সোজা কথা হল শরীয়তের কতিপয় বিধি-বিধান রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধীয়, যাকে যাহেরে শরীয়ত বলা হয়, আর কিছু বিধানাবলী আছে অন্তর সম্বন্ধীয়, যাকে বাতেনে শরীয়ত বলা হয়। কোন ব্যক্তি শরীয়তের উপর ঈমান এনেছে, এ কথা তখনই বলা যাবে, যখন সে শরীয়তের উভয় প্রকার বিধি-বিধানের উপর ঈমান রাখবে। এক মানুষকে শরীয়তের অনুসারী তখনই বলা হবে, যখন সে উভয় প্রকার বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসরণ করবে।

সুতরাং, যদি তোমার অন্তর পবিত্রও হয়ে থাকে, তবুও মুমিন হওয়ার জন্যে যাহেরী হুকুম আহকাম তোমাকে মানতেই হবে। নতুবা তোমার অবস্থা হবে ইয়াহুদীদের ন্যায়, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ .....

"তোমরা কি গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর আর কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তির দিকে পৌছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" – সূরা বাকারা ঃ ৮৫

৪. সিনা বসিনা বা শবে মিরাজের নব্বই হাজার কালাম

বাতেনী ও ধর্মহীন সূফীদের বিকৃতির আগে 'সিনা বসিনা' (আরবীতে 'সদরান আন সদরিন') একটি ইলমী পরিভাষা ছিল। এ পরিভাষাগত উক্তিটির একটি বিশেষ অর্থ ছিল। আজো তা হক পন্থীদের বক্তব্যে সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সিনা পরম্পরায় ইলমে দ্বীন চলে আসার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক পরবর্তী পূর্ববর্তীদের সংসর্গে থেকে সরাসরি ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সরাসরিভাবে ইলমে দ্বীন হাছিলে কিতাবের মাধ্যম কম ছিল। উস্তাদ পূর্ববর্তীদের নিকট যা কিছু পড়তেন, শিখতেন ও তাঁদেরকে দেখে স্বীয় বক্ষে ধারণ করতেন, তাই নিজ শাগরিদদেরকে পড়াতেন, শিখাতেন এবং আমল করে দেখাতেন। সে শাগরিদও এ ভাবে সংরক্ষণ করত। যেমন কুরআনের হাফেযগণ স্বীয় বক্ষে কুরআন মজীদ হেফাযত করছেন।

পরবর্তী যুগে যখন ইল্‌ম সংকলিত হল এবং সিনায় চলে আসা প্রত্যক্ষ ইলম স্বয়ং সিনাধারীরাই কিতাবে লেখে দিলেন, তখনও শুধু কিতাবের উপর ভরসা করা হত না, বরং কিতাবকে মাধ্যম বানিয়ে সামনা সামনি ইলমে দ্বীন শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এভাবে কারো সোহবতে থেকে সরাসরি উস্তাদ হতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করাকে সিনা বসিনা শব্দে ব্যক্ত করা হয়।[১]

কিন্তু বেদ্বীন সূফীরা শরীয়ত পরিপন্থী আকীদা বিশ্বাস এবং আমল ও মতবাদ প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্যে এ মূল্যবান ইলমী পরিভাষাটিকে হাতিয়ার বানিয়েছে। ফলে তারা যখন শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু চালু করতে যায়, তখন যদি তাদের কাছে শরীয়তের উৎস-কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের দলীল পেশ করা হয়, তখন তারা নির্দ্বিধায় বলে উঠে, এটাতো তোমরা কিতাব থেকে বলেছ, আমরা তো সিনা বসিনা পেয়েছি এরূপ করা জায়েয।'

শুধু মুসলমানদের নিকটই নয় বরং সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নিকটও এরূপ কথার যে কোন মূল্যই নেই, তা অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু আমি এখানে কেবলমাত্র এতটুকু বলছি যে, এরূপ যারা বলে, তারা শরীয়ত তথা কুরআন-হাদীসের বিরোধিতার কারণে ইসলাম থেকে বহির্ভূত একটি দল। এরা এমন এক দল যে, নিজেরাই ইসলামের পরিধি হতে বের হতে চায়। কিন্তু ইসলামী শাসনের তলোয়ারের ভয়ে, পার্থিব বিভিন্ন স্বার্থের কারণে এ সব নানা প্রকার নিরর্থক কথার আড়ালে স্বীয় কুফরীকে নিজেরাই আবার গোপনও করতে চায়।

যাহোক, তাদের উক্ত উক্তি একেবারে ভিত্তিহীন ও অবান্তর। কেননা, সিনা তথা বক্ষ তো কোন কাল্পনিক কিছু নয়, বরং সে সিনা কোন না কোন মানুষেরই হবে। আর তারা বলতেও চায় যে, তাদের এ সব বাজে ও অলীক উক্তিসমূহ একজনের সিনা হতে অন্য জনের সিনা পরম্পরায় চলে আসছে।

এখন প্রশ্ন হল, সে সিনাধারী লোকগুলো কারা ? তারা কি আল্লাহর ওলী ? নাকি শয়তানের ওলী ? না নিজেরাই মানবরূপী শয়তান ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এ সব কথা সিনা পরম্পরায় কিভাবে চলে এসেছে ? সে সব মানুষের জিহবা ও ভাষার মাধ্যমে ? নাকি ঈথারে ভেসে ?

যাহোক, যদি তাদের কথা অনুযায়ী সে সিনাধারী লোকগুলো ওলী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের এসব উক্তির জন্যে দেখাতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. – মুআফাকাত (আল্লামা শাতেবী রহঃ) ঃ ১/৮২-৮৮

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এমন নির্ভেজাল সনদ, যাতে থাকবে প্রতিটি স্তরে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর ওলী, যাদের মুখে এসব উক্তি উচ্চারিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, শরীয়তের খেলাফ কোন কথা প্রমাণের জন্যে কেউ একটি সনদও পেশ করতে পারবে না। যাহোক, এগুলোর অসারতা প্রমাণের জন্যে এগুলোকে শরীয়তের মানদণ্ডে তোলারও প্রয়োজন নেই।

হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ) খুবই সুন্দর কথা বলেছেন, "যদি এরূপ ভিত্তিহীন দাবীর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলতে পারে, মিয়া! কিতাবে তো লেখা আছে হাতেম তাঈ বড় দানবীর ছিলেন, কিন্তু এটা পুঁথিগত ইলম। আর আমার কাছে বুযুর্গদের নিকট থেকে এ গোপন তথ্য সিনা পরম্পরায় পৌছেছে যে, হাতেম তাঈ বড় কৃপন ব্যক্তি ছিলেন। তবে সাবধান! এ কথা কারো নিকট প্রকাশ করো না। অন্যথায় কাঠ মোল্লারা তোমাকে মিথ্যুক বলবে।

অনুরূপ ভাবে যা ইচ্ছা তাই সিনা পরম্পরায় চলে আসছে বলে চালিয়ে দাও। দেখ আর কি বাকী থাকে।"–তালীমুদ্দীন ঃ ১৫৪

শেষ কথা হল, 'সিনা বসিনা' বলতে যদি আল্লাহ তা'আলার ওলীদের সিনা বুঝানো তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'সিনা বসিনা'-এর সঠিক অর্থ (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) হিসেবে আল্লাহর ওলীদের যে সব আমল ও বাণীসমূহ আমাদের কাছে পৌছেছে সেগুলোর সারাংশ হল শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণ-অনুকরণ, এর বাইরে কিছু নয়। এ সংক্রান্ত তাঁদের কতিপয় বাণী ১৬১–১৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নব্বই হাজার কালাম

সে সব বেদ্বীন সূফীর মধ্যে একদল গাফেল সূফী রয়েছে। তারা 'সিনা বসিনা'-এর অস্ত্র চালাতে গিয়ে দিবালোকে পুকুর চুরি করেছে। তারা বলে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম (বাণী) লাভ করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম কেবল মাত্র ত্রিশ হাজার কালাম জানেন। অবশিষ্ট ষাট হাজারই এসব সূফী ফকীর ও দরবেশের নিকট রয়েছে, যা তারা সিনা পরম্পরায় লাভ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র হযরত আলী (রাযিঃ) কে গোপনে সে ষাট হাজার কালাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর হযরত আলী (রাযিঃ) হতে সিনা পরম্পরায় এ ফকীরদের নিকট তা পৌছেছে। এদিকে উলামায়ে কেরাম

যেহেতু এসব কালাম জানেন না, তাই তাঁরা কিছু দেখলেই ফকীর-দরবেশদের উপর অভিযোগ করে বসেন।'

উক্ত দাবীর অসারতাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ঃ

প্রথমতঃ এতে আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দু'প্রকার শরীয়ত দিয়েছেন। একটি হল ত্রিশ হাজার কালাম বিশিষ্ট শরীয়ত। অন্যটি হল ষাট হাজার কালাম বিশিষ্ট এবং উভয় শরীয়ত পরস্পর বিরোধী। এক শরীয়তে একটি বস্তু হালাল, অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম। এরূপ পরস্পর বিরোধী কাজ কোন সৃষ্টিজীবের বেলায়ও নিকৃষ্ট। সেটিকে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানে চালিয়ে দিয়েছে। এর ফলে তারা ঈমানের সর্ব প্রথম রুকন-ঈমান বিল্লাহ্ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসের গণ্ডি হতে বের হয়ে গেছে। فَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

দ্বিতীয়তঃ উক্ত দাবীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও মিথ্যারোপ করা হয়। তাঁর উপর এ অপবাদ আসে যে, তিনি দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা-যা সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা জরুরী ছিল, তা যথাযথ পৌছাননি। শুধু একজনকে কানে-কানে বলে গেছেন। আর অন্যদেরকে তার বিপরীত বলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে ব্যক্তির এরূপ ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত ঃ মে'রাজ রজনীর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন-হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। সে সবের কোথাও এরূপ কথা উল্লেখ নেই।

চতুর্থতঃ এই আকীদা রাখা যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে দ্বীনের বিশেষ বিশেষ এমন কথা গোপনে বলে গেছেন যা অন্যদেরকে বলে যাননি।' মূলতঃ এরূপ আকীদা সাবায়ী (যারা উম্মতের ঐকমত্যে কাফের) চক্রের ছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে এ চক্র তাদের উক্ত আকীদা প্রচার করলে তখনই অন্যান্য লোকেরা সরাসরি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে তদন্ত করেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেদেন। এসম্পর্কে সহীহ অসংখ্য রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। এখানে একটি মাত্র রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হল ঃ

"এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মানুষের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন, হযরত আলী (রাঃ) এ কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। অতঃপর বললেন ঃ

ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غيرأنه حدثني بأربع كلمات وأنا و هو في البيت فقال : لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا و لعن الله من غير منار الأرض.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের গোপনে আমাকে কিছু বলে যাননি। তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়েই ঘরের ভিতর ছিলাম। তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতাকে লানত করে আল্লাহ তাআলা তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন। যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সমর্থন করে আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন। যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন (সীমানা) এদিক সেদিক করে আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত করেন।" –সুনানে নাসায়ী ঃ হাদীস ৪৪২২

যাহোক, এ প্রকার দাবীর বাতুলতার জন্যে এ টুকু বর্ণনাই অতিরিক্ত। একজন মুসলমানের মধ্যে কমপক্ষে দ্বীনের এতটুকু জ্ঞান থাকা উচিত, যাতে সে এ ধরনের স্পষ্ট কল্পিত বিষয়ে ধোঁকা না খায় এবং তার হাকীকত বুঝতে পারে।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

৫. পীর মুরীদীর অন্তরালে শিরকের প্রচার

এ বিষয়ে আসার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ দু'টি কথা বলে নেওয়া একান্ত জরুরী মনে করছি।

আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার গুরুত্ব ও তার সীমারেখা

ইসলামে বড়দের ভক্তি-শ্রদ্ধা করার গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বস্তরের আলেম-উলামা পীর-মাশায়েখ, এক কথায় সর্বযুগের আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত করা, শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং দ্বীনী বিষয়াবলীর ব্যাপারে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে এ সবের স্থান অনেক উর্ধ্বে। ইসলাম তার সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। আরোপ করেছে এ সম্পর্কিত অনেক নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান যা যথাযথভাবে পালন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর আবশ্যক।

রিজালুল্লাহ তথা আল্লাহ ওয়ালাদের তালিকার সর্বাগ্রে-শীর্ষে রয়েছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম । আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সর্দার হলেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একজন মুমিনের অন্তরে তাঁর

মহব্বত সকল সৃষ্টির চাইতে বেশী হতে হবে। তাঁর মহব্বত, অনুসরণ-অনুকরণ ও শ্রদ্ধা-সম্মান ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। যে সব কার্যকলাপে তিনি সামান্যতমও কষ্ট পান তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা, তাঁর সাথে সামান্যতম বেআদবিমূলক কোন আচরণের কল্পনা হতেও বেঁচে থাকা, কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত তাঁর সকল শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং সেগুলো বর্ণনা করা প্রতিটি মুমিনের সর্বপ্রথম ঈমানী দায়িত্ব।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পর রিজালুল্লাহর তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম রিয্ওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন। তাঁদেরকে, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে দ্বীনকে সম্মান করা। সর্বোপরি মর্যাদানুসারে সর্ব যুগের উলামা-মাশায়েখ, নেককার দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, তাঁদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করার জোর তাগিদও শরীয়ত প্রদান করেছে।

তবে এতটুকু করেই শরীয়ত ক্ষান্ত হয়নি, বরং রিজালুল্লাহর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে যাতে শিরকের দ্বার উন্মুক্ত না হয়, সেদিকে শরীয়ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তাই এমন সকল কার্যকলাপ শরীয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে-যা দ্বারা ভক্তির নামে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করা বুঝায় অথবা শিরকের গন্ধ আসে। শরীয়ত ভক্তি-শ্রদ্ধাকে তার সীমা পর্যন্ত সীমিত রাখাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। ভক্তি-শ্রদ্ধাকে ইবাদতে পরিণত করা বা ইবাদত সাদৃশ করাকে বৈধ রাখেনি। সাথে সাথে এমন সকল কার্যকলাপের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, যেগুলো দৃশ্যতঃ বা মুখের দাবীতে তো রিজালুল্লাহর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা রিজালুল্লাহর মা'বূদ এবং আমাদের সকলের একমাত্র মাবূদ আল্লাহ রাববুল আলামীনের শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী।

রিজালুল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব হলেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা হতে বহু বহু গুণে উর্ধ্বে। তাই তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অধিকারও অন্যদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তার পরও তিনি নিজের ব্যাপারে ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্পর্কিত এমন কোন কাজ বা কথা বলার মোটেও অনুমতি দিতেন না, যদ্দ্বারা (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্টের সামান্যতম অংশিদারিত্ব বুঝা যায় অথবা যার মধ্যে রাসূলের ইবাদতের সামান্যতম গন্ধ আসে। এমনকি সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব প্রশংসার বেলায়ও যেখানে এ আশংকা ছিল যে, হয়ত ভবিষ্যতে প্রশংসাকারীরা এ ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করবে, সেখানেও তিনি কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। মনোযোগ সহকারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো বার বার অধ্যয়ন করুন।

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يراجع الكلام، فقال : ما شاء الله و شئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أجعلتني والله عدلا ؟! بل ماشاء الله وحده. رواه أحمد في «مسنده» برقم ٣٢٣٧ و ١٨٤٢، وإسناده حسن.

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথোপকথনের মাঝ খানে বলে উঠলঃ ما شاء الله و شئت (আল্লাহ ও আপনি যা ইচ্ছা করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাচ্ছ ? বরং ماشاء الله وحده (একমাত্র আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন) বল।" –মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ৩২৩৭, ১৮৪২

عن عبد الملك بن عمير قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاتقولوا : ماشاء الله وشاء محمد، وقولوا: ماشاء الله وحده. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم ١٩٨١٣ وهو مرسل صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد حسن متصل، من حديث طفيل بن سخبرة، رواه أحمد في «مسنده» برقم ٢٠١٧١.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ তোমরা ما شاء الله وشاء محمد (যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ ইচ্ছা করেন) বলো না, বরং শুধু ما شاء الله وحده (একমাত্র আল্লাহ তাআলা যা চান) বল।"

–মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ঃ হাদীস ১৯৮১৩, মুসনাদে আহমাদ ঃ ২০১৭১

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله.

"হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছে। আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা (দাস) মাত্র। আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বল।"

–সহীহ বুখারী ঃ ১/৪৯০, হাদীস ৩৪৪৫

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত দান করেছেন, তার সবগুলোই আব্দ্ (দাস) ও রাসূল

শব্দ দ্বয়ে এসে যায়। কেননা, একজন মানুষের জন্যে আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার চাইতে উঁচু মর্যাদা এবং রিসালতের (রাসূল হওয়া) পদের উর্ধ্বে কোন পদ নেই। অন্য সকল পদ মর্যাদা তার নীচে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবূদিয়াত তথা দাসত্বের মান সকল মাখলূকের উর্ধ্বে। এমনিভাবে রিসালাতের ক্ষেত্রেও তিনি সকল নবী ও রাসূলের সরদার।

তবে মনে রাখতে হবে, কেউ রাসূল হওয়ার পরও আল্লাহর বান্দাই থাকে। একজন মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের গণ্ডিতে থেকেই উঁচু হতে উঁচু মর্যাদা অর্জন করাই গৌরবের কথা। কেউ রাসূল হলে মা'বূদ (উপাস্য) হয়ে যায় না। অথবা মা'বূদের কোন বিশেষ গুণ তার মাঝে স্থানান্তরিত হয় না। প্রতিটি মুমিনের জন্যে এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। ঈমানে প্রবেশের জন্যে এ অর্থবোধক নিম্নোক্ত কালিমাই রয়েছে ঃ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল' প্রত্যেক মুসলমান দৈনিক কমপক্ষে বিশ বার এ কথাগুলোই নামাযের তাশাহহুদে পড়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্কতামূলক সাবধান করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা খৃষ্টানদের পদাংক অনুসরণ করো না। আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে তাদের ন্যায় অবাস্তব কিছু বলো না। যেমন তারা ঈসা ইবনে মারয়াম (আঃ) কে 'তিনের এক খোদা, খোদার পুত্র, স্বয়ং তিনিই একমাত্র খোদা' বলেছিল। নাউযুবিল্লাহ।

যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়াবাড়ির পথ বেছে নেয়, তাহলে সে ঐ তাওহীদকেই বিনষ্ট করে দিল যে তাওহীদ, একত্ববাদ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আবির্ভাব ঘটেছিল।

عن مطرّف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أوبعض قولكم، ولايجرمنكم الشيطان. رواه أبو داود في «سننه» برقم ٤٧٩٦، وإسناده صحيح، كما في «عون المعبود» ١٣:١١١.

"আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁকে সম্বোধন করে বললাম, আপনি আমাদের সায়্যিদ তথা মুনীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মুনীব তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আমরা আরয করলাম, আপনি আমাদের মাঝে সবচাইতে মর্যাদাবান ও সর্বোত্তম ব্যক্তি।

এতদশ্রবণে তিনি ইরশাদ করেন ঃ হ্যাঁ, এতটুকু বলতে পার অথবা এর চাইতে আরো কম। তবে সাবধান থেকো, শয়তান যেন তোমাদেরকে এ ব্যাপারে এতটুকু ধৃষ্ট না বানিয়ে ফেলে (যে তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি শুরু কর)।

–সুনানে আবূ দাউদ ঃ ২/ ৬৬২, হাদীস ৪৭৯৬

'সায়্যিদ' শব্দের দু'টি অর্থ আছে, ১. প্রকৃত সরদার, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ও পরাক্রমশালী। তিনি কারো শাসিত নন, যা ইচ্ছা তাই করেন। এ অর্থ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউই সায়্যিদ নন।

২. ইহকাল বা পরকালে যে অন্যের তুলনায় বড় এবং যার কথা মান্য করা হয়। এ অর্থ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানের সর্দার। হাদীস শরীফে আছে ঃ أنا سيد ولد آدم ولا فخر 'আমি সমস্ত বনী আদমের সরদার, (আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া) গর্ব করে বলছি না।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলারই নির্দেশে তিনি একান্ত অনুসরণীয় অনুকরণীয় রাসূল ও সরদার। বনী আমেরের প্রতিনিধি দল সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মূল জিনিসটির ব্যাপারে এমর্মে সতর্ক করেছেন যে, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরব থাকার সুবাদে তাঁকে প্রথম অর্থ হিসেবে সায়্যিদ না বলা হয়।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أحمد في «مسنده» برقم ١٢١٤١، وإسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه النسائي أيضا في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ١: ١٣٠

"হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! হে আমাদের সরদার! হে আমাদের সরদারের ছেলে! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ লোক সকল ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (আল্লাহকে ভয় কর)। শয়তান যেন তোমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট না করতে পারে। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ। আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে ঐ মর্যাদা ও স্থানের ঊর্ধ্বে উঠাবে, যে মর্যাদা ও স্থানে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমাসীন করেছেন।' –মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ১২১৪১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই সর্বোত্তম মানব, সমস্ত আদম সন্তানের সরদার। কিন্তু ঐ ব্যক্তির বাকরীতির দ্বারা বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল, তাই তিনি সাথে সাথেই সতর্ক করে দেন।

عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه قال: إنه أتى الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، قال: فقلت: لأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا: هذا كان تحية الأنبياء قبلنا، فقلت: نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك : السلام، تحية أهل الجنة. رواه أحمد في «مسنده» برقم ١٨٩١٤، وأحيل فيه على ما قبله المذكور برقم ١٨٩١٣، فاللفظ المذكور منهما، والإسناد حسن. مع ما للمتن من شواهد.

"হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি শাম (সিরিয়া) গেলে সেখানকার খৃষ্টান অধিবাসী কর্তৃক পোপ ও পাদ্রীদেরকে সিজদা করতে দেখলেন। হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, আমি তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা কেন এমন কর ? তারা উত্তরে বলল, এটা তো আমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অভিবাদন (সম্মান ও ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম) ছিল। আমি (মুআয) বললাম ঃ তাহলে আমরা স্বীয় নবীকে এ প্রকারের ভক্তি প্রকাশের অধিক অধিকার রাখি। (সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁকে সিজদা করার অনুমতি চাইলে) তিনি ইরশাদ করলেন ঃ এরা (খৃষ্টানরা) স্বীয় নবীদের উপর মিথ্যারোপ করেছে (যে, তাদের অভিবাদন সিজদা ছিল।) যেমন ওরা নিজেদের আসমানী কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের মনগড়া অভিবাদনের চাইতে অতি উত্তম অভিবাদন-সালাম আমাদেরকে দান করেছেন। এ সালাম জান্নাতবাসীদের অভিবাদন।" -মুসনাদে আহমদ ঃ হাদীস ১৮৯১৩, ১৮৯১৪

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله! تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.. رواه أحمد في «مسنده» برقم ٢٣٩٥٠، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»٤: ٣١٠: رواه أحمد، وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف.

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজের ও আনসারদের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। তা দেখে তাঁর সাহাবীরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! গাছ-পালা ও পশু-পাখি পর্যন্ত আপনাকে সিজদা করে। কাজেই আমরা আপনাকে সিজদা করার অধিক হক রাখি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ (না,) তোমরা স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইয়ের সম্মান কর। যদি আমি কাউকে (অভিবাদন স্বরূপ) সিজদা করার অনুমতি প্রদান করতাম, তাহলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি প্রদান করতাম।" -মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ২৩৯৫০

সিজদার উপযুক্ত সে-ই, যে ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা,পালনকর্তা ও বিধানদাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচাইতে বেশী সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তাঁর অনসুসরণ-অনুকরণ সমগ্র সৃষ্টিজীবের জন্যে ফরয। তবে যাই হোক, তিনি সৃষ্টি, স্রষ্টা নন। আব্‌দ তথা দাস, মা'বূদ (উপাস্য) নন। এজন্যে তিনি নিজকে অভিবাদন স্বরূপও সিজদা করার অনুমতি দেননি। কেননা, ইবাদতের সাথে এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীসে এভাবে বলেছেন ঃ

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. رواه أحمد في «مسنده» برقم ١٢٢٠٣، والنسائي في «السنن الكبرى». قال القسطلاني في «المواهب اللدنية » ٦: ٥٤٠: إسناده جيد

'কোন মানুষ মানুষকে (অভিবাদন স্বরূপও) সিজদা করতে পারে না। যদি এমন হত তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বীয় স্বামীকে (অভিবাদন স্বরূপ) সিজদা করতে। কেননা, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার রয়েছে অনেক।' -মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ১২২০৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যে সকল নবী-রাসূল, পীর-মাশায়েখ, আলেম-উলামা ও নেককার ব্যক্তিবর্গ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় ত্যাগ তিতিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং শিরকের মূলোৎপাটনে জীবন উৎসর্গ করেছেন-তাঁদেরই উম্মত ও ভক্তরা ইন্তেকালের পর তাঁদের কবরকে সিজদাস্থল এবং মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। এ জন্যে তিনি সূচনালগ্নেই সতর্ক করে দিয়েছেন এবং মৃত্যু পরবর্তী কালীন নির্দেশ জারী করতে গিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.

"তোমাদের পূর্ববর্তী কতক উম্মত স্বীয় নবী ও বুযুর্গদের কবরকে সিজদাস্থল বানিয়েছে। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদাস্থল বানিও না। আমি তোমাদেরকে তা হতে বারণ করছি।"– সহীহ মুসলিম ঃ ১/২০১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় ওফাতের পূর্ব মুহূর্তেও আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করেছেন ঃ

اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.رواه مالك في الموطأ ص -٦٠ مرسلا، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة . ورواه بنحوه أحمد في «مسنده»٢:٢٤٦ برقم ٧٣١١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن.

"হে আল্লাহ! আমার কবরকে প্রতিমার ন্যায় ইবাদতের বস্তু বানিও না। আল্লাহর গযব সে সকল লোকের উপর কঠোর আকার ধারণ করেছে, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাস্থল বানিয়েছে।" –মুআত্তা ইমাম মালেক ঃ ৬০, মুসনাদে আহমাদ ঃ হাদীস ৭৩১১

মোটকথা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র উম্মতের জন্যে আদর্শ। সাধারণ, অসাধারণ, পীর-মুরীদ, উস্তাদ-শাগরিদ, আলেম-জাহেল, সর্বোপরি শ্রেণী নির্বিশেষে তিনি সকলের অনুসরণীয় ইমাম, নবী ও রাসূল। ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে ছোটদের কি কি শর্ত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, ছোটদের প্রতি বড়দের কি পরিমাণ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন- এসব কিছুর নমুনা এবং দিক নির্দেশনা রাসূলের জীবন-চরিতে বিদ্যমান রয়েছে। প্রয়োজন শুধু হিম্মত করে আমলে রূপ দেওয়ার।

ভূমিকা স্বরূপ এ বয়ানের পর মূল আলোচ্য বিষয় 'পীর-মুরীদীর অন্তরালে শিরকের প্রচার'–এর দিকে আসছি।

পীর-মুরীদীর অন্তরালে তাওহীদের মূলোৎপাটন ও শিরকের প্রচার

আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, তাওহীদের (একত্ববাদের) বিশ্বাস এবং সর্ব প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের সর্বপ্রথম ও গুরত্বপূর্ণ ফরয। একজন মানুষ পীর-মুরীদীর পথে আসার অর্থ এই যে, তার আকীদা, আমল, লেনদেন, আদব, আখলাকে যাহেরা (বাহ্যিক চরিত্র) সব কিছুই সংশোধন হয়ে গেছে। এখন আরেক স্তর উপরে আখলাকে বাতেনার (অভ্যন্তরীণ চরিত্রের) সংশোধন করছে, যার দিকে সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি যায় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বহু লেবাসধারী পীর এবং তাদের জাহেল মুরীদরা পীর-মুরীদীর মাধ্যমে ঈমানের সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয–আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনকে পদদলিত করে চলছে। আকীদা বিশ্বাসের প্রথম ও জরুরী বিষয় একত্ববাদের মূলোৎপাটন করতঃ তদস্থলে শিরকের বিস্তার ও প্রচার-প্রসারকে নিত্যদিনের কাজ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ঃ

"আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে আকীদা-বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও বান্দার পারস্পারিক সম্পর্কের সংশোধন এবং একমাত্র মা'বূদ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দাওয়াত-আহবানই ছিল নবীগণের প্রথম কাজ। সর্বযুগে সকল পরিবেশ পরিস্থিতিতে আম্বিয়া (আঃ)-এর উক্ত দাওয়াতই ছিল প্রথম দাওয়াত এবং তাঁদের আবির্ভাবের প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সর্বদা তাঁদের শিক্ষা এই ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই লাভ বা ক্ষতিসাধনের শক্তি রাখেন। তিনিই ইবাদত, দু'আ ও কুরবাণীর উপযুক্ত।

যুগে যুগে তাঁরাই পৌত্তলিকতাবাদের উপর আঘাত হেনেছেন। যে সব প্রতিমা পূণ্যবান, পুত পবিত্র মৃত বা জীবিত ব্যক্তিত্বদের উপাসনার আকৃতিতে বিকশিত ছিল, সে সব ব্যক্তিত্বদের ব্যাপারে জাহেলী যুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল-আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইযযত, সম্মান ও প্রভুত্বের গুণে ধন্য করেছেন। তাঁদেরকে বিশেষ বিশেষ কাজের পূর্ণ ক্ষমতাও দিয়ে রেখেছেন। লোকদের জন্যে তাঁদের সকল সুপারিশ গ্রহণ করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্র প্রধান প্রতিটি অঞ্চলের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শাসক বা এলাকা প্রধান পাঠান। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য ব্যতীত আঞ্চলিক সার্বিক শৃঙ্খলা ও তত্ত্বাবধানের সকল দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে। এজন্যে আঞ্চলিক প্রধানের নিকট যাওয়া এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

কুরআনের সাথে যার সামান্যতম সম্পর্ক আছে (যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের শিক্ষার সমষ্টি) সে নিশ্চিত জানে যে, শিরক ও প্রতিমা পূজার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে দুনিয়া হতে চিরতরে উৎখাতের চেষ্টা করা,

মানুষকে তার করাল থাবা হতে স্থায়ীভাবে মুক্ত করাই নবুওয়তের মূল উদ্দেশ্য ছিল। নবীদের আবির্ভাবের মূল লক্ষ্য, তাঁদের দাওয়াতের ভিত্তি, তাঁদের আমলের শেষ কথা, তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটিই ছিল। এটিই ছিল তাঁদের দাওয়াতি অভিযানের কেন্দ্রবিন্দু। কুরআন মজীদ তাদের ব্যাপারে কখনো সংক্ষিপ্তাকারে এ ঘোষণা প্রদান করেছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে আমি এ আদেশই প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং, তোমরা আমারই ইবাদত কর।"–সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫

আবার কখনো বিস্তারিত ভাবে নবীদের নাম নিয়ে নিয়ে বলেন, তাঁর দাওয়াতের সূচনা তাওহীদ, একত্ববাদের দাওয়াতের মাধ্যমে হয়েছিল।[১] তাদের প্রথম কথা এটিই ছিল ঃ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ "হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই।"

–সূরা আরাফ ঃ ৫৯

এ পৌত্তলিকতা ও শিরক (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকে মা'বুদ বানানো, তার সামনে স্বীয় অক্ষমতা, নিঃসহায়তা ও অপারগতা প্রকাশ করা, তার সামনে সিজদাবনত হওয়া, তার নিকট সাহায্য কামনা করা, তার জন্যে নযর-মান্নত ইত্যাদি করা) ছিল বিশ্ব জুড়ে, সারা জীবন ব্যাপ্ত এবং মারাত্মক জাহেলিয়াত। তা কোন যুগ বিশেষের সাথে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা ছিল মানব জাতির অতি প্রাচীনতম দুরূহ ব্যাধি। এ ব্যাধি ইতিহাসের সকল যুগ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচার ও রাজনীতির অহর্নিশ উত্থান-পতন সত্ত্বেও মানব জাতির পেছনে লেগে আছে। এটা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ বৃদ্ধি করে। মানুষের আত্মিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানবতার উচ্চাসন হতে নামিয়ে অবনতির অতল গহ্বরে উপুড় করে নিক্ষেপ করে। আর এ মূর্তিপূজা ও শিরক দূরীভূত করা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনী দাওয়াত এবং সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি ও নবুওয়তের চিরন্তন উত্তরাধিকার। আর এটিই সকল মুসলিহ (সংশোধক) মুজাহিদ এবং আল্লাহর রাহে দাওয়াত প্রদানকারীদের বিশ্বজনীন স্থায়ী প্রতীক।"[২]

১–সূরা আরাফে হযরত নূহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ) ও হযরত শুআইব (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করে (উপরোক্ত শব্দে) তাঁদের তাওহীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আরাফ রুকূ ৮, রুকূ ১২, তেমনি সূরা হুদ, রুকূ ৩, রুকূ ৮)

২–দস্তূরে হায়াত ঃ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) পৃষ্ঠা ৮০-৮৩

কিন্তু আফসোসের বিষয়, এ বিশ্বজনীন ও স্থায়ী প্রতীককে পদদলিত করেছে একদল ধর্মহীন পীর এবং তাদের জাহেল মুরীদরা। ফলশ্রুতিতে তারা নিম্নোক্ত প্রকার শিরকের বিস্তার ঘটিয়েছে ঃ

ক. পীর সাহেবকে লাভক্ষতি সাধন এবং বিশ্ব পরিচালনায় ক্ষমতাধর মনে করা। পীর সাহেবকে উদ্ধার ও ত্রাণকর্তা মনে করা।

খ. পীর সাহেবের নিকট স্বীয় প্রয়োজনাদি কামনা করা, বিপদ আপদে তাকে ডাকা।

গ. পীর সাহেবের নৈকট্য হাছিল করার জন্যে তার নামে পশু জবাই করা।

ঘ. পীর সাহেবের নামে মান্নত করা।

ঙ. পীর সাহেবের কবর তওয়াফ করা। তার কবরকে সিজদা করা। কবরকে ঈদগাহ বানানো এবং সেখানে বাৎসরিক ঈদ উদযাপন করা। হজ্বের ন্যায় জীব-জন্তু সঙ্গে নিয়ে সেখানে সফর করা।

চ. পীর সাহেবকে হেদায়াতের মালিক মনে করা, জান্নাতে প্রবেশ করানো ও জাহান্নাম হতে মুক্তি দানে ক্ষমতাবান মনে করা।

ছ. পীর সাহেবকের ব্যাপারে হুলুল তথা আল্লাহর সত্তা পীরসাহেবর মধ্যে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার আকীদা পোষণ করা।

শিরকের এ সব প্রকার নিয়ে আলোচনার পূর্বে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে কিছু মৌলিক কথা জেনে রাখা দরকার।[১]

তাওহীদের সর্বনিম্নস্তর কালিমায়ে তয়্যিবার দাবী

তাওহীদ সংক্রান্ত একটি মৌলিক কথা জেনে রাখা উচিত যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদের এক স্তর অনেক মুশরেকরাও স্বীকার করে থাকে। কিন্তু কুরআন হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্যে এই স্তর যথেষ্ট নয়। যেমন এ কথা স্বীকার করা যে, আসমান, জমিন ও সমস্ত কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা একজন। এমন নয় যে, কিছু সৃষ্টি করেছেন একজন আর কিছু সৃষ্টি করেছেন আরেকজন। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে এ কথার স্বাক্ষ্য বিদ্যমান আছে যে, এতটুকু কথা আরবের মুশরেকরাও মানত।

শব্দের সামান্য ব্যবধানে কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি মুশরেকদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, বল তো আসমান, জমিন ও

১–আগত মৌলিক কথাগুলো হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী (রহঃ) রচিত ঃ ইসলাম কেয়া হ্যায়, দীন ও শরীয়ত এবং কুরআন আপ ছে কেয়া কাহতা হ্যায়, গ্রন্থগুলো থেকে গৃহীত।

কায়েনাতকে কে সৃষ্টি করেছেন ? তাহলে তারা বলবে এবং স্বীকার করবে যে, এ সব কিছু আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ.

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে, কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'।"–সূরা আনকাবূত ঃ ৬১

বরং তারা স্বীকার করে যে, সারা বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ! তিনিই আহার দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনিই জীবনদান করেন। সূরা ইউনূস-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ.

'হে পয়গাম্বর! আপনি মুশরেকদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, বল তো কে তোমাদেরকে আসমান জমিন থেকে রুযী দেন? এবং কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? পরিষ্কার বলবে যে, এসকল কিছু করনেওয়ালা, আল্লাহ!" –সূরা ইউনুস ঃ ৩১

যাহোক এতটুকু একত্ববাদের স্বীকার আরবের মুশরেকরাও করত।

তাদের শিরক কি ছিল?

তাই এখন চিন্তা করার বিষয় যে, তারপরও তাদের শিরক কি ছিল ? কুরআন মাজীদ থেকেই জানা যায় যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও পরিচালনাকারী মানার পরও এই মনে করত যে, আমরা যেসব দেবদেবী মেনে থাকি তারা যদিও সে-ই আল্লাহর সৃষ্টি ও মাখলূক, তথাপি আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদি তারা কাউকে কিছু দিতে চায় তাহলে দিতে পারে। কারো থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চাইলে ছিনিয়ে নিতে পারে। কাউকে সম্পদ দিয়ে আমীর বানাতে চাইলে বানাতে পারে। কারো থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীব বানাতে চাইলে বানাতে পারে। এমনিভাবে কাউকে রোগী বা সুস্থ করতে ইচ্ছে করলে তা করতে পারে। কাউকে সন্তান দিতে চাইলে তা দান করতে পারে।

মোটকথা, এই মুশরেকরা মনে করত যে, সে বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের দেবতাদেরকে এসব ছোটখাট কাজের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। এ ভিত্তিতে ওদেরকে (দেবতাদেরকে) রাজিখুশি রাখার জন্যে তারা

ওদের ইবাদত করত, তাদের নামে নযর মান্নত করত, তাদের মূর্তির চতুর্দিকে তাওয়াফ করত, নিজেদের যরূরত ও হাজত তাদের কাছে কামনা করত। এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ তাদের সে সব ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতিকে শিরক সাব্যস্ত করেছে। অধিকাংশ দেশ ও জাতির মুশরেকদের মধ্যে এ প্রকার শিরকই প্রচলিত ছিল।

এমন মুশরেক দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যার আকীদা এরূপ যে, দুনিয়া সৃষ্টি করা এবং বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার কোন শরীক রয়েছে। আমাদের জানা মতে কোন মুশরেক সম্প্রদায়ই এমন নেই, যারা তাদের মা'বূদদেরকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবের মুশরেকদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে পরিষ্কার সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে এবং কুরআন মাজীদেই তাদের উক্ত কর্মপদ্ধতির কথা কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন তারা পানি পথে নৌযানে সফর করত আর পানির উত্তাল তরঙ্গ তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করত, তখন তারা নিজেদের সকল দেবতার কথা ভুলে যেত। কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত এবং তারই নিকট নাজাতের আশা রাখত। কুরআন মাজীদের একস্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ.

'যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত সে সব দেবতাকে ভুলে যাও যাদেরকে তোমরা (অন্যান্য স্থানে) ডেকে থাক।'—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

'যখন তাদেরকে মেঘমালা সাদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে।' —সূরা লোকমান ঃ ৩২

যাহোক, আরব মুশরেকদের কথা ও কাজ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করত না, বরং আল্লাহ তাআলাকে সবার ঊর্ধ্বে এবং সবচাইতে মর্যাদাবান মনে করত। আর তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার মাখলূক ও মালিকানাধীন মনে করত।

হাদীসের কিতাবসমূহে আরব মুশরেকদের তালবিয়া তথা হজ্বধ্বনি বর্ণিত হয়েছে, যা তারা নিজেদের শিরকী হজ্বে পড়ত। সে তালবিয়ার শেষাংশে এ শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে ঃ إلا شريكا هو لك تملكه وماملك অর্থাৎ তারা স্বীয় হজ্বের তালবিয়ায় আল্লাহ তাআলার নিকট বলত ঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত, আপনার কোন অংশিদার নেই। হ্যাঁ, এমন অংশিদার আছে, যিনি আপনারই মালিকানাধীন, আপনি তার মালিক এবং তার কাছে যা কিছু আছে তারও মালিক।

আরব মুশরেকদের শিরকতত্ত্ব

আরব মুশরেকদের এ শিরক ছিল না যে, তারা তাদের মা'বূদদেরকে আল্লাহ তাআলার ন্যায় দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা মনে করত, গুণাবলীতে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করত, বরং তাদের শিরক এই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, পরিচালনাকারী মানা সত্ত্বেও এই মনে করত যে, আল্লাহ তাআলার সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং নৈকট্য অর্জনের কারণে আমাদের দেবতাদেরও কতিপয় শাখা পর্যায়ের কার্যাবলীর অধিকার আছে। ইচ্ছা করলে ভাঙ্গতে পারে গড়তে পারে। এরই ভিত্তিতে ওদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা তাদের ইবাদত করত অর্থাৎ সিজদা ও তাওয়াফের ন্যায় আমলগুলো করত, নযর মান্নত করত। তাদের কাছে হাজত ও মনের বাসনা কামনা করত। তাদের এই ধ্যান-ধারণা এবং এতটুকু কাজই শিরক ছিল। অধিকাংশ মুশরেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকার শিরকই প্রচলিত ছিল এবং এ কারণেই কুরআন মাজীদে এ প্রকার শিরকের খণ্ডন বেশী করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُورًا

'এবং সে মুশরেকরা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে এমন মাবূদ বানিয়েছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা নিজেরাই আল্লাহর সৃষ্টি। পরের তো দূরের কথা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। অর্থাৎ তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় কিছুই নেই।'

—সূরা ফুরকান ঃ ৩

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ.

'হে রাসূল! ঐ মুশরেকদেরকে আপনি বলুন যে, তোমরা তাদেরকে ডাক, যাদেরকে মা'বূদ মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা আসমান জমিনে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।" — সূরা সাবা ঃ ২২

অর্থাৎ তারা না আসমান জমিনের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক, না আল্লাহ তাআলার সাথে মালিকানায় তাদের কোন অংশ আছে। আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তাআলা কোন কাজে তাদের সহযোগিতা নেন।

সূরা বনী ইসরাঈলের এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

'হে রাসূল! আপনি মুশরেকদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত যাদেরকে (মালিক, ক্ষমতাধর ও ইবাদতের যোগ্য) মনে কর তাদেরকে ডাক। অথচ ওরাতো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না।'– সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৬

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

"সত্য ডাকএকমাত্র তাঁরই এবং তারা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে এর চাইতে অধিক সাড়া দিতে পারে না–পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় হস্তদয় পানির দিকে প্রসারিত করে, যাতে পানি তার মুখে পৌছে যায়, অথচ পানি (নিজে নিজে) তার মুখে পৌছবে না। আর কাফেরদের ডাক তো নিষ্ফল।"

(সূরা রা'দ ঃ ১৪)

আয়াতের উদ্দেশ্য হল, একমাত্র তাকেই ডাকা উচিত যিনি সকল লাভ-ক্ষতি সাধনের মালিক। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে আছে যার হাতে লাভ-ক্ষতি সাধনের শক্তি আছে? সুতরাং গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপায় অবলম্বনের উর্ধ্বের বিষয়াবলীর জন্যে ডাকা এমন, যেমন কেউ কোন কূপের কিনারে দাঁড়িয়ে পানির প্রতি দু'হাত প্রসারিত করে কামনা করছে যে, পানি তার মুখে পৌছে যাক! কিয়ামত পর্যন্তও এভাবে তার আশা পুরণ হবে না। কাজেই দুআ ও প্রার্থনার একমাত্র স্থল আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের নিকট দু'আ ও নিজ প্রয়োজন কামনাকরীদের ব্যাপারে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ.

"আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না পারবে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে।"সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৭

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.

"আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।" –সূরা কাসাসঃ ৮৮

উক্ত আয়াতে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমানদের জন্যে এক বিরাট ব্যাপক যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের কথা রয়েছে। কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই চিরন্তন। কখনো লয় প্রাপ্ত হবে না। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনাকারী এবং মাকসূদ কামনাকারী মূর্খ মুশরেকদের পর্যন্ত এ সত্যের উপলব্ধি আছে যে, একমাত্র আল্লাহর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। আর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই কুরআন বলে, যাদের ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই জান যে, তারা তাদের নিজ অস্তিত্ব ও জীবনের ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে না এবং নিজকে মৃত্যু ও ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচানোও তাদের সাধ্যের বাইরে, তাহলে চিন্তা করার বিষয় যে, তাদেরকে কর্ম সমাধাকারী, উদ্দেশ্য সফলকারী মনে করে তাদের নিকট সাহায্য কামনা করা, তাদেরকে ডাকা কত বড় বোকামি!

ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো ইবাদত কর, যে তোমাদের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? অথচ আল্লাহ সব শুনেন, জানেন। (কাজেই তাঁর আযাব হতে নিজকে নিরাপদ মনে করা অনুচিত।)"

–সূরা মায়িদা ঃ৭৬

অন্যত্র সেই মুশরেকদেরই ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ.

"তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সত্তার ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে আসমান ও জমিন থেকে সামান্য রুযী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না।" –সূরা নাহল ঃ ৭৩

সূরা ইউনুসের শেষ রুকূতে বিস্তারিত ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ، وَلٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَفّٰكُمْ ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানবকুল! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের ইবাদত করি না, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর। কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি মৃত্যু দেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। আর যেন সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নিবিষ্ট থাকি এবং যেন মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর তাহলে তখন তুমিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি ছাড়া তা দূরীভূত করার কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন তবে তার মেহেরবাণীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যাকে অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।" –সূরা ইউনুস ঃ ১০৪–১০৭

বস্তুত, এ আয়াতসহ আরো শতশত আয়াতে আরব মুশরেকদের যে শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে তা ছিল এই যে, তারা কতিপয় সত্তার ব্যাপারে এমন আকীদা রাখত–যদিও এরা আল্লাহর সৃষ্টি ও মালিকানাধীন, কিন্তু আল্লাহর সাথে এদের এমন সম্পর্ক এবং এ জগত পরিচালনায় এমন ভূমিকা রয়েছে, যার ফলে এরা আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে পারে। ধনদৌলত, মান-ইযযত ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দান করতে পারে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা নিজেদের হাজত এদের নিকট পেশ করত, দুআ করত, তাদেরকে খুশী করার জন্যে তাদের সিজদা করত এবং তাদের তাওয়াফ করত। অর্থাৎ যেরূপ আল্লাহ তাআলাকে রাজী খুশী করার জন্যে এবং তার নিকট অপারগতা প্রকাশ করার জন্যে দুআ করা হয়, ইবাদত বন্দেগী করা হয়, তেমনিভাবে তারাও নিজেদের বানানো মাবূদদের উদ্দেশ্যে এ সব করত।

কুরআন মাজীদ তাদের এরূপ আকীদা বিশ্বাসকেই শিরক সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের ইবাদত ও সাহায্য কামনার বিষয়টিকেও শিরক বলে অভিহিত করেছে এবং তাদেরকে এ মর্মে আহবান জানিয়েছে যে, তারা যেন মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া কাউকে কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক, কিংবা স্বীয় ইচ্ছার প্রতিফলনে ক্ষমতা সম্পন্ন মনে না করে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তার নিকট সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করে।

এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসের এ আয়াতটি কতই না সুস্পষ্ট!

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۔
قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۔ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۔

"আর তারা (মুশরেকরা) আল্লাহ ভিন্ন এমন কতিপয়ের ইবাদত করে, যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে ঃ এরা হল আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ তাআলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা আছে বলে তিনি (নিজেও) জানেন না, না আসমানে, না জমিনে ; তিনি তাদের শিরকী কার্যকলাপ হতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে ।" –সূরা ইউনুস ঃ ১৮

সূরা যুমারে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ.

"স্মরণ রেখো! খাটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যে। আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য শরীক স্থির করে রেখেছে, (এবং বলে) আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এই জন্যে করছি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ট বানিয়ে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের পারস্পারিক বিভেদসমূহের মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে সুপথে আনেন না, যারা মিথ্যাবাদী (ও) কাফের।" –সূরা যুমার ঃ ৩ ।

সুতরাং, মুশরেকরা এ আকীদা বিশ্বাস রাখত যে, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সকল কাজে ক্ষমতা প্রয়োগকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তারা ফেরেশতা, নেককার বান্দা বা বুযুর্গদের নামে মূর্তি তৈরী করত। তারা একথা জানত যে, এ সব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরী, সেগুলোর জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ ও অনুভূতি কিছুই নেই। তবুও তাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, এগুলোর উপাসনা করলে, ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করলে প্রকৃতপক্ষে এ সব মূর্তিগুলো যে সব ফেরেশতা, নেককার বান্দা ও বুযুর্গের নামে তৈরী, তারাই আমাদের প্রতি খুশী হবেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার ঘনিষ্ট বানিয়ে দেবেন, আমাদের সুপারিশকারী হবেন, আমাদের যরূরতসমূহ আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করে মঞ্জুর করিয়ে দেবেন।

তারা আল্লাহ তাআলার নিয়ম নীতিকে দুনিয়ার রাজা বাদশার নিয়ম নীতির মত ভেবেছে। দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের ঘনিষ্ট লোকেরা যেমন কারো প্রতি খুশী হলে বাদশার নিকট সুপারিশ করে তাকেও বাদশার ঘনিষ্ট বানিয়ে দেয়। কাফেররা মনে করেছিল যে, ফেরেশতারাও রাজ দরবারের মত যার ব্যাপারে ইচ্ছা সুপারিশ করতে পারবে এবং মঞ্জুর করতে পারবে।

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে (অন্যান্য বহু আয়াতের মত) স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ তাআলা নিজ ও মাখলূকের মাঝখানে কাউকে কোন প্রকার সুপারিশকারী, মধ্যস্ততাকারীই রাখেননি। অতএব তাদের ইবাদত করার অনুমতির তো কোন প্রশ্নই আসে না!? উপরন্তু এরূপ আকীদা পোষণ করা এবং এরূপ আমল করা সম্পূর্ণ শিরক ও কুফরী। এ নিয়ে বিবাদকারীদের ফয়সালা আখেরাতে হবে, মানে মুশরেকরা চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে যাবে।

আর সুপারিশকারী বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যে সব ফেরেশতা বা বুযুর্গদের ইবাদত করা হত বা হচ্ছে তারা ইবাদতকারীদের এ সকল কার্যকলাপ হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত এবং আল্লাহ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় সকল কাজের প্রতি তারা ঘৃণাপোষণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ ، وَلَٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا.

"আর যে দিন আল্লাহ সে সব লোকদেরকে (মুশরেকদেরকে) এবং আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদত করত–তাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে ঃ সুবহানাল্লাহ! আমাদের কি সাধ্য ছিল আপনাকে ব্যতীত অন্য কাউকে কার্যসম্পাদনকারী গ্রহণ করার! বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের বাপদাদাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন যে, (আপনার শোকরগুজার না হয়ে) আপনার স্মরণই ভুলে গিয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।"

–সূরা ফুরকান ঃ ১৭–১৮

সূরা সাবা'য় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ، أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.

'আর সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অত:পর ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ এরা কি তোমাদের উপাসনা করত ? তারা বলবে, আপনি (শিরক হতে) পবিত্র, আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়,

বরং তারা জিনদের উপাসনা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। অতএব, আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি যালেমদেরকে বলবঃ তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।'–সূরা সাবা ঃ ৪০–৪২

মুশরেকদের ইবাদত কি ছিল এবং তাদের মাবূদ কারা ছিল?

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ঐ সকল সত্তা কারা, যাদের ব্যাপারে মুশরেকরা এরূপ আকীদা বিশ্বাস রাখত ? যাদেরকে হাজত পুরণকারী এবং সমস্যা সমাধানকারী মনে করে তাদের নিকট দুআ এবং তাদের ইবাদত করত ?

অনেকেই মনে করে যে, মুশরেকরা এ সকল আচরণ পাথরের মূর্তির সাথেই করে থাকে। কিন্তু বাস্তব কথা হল পাথরের এ সব মূর্তি তাদের আসল মাবূদ নয়। বরং মুশরেকদের এ শিরকী বিশ্বাস এবং শিরকী আমল ঐ সমস্ত বুযুর্গ বা তাদের রূহানী সত্তার সাথে ছিল, যাদের নামানুসারে এ পাথরসমূহের নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের সূরা নূহে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির এ কয়েকটি প্রতিমার নাম এসেছে ঃ ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর। এ ব্যাপারে 'সহীহ বুখারী'-তে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মূলতঃ এ কয়েকটি নাম কয়েকজন বুযুর্গের, যারা বাস্তবেই বুযুর্গ এবং আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তাদের ইন্তেকালের কিছু দিন পর ভক্তরা স্মারক হিসেবে তাদের ভাস্কর্য তৈরী করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে থাকে। কিন্তু শয়তান পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের ইবাদতে লাগিয়ে দেয়।

এমনিভাবে আরব মুশরেকরা যে সব প্রতিমার ইবাদত করত, সে সব প্রতিমাও কয়েকজন পুণ্যাত্মা সত্তার আলামত ও স্মারক মনে করা হত এবং মূলতঃ ইবাদত ঐ সব পুণ্যাত্মা সত্তাদের করা হত। তাদেরকে হাজত পুরণকারী এবং সমস্যা সমাধানকারী মনে করা হত। যেরূপ হিন্দু ধর্মে কৃষ্ণজী বা রামচন্দ্রজীর মূর্তির পূজা করা হয়। মূলতঃ পূজা ঐ প্রতিমার করা হয় না, বরং কৃষ্ণজী এবং রামচন্দ্রজীর সত্তার করা হয়। আর প্রতিমাগুলোকে তাদের ধ্যান ও পূজার মাধ্যম বানানো হয়। এতটুকু সম্পর্কের কারণেই তাদের শ্রদ্ধা সম্মান জানানো হয়।

যেমন বহু নামধারী মূর্খ মুসলমান তাযিয়া মিছিলে নযর মান্নত প্রদান করে, মাথা অবনত করে প্রণাম জানায় এবং নিজেদের আশা, আকাংখা পূরণের ব্যাপারে একে মাধ্যম বানায়। তার সাথে সেরূপ আচরণ করে যেরূপ মূর্তিপূজারীরা মূর্তির সাথে করে। কিন্তু তাযিয়াদার বা তাযিয়াপূজারীরা মূলতঃ কাগজ ও বাঁশের তৈরী তাযিয়ার মধ্যে কোন গায়েবী কুদরত রয়েছে বলে মনে করে না, বরং এ সব কিছুই

ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর নামে পালন করে থাকে। আর তাযিয়াকে তার নিদর্শন এবং স্মৃতি মনে করে থাকে। তাই এগুলোও সম্পূর্ণ মূর্তিপূজারীদের কার্যকলাপ।

অবশ্য নেহায়েত বোকা প্রকৃতির কতিপয় এমন লোকের কথাও শুনা যায়, যারা বাঁশ ও কাগজের তৈরী তাযিয়াকেই সব কিছু মনে করে। এরূপভাবে আরব মুশরেকদের মাঝেও কতিপয় নির্বোধ এমন ছিল, যারা নিজ হাতে তৈরী পাথরের মূর্তিগুলোকেই হাজত পুরণকারী মনে করত। এই জন্যে সরাসরি তাদেরই ইবাদত করত। কুরআন মাজীদে এরূপ লোকদের ব্যাপারেই ইরশাদ হয়েছে ঃ أتعبدون ما تنحتون. 'তোমরা কি পাথরের তৈরী সে সব মূর্তিকে মাবূদ মেনেছ যাদেরকে তোমরা নিজ হাতে বানিয়েছ।' –সূরা সাফফাত ঃ ৯৫

বস্তুত, এ ধরণের আয়াতসমূহ সেসব নির্বোধ প্রকৃতির মুশরেকদের সম্পর্কে যারা পাথরের মূর্তিতেই বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করত, তাদের কাছে নিজেদের যরূরত প্রার্থনা করত এবং তাদের ইবাদত করত। আর যারা এ পর্যায়ের নির্বোধ ছিল না, বরং তারা কল্পিত কতিপয় পুণ্যাত্মাদের সত্তাকে লাভ ক্ষতির মালিক এবং যরূরত পুরণে সক্ষম মনে করত এবং বাস্তবেও তাদেরই ইবাদত করত। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদেরই মত আমার বান্দা।' –সূরা আরাফ ঃ ১৯৪

সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ হয়েছে ঃ তারা নিজেরাই আমার মুখাপেক্ষি, আমার দরবারের ভিখারী, নিজ প্রয়োজনাদি আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমার নৈকট্য কামনা করে এবং এ পথে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, আমার করুণা চায় এবং আমার আযাব থেকে ভীতসন্ত্রস্ত। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ.

"যাদেরকে তারা ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্যে মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৭

সুতরাং, এ প্রকার আয়াতসমূহে সে সব মুশরেকের শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা প্রতিমাসমূহকে আসল মাবূদ এবং হাজতপুরণকারী মনে করত না, বরং কতিপয় নৈকট্যশীল পুণ্যাত্মাদেরকে এরূপ মনে করত। আর প্রতিমাগুলোকে তাদের প্রতিনিধি, নিদর্শন বা প্রকাশস্থল মনে করত।

আফসোস! নামধারী বহু মূর্খ তাযিয়াধার এবং কবরপূজারী মুসলমানের অবস্থাও আজ একই রকম! তারাও বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে এ প্রকারের আকীদা বিশ্বাস রাখে। আর এ ভিত্তিতেই তাদের কবর এবং তাযিয়ার সামনে মাথা ঝুকিয়ে রাখে এবং নযর মান্নত করে ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষণা

সূরা আনআমের শেষ রুকুতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

"আপনি বলুন ঃ আমার নামায, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।"– সূরা আনআম ঃ ১৬২-১৬৩

এ আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঘোষণাদান করা হয়েছে-"আমার নামায, আমার সকল ইবাদত শুধু আল্লাহরই জন্যে। এমনিভাবে আমার জীবন-মরণ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যে। আমাকে এ নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে যে, নামায ও ইবাদতের ন্যায় আমার জীবন মরণও আল্লাহর জন্যে। আমি যা কিছু করব শুধু তারই জন্যে করব এবং তারই নির্দেশ মোতাবেক করব। তারই আনুগত্যে জীবিত থাকব এবং মৃত্যুবরণ করব এবং স্বীয় প্রভুর এ নির্দেশের সামনে আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যশীল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁরই দাসত্ব ও ইবাদত বন্দেগীতে কাটানোর সিদ্ধান্ত করেছি।"

কুরআন-মাজীদে তাওহীদের এ সর্বশেষ পরিপূরক পাঠ উপস্থাপনের জন্যে রাসূলের ভাষায় নিজের ব্যাপারে ঘোষণার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। এতে এ রহস্য ও হেকমত লুকায়িত থেকে থাকবে যে, যখন একজন পয়গাম্বর নিজের ব্যাপারে আপন ভাষায় জগতবাসীকে বলছেন ঃ আমার সকল কামনা-বাসনা, ইবাদত-বন্দেগী সব কিছু আল্লাহর জন্যে। আমার জীবন মরণ তাঁরই তরে এবং আমি সর্বপ্রথম তার সকল নির্দেশের সামনে মস্তক অবনতকারী অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগীর গুণাবলীতেও সর্বাগ্রে। তখন অন্যদের জন্যে উক্ত পয়গাম্বরকে আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করার সামান্যতম অবকাশ থাকে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ ও নবী-রাসূলদের সরদার। তাই তাওহীদের ব্যাপারে উম্মতের বিরাট ভীতির কারণ ছিল যে, তার অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা ও মু'জিযা দৃষ্টে দিশেহারা হয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় তাঁকেও খোদা বা খোদার শরীক মনে করে বসবে। সে জন্যে কুরআন কারীমে রাসূলের দাসত্বের কথা, মানুষ হওয়ার কথা এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রার্থনা ও কাকুতি মিনতির বিষয়াবলীকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলের জন্যে অধিকাংশ স্থানে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাঁরই মুখে উক্ত বিষয়াবলীর ঘোষণাদান করা হয়েছে।

এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ.

"হে রাসূল! আপনি বলুন ঃ আমিও তোমাদের মতই মানুষ। (মা'বূদ নই) আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ এক (আল্লাহ)। অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরেকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ।"–সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا "আপনি বলুন ঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা। আমি একজন মানব, একজন রাসূল বৈ কিছু নয় ?" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৩

কোথাও ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. "আপনি বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার এবং সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন ঃ আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না।" – সূরা জিন ঃ ২১-২২

অন্যত্র নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কোন ভাল–মন্দের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল

অর্জন করে নিতাম। ফলে কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্যে।" – সূরা আরাফ ঃ ১৮৮

ভাববার বিষয় যে, যখন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে এই ঘোষণা করছেন, সেখানে পীর মাশায়েখ সম্পর্কে উপকার সাধন বা অপকার সাধন করার ক্ষমতাবানের আকীদা রাখার অসারতা কত সুস্পষ্ট ! বয়ান করারও প্রয়োজন পড়ে না।

কুরআনে মুশরেকদের কঠোর সমালোচনা

মুশরেক ও শিরকের করুণ পরিণতি হতে কুরআন মাজীদ মানুষদেরকে সতর্ক করেছে এবং ভীতি প্রদর্শন করেছে। শিরক অবলম্বনে যে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, তার কথাও কুরআন মাজীদে রয়েছে। এ সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

সূরা নিসায় উল্লেখ আছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

"নিশ্চয় আল্লাহ(তা'আলা) তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" –সূরা নিসা ১১৬

সূরা মায়িদায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ.

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ (তাআলা)র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম।" – সূরা মায়িদা ঃ ৭২

শিরক অমার্জনীয় অপরাধ এবং প্রত্যেক মুশরেকের জাহান্নামে যাওয়া অনিবার্য। তাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, সাবধান! কখনো কোন মুশরেকের মাগফেরাত, ক্ষমা ও মুক্তির জন্যে দু'আও করো না। আল্লাহ তাআলা সেসব যালেম মুশরেকদের জন্যে ক্ষমার দুআও শুনতে চান না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَلَوْ كَانُوْآ أُولِيْ قُرْبٰى. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

"নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।" – সূরা তাওবা ঃ ১১৩

উক্ত সূরা তাওবার অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ 'নিশ্চয় মুশরেকরা অপবিত্র।' –সূরা তাওবা ঃ ২৮

পূর্বোক্ত সূরার শুরুতেই ঘোষণা দান করা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ.

."নিশ্চয় আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তার রাসূলও।" – সূরা তাওবা ঃ ৩

শিরকের উপর মূলনীতিগত আলোচনার পর শিরকের প্রকারসমূহ (যেসব প্রকারের কথা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি) নিয়ে ভিন্নভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবুও আরো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্যে শিরকের ঐ প্রকারগুলো সর্ম্পকে সামান্য আলোপকপাত করা হল।

শিরকের প্রকারভেদ

পীরকে লাভক্ষতি ও জাগতিক বিষয়াবলীতে ক্ষমতাবান মনে করা

এ আকীদা বিশ্বাস তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং প্রকাশ্য শিরক। তাওহীদে রুবূবিয়্যাত বলা হয় সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সন্তানদানকারী, রোগ হতে আরোগ্য দানকারী, সমগ্র পৃথিবীর বিধানদাতা এবং লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। সেই একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ، هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ. سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে ? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান।" –সূরা রূম ঃ ৪০

সূরা ফাতির-এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ أَرَئَيْتُمْ شُرَكَآئَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ.

"বলুন, তোমরা তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে

দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদের কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা দলীলের উপর কায়েম রয়েছে।" – সূরা ফাতির ঃ ৪০

সূরা ফাতির-এর অন্যত্র রয়েছে ঃ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ.

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিকদান করে ? তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ ?" – সূরা ফাতির ঃ ৩

সূরা আনকাবূত-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"
–সূরা আনকাবূত ঃ ১৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ 'শুনে রেখো! (সব কিছু) তাঁরই সৃষ্টি এবং হুকুমও চলে তাঁর।' –সূরা আরাফ ঃ ৫৪

তিনি যা কিছু করতে ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। তিনি ব্যতীত কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কেউ কারো অস্তিত্ব দান করতে পারে না। আবার কারো অস্তিত্ব হরণও করতে পারে না। কারো জীবন-মরণ অন্য কারো হাতে নয়। তেমনি লাভ-ক্ষতির অধিকারও কেউ রাখে না। অথচ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোকেরা স্বীয় মূর্খতা ও গোমরাহীর কারণে অনেকের ব্যাপারে এই ধারণা করে রেখেছে যে, বিশ্ব পরিচালনায় তাদেরও কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তারা যার খুশি উপকার অপকার সাধন করতে পারে।

কুরআন মাজীদ স্থানে স্থানে এগুলোকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে আখ্যা দিয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, তাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। সবাই সমবেত হয়েও নিজেদের ক্ষমতাবলে কিছুই করতে পারবে না। এমনকি সামান্যতম ছোট একটা মশা বা পিঁপড়াও বানাতে পারবে না। কারো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আবার কারো সাহায্যও করতে পারবে না।

কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নোক্ত বাক্যে বিবৃত হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই জন্যে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্যে কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।" – সূরা তাওবা ঃ ১১৬

সূরা ফাতিরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ.

"তিনি আল্লাহ। তোমাদের পালনকর্তা, রাজত্ব তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর বিচির পাতলা আবরণেরও অধিকারী নয়।" –সূরা ফাতির ঃ ১৩

সূরা হজ্জে আছে ঃ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা কখনোও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও এতদুদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হয়।" –সূরা হজ্জ ঃ ৭৩

সূরা সাবা-এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ.

"বলুন, তোমরা তাদেরকে ডাক, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ছাড়া। তারা আসমান-জমিনের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকও নয়।" –সূরা সাবা ঃ ২২

সূরা যুমার-এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে ? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে ? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।" –সূরা যুমার ঃ ৩৮

সূরা শুরা-এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ

"তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে ? উপরন্তু আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক।" –সূরা শুরা ঃ ৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا. إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

"আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" – সূরা শূরা ঃ ৪৯-৫০

সূরা শুরা-এ হযরত ইবরাহীম আলাইহিমুস সালামের মুখে উচ্চারিত বাণী ঃ

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ. وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন; যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুণর্জীবন দান করবেন। আমি আশা করি, তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।"

– সূরা শুআরা ঃ ৭৮-৮২

যাহোক, আল্লাহ তা'আলা পার্থিব ও বাহ্যিক উপায় উপকরণের উর্ধ্বে কতিপয় বস্তু রেখেছেন। এগুলোর ব্যাপারে তিনি কাউকে ক্ষমতা প্রদান করেননি। তদুপরি কোন সৃষ্টিজীবের পক্ষে তা বাস্তবায়নের আকীদা-বিশ্বাস রাখার অর্থ তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের অস্বীকার করা। আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে না নেওয়া। আর এটা যে একটা সুস্পষ্ট শিরক, তা বলাই বাহুল্য।

আপদ বিপদ ও বালা মুসীবতে পীরসাহেবকে ডাকা, যে সকল কাজ সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার কুদরতে সেগুলোর জন্যেও পীর সাহেবের নিকট দু'আ করা, পীরসাহেবের নামে অযীফা পড়া...

দু'আ ও সাহায্য কামনা করা, যিকির ও ওযীফা পাঠ করা, এগুলো সবই ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই আল্লাহ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। এগুলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে পালন করা সম্পূর্ণ শিরক। পিছনে

১৯৭-১৯৯, ২০৫ পৃষ্ঠায় গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং বাহ্যিক উপায় উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়াবলী অর্জন করতে গিয়ে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা যে শিরক, এ বিষয়টির উপর বহু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো আরেকবার দেখে নিন।

ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ইবাদত হল দ্বীন ও শরীয়তের একটি সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দ। কোন সত্তাকে গায়েবীভাবে লাভক্ষতির ক্ষমতাধর ও হাজত পূরণকারী মনে করে তাকে রাজি খুশি করার জন্যে, তার নৈকট্য অর্জন করার জন্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তিমূলক যে কোন কাজই করা হবে-সেটাই দ্বীনের পরিভাষায় ইবাদত। যেমন দু'আ করা, ডাকা, যিকির ও ওযীফা পাঠ করা, সিজদা করা তাওয়াফ করা, নযর মান্নত করা, কুরবাণী করা ইত্যাদি এবং ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হক, অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কাজেই কোন গাইরুল্লাহর সাথে উপরোক্ত আচরণ করা সরাসরি শিরক বলে গণ্য হবে।

পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মুশরেক সম্প্রদায়ের শিরক এটিই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কতিপয়কে লাভ ক্ষতির ক্ষমতাধর মনে করত এবং তাদের মনতুষ্টির জন্যে ইবাদত প্রকৃতির কার্য সম্পাদন করত। এ শিরকই এমন মহা অপরাধ যা কখনো মার্জনা হওয়ার নয়, যতক্ষণ না বান্দা তওবা করতঃ খাঁটি তাওহীদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে এবং যতক্ষণ না মুখে ও অন্তরে তার সত্যতার স্বীকৃতি দান করবে।

ভাববার বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁরই নিকট কামনা করার, তাঁরই নিকট দু'আ করার জন্যে স্বীয় রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন। আমাদের দু'আ ও কাকুতি-মিনতি কবূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমাদের আবেদন যত বড়ই হোক না কেন, তিনি তা কবূল করতে সক্ষমও বটে। তদুপরি আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবার ছেড়ে তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই হুকুমের গোলাম, তাঁরই মুখাপেক্ষি ব্যক্তিদের দরজায় দরজায় দৌড়াতে থাকি, তাহলে এটা কত বড় বোকামি হবে! নেয়ামতের কত বড় নিমকহারামী হবে! আল্লাহ তাআলার সাথে কত বড় বেআদবী ও গোস্তাখী হবে!

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

'আর তোমাদের পরওয়ারদেগার বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দু'আ কবূল করব। যারা আমার ইবাদত হতে অহংকার করে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' -সূরা মুমিন ঃ ৬০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

'দুআই ইবাদত। অত:পর তিনি তেলাওয়াত করেন ঃ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

'আর যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি। আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন, যখন আমার নিকট আবেদন করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' –সূরা বাকারা ঃ ১৮৬

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.

'কে সে সত্তা–যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে জমিন ব্যবহারের অধিকারী করে থাকেন। আল্লাহর সাথে আর কোন মাবূদ আছে কি ? তোমরা খুব কমই হৃদয়াঙ্গম করে থাক।' –সূরা নামল ঃ ৬২

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মক্কার মূর্তিপূজক মুশরেকদের অবস্থাও এমন ছিল যে, সাধারণ অবস্থায় তো তারা গাইরুল্লাহর (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যদের) নিকট সাহায্য সহযোগিতা কামনা করত। কিন্তু কঠিন মুহূর্তে, বিপদ-আপদে তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য কামনা করত। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে তা উল্লেখ রয়েছে।

পক্ষান্তরে কবর পূজারীদের অবস্থা এমন চরমে পৌছেছে যে, তারা সাধারণ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কামনা করে, কিন্তু কঠিন মুহূর্তে, বড় ধরনের আপদ-বিপদে মাযারে গিয়ে পীরের নিকট কামনা করে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব পীর-মাশায়েখের সমান ক্ষমতাও রাখেন না! (سبحان الله عما يصفون) আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এরূপ ভ্রান্ত আকীদা স্বয়ং মূর্তি পূজারী মুশরেকদেরও ছিল না।

মাযারে শতশত নয়, হাজারো লোককে আপনি দেখবেন, তারা পীর সাহেবের নিকট সন্তান কামনা করছে। অথচ সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হাতে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে না। এ কথাতো সকলেরই জানা যে, পীর সাহেব যত বড়ই হোক না কেন, কোন নবীর চাইতে বড় হতে পারেন না। কোন নবীর কি সন্তান দেওয়ার শক্তি ছিল ? নবীগণ অন্যকে সন্তান দান করবেন তো দূরের কথা, নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্তান কামনা করতেন।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ঘটনা কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে উল্লেখ আছে। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

"সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট হতে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে। যিনি সরদার হবেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন। তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল এবং নবী হবেন। তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা।' বললেন, আল্লাহ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন।" –সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৪০

নির্বাচনের সময় অনেককে দেখা যায় মাযারে গিয়ে পীরের কাছে নির্বাচনের সফলতা চায়, ক্ষমতা, রাজত্ব কামনা করে, অধিক ভোট পাওয়ার আবেদন করে। অথচ ক্ষমতা দেওয়া না দেওয়া সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনিই সকল মানুষের অন্তরের মালিক। তিনি যে দিকে ইচ্ছা লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দেন।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"বলুন, হে আল্লাহ! তুমি সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" –সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

হাদীসে আছে ঃ

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতের মুঠোয় সকল মানুষের অন্তর এক অন্তরের ন্যায়, যেদিক ইচ্ছা সেদিকে তিনি ঘুরিয়ে দেন। –সহীহ মুসলিমঃ ২/৩৩৫, হাদীস ২৬৫৪

যদি নির্বাচিত হয়ে সত্যিকার অর্থে ইসলাম ও মানবতার সেবা করাই উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে নির্বাচিত হওয়ার জন্যে তাদের একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা উচিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবূল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" – সূরা বাকারা ঃ ১৮৬

যাহোক, কুরআন-হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দু'আ একটি ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্ধারিত। তিনিই একমাত্র মা'বূদ এবং ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। গাইরুল্লাহর নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ করা তাকে মা'বূদ বানানো ছাড়া আর কিছুই না।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ

كل من ذهب إلى بلدة أجمير أو إلى قبر سالار مسعود أو ماضاهاه، لأجل حاجة يطلبها، فإنه أثم إثما أكبر من القتل والزنا، ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات، أو مثل من كان يدعو اللات والعزى.

"যারা আজমীর, সায়্যিদ সালার মাসউদ প্রমূখ বুযুর্গদের মাযারে গিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্য লাভের জন্যে প্রার্থনা করে, তারা হত্যা ও ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য

অপরাধ করে। তাদের উপমা ঐ মুশরেকদের ন্যায়, যারা স্বহস্তে বানানো মূর্তির পূজা করে এবং লাত, উযযাকে (প্রতিমার নাম) মাকসূদ হাছিলের জন্যে ডাকে।"

–তাফহীমাতে ইলাহিয়া ঃ ২/৪৯, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ঃ ৩/৩

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

عليك بتقوى الله وطاعته، ولاتخف أحدا، ولاترجه، وكِلِ الحوائج كلها إلى الله عز جل، واطلبه منه، ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل، ولاتعتمد إلا عليه سبحانه، التوحيد، التوحيد، التوحيد.

"আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং তাঁর ইবাদত করা তোমার উপর অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ভয় করো না এবং তাকে ছাড়া কারো নিকট আশা পোষণ করো না। সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ কর এবং তাঁরই কাছে প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো উপর ভরসা রেখো না। একমাত্র সত্তা যিনি সকল ত্রুটিমুক্ত। তাঁরই উপর আস্থা রেখো। খবরদার! তাওহীদ! তাওহীদ! তাওহীদ ! (অর্থাৎ একমাত্র সে একক সত্তাকে মেনে চল। একক সত্তার উপর ভরসা কর এবং সে একক সত্তার সাথেই সকল আশা-আকাংখা পোষণ কর)।" –মালফূযাত–ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ঃ ৩/৫

'আল-বাহরুর রায়িক' সহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله كفر.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত (অন্য কেউ, যেমন) মৃত ব্যক্তি মানুষের কার্যাবলীতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, এরূপ আকীদা পোষণ করা কুফরী।

–আল বাহরুর রায়িক ঃ ২/২৯৮

'তাওশীহ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ

منهم الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء وتعلم الحوائج، وذلك شرك قبيح وجهل صريح، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون.

"কতিপয় লোক আপদ-বিপদ ও প্রয়োজনে নবী-ওলীদেরকে ডাকে। তাঁদের কাছে দু'আ করে। ওদের বিশ্বাস যে, তাঁদের রূহ উপস্থিত আছে, মানুষের দু'আ শুনছে এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত। অথচ এ আকীদা মারাত্মক শিরক এবং প্রকাশ্য মূর্খতা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি থেকে অধিক গোমরাহ কে ? যে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার আহবানে সাড়া দেবে না। তারা তাদের আহবান-দু'আ হতে গাফেল।"
—আত তালীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী

"আল কায়িদাতুল জালীলা" কিতাবে আছে ঃ

لا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني، وانصرني، وادفع عني، وأنا في حبك، ونحو ذلك، بل كان هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.

"অনুপস্থিত বা মৃত কোন বুযুর্গের নিকট সাহায্য কামনা করা কারো জন্যে জায়েয নেই। যেমন বলল, হে অমুক সাহেব ! আমার সাহায্য সহযোগিতা করুন! আমার কষ্ট দূর করুন!আমি আপনার প্রেমিক, ইত্যাদি। এ সবই শিরক, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। দ্বীন ইসলামের অকাট্য ও অলংঘনীয় প্রমাণাদির মাধ্যমে এগুলো হারাম হওয়া সর্ববিদিত।" –আল কায়িদাতুল জালীলা ফিত্তাওয়াসসুলে ওয়াল ওয়াসীলা ঃ ১২৮–সামায়ে মাওতা ঃ ৩৬৪–৩৬৫

চিন্তা করে দেখুন! আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের উপর সালাম ও দরূদ পাঠ করার জোর তাকীদ শরীয়তে রয়েছে। নবীগণ হলেন সৃষ্টির সেরা এবং সম্মানিত ব্যক্তি। যখন তাঁদের জন্যেও দুরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের জন্যেও রহমত ও শান্তির দু'আ করার কথা বলা হয়েছে–এতে বুঝা গেল রহমত ও শান্তি লাভের জন্যে তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। রহমত ও শান্তি তাঁদের নিজেদের হাতে নয়। যখন তাঁদের হাতেই নেই, তখন স্পষ্টতঃ অন্য সৃষ্টিজীবের হাতেও নেই। কেননা, সকল সৃষ্টিজীবের মধ্যে তাঁদের মর্যাদাই সবার উপরে। সুতরাং, যদি শুধু দুরূদ ও সালামের তত্ত্ব নিয়ে ভাবা হয়, তাহলেও শিরকের অসারতা এবং তা পরিহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্যে যথেষ্ট হবে।

শিরকের মূল ভিত্তি এটি ছাড়া আর কি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো হাতে কল্যাণ, শান্তি ও রহমত মনে করা হয় আর এর খণ্ডন দুরূদ শরীফের মধ্যেই স্পষ্ট বিদ্যমান আছে।

দুরূদ ও সালামের বিধানই আমাদেরকে নবী-রাসূলগণের জন্যে দু'আ পাঠকারী বানিয়েছে। আর যে ব্যক্তি নবীগণের জন্যে দু'আ পাঠকারী সে কোন সৃষ্টিজীবের নিকট দু'আ করতে পারে না অথবা কোন সৃষ্টির পূজারী হতে পারে না।[১]

এ ব্যাপারে একটু ভাবা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা থেকে প্রত্যেহ বার বার স্বীকারোক্তি নিচ্ছেন, তোমরা বল ঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। অন্য কারো কাছে নয়।"

আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা দৈনিক কমপক্ষে বত্রিশবার এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করছি। তাছাড়া এ ঘোষণা আমাদের ঈমান-ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ধারাও বটে। অথচ পীর-মাশায়েখের নিকট দু'আ করা উক্ত প্রতিশ্রুতি, স্বীকৃতি ও মৌলিক ধারার স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন!

কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিয়েছিল কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীকে সালাম করতে, তাঁদের মাগফেরাত ও ক্ষমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে। আর নামধারী মুসলমানরা সে জায়গায় এ শিরক উদ্ভাবন করেছে, তারা কবরবাসীদের জন্যে দু'আ করার পরিবর্তে তাদেরই নিকট দু'আ করতে শুরু করেছে।

হিন্দু ও তার দোসর জাতিরা মূর্তিপূজা করার কারণে মুশরেক হল, মুসলমানরা কি কবর পূজা করার পরও একত্ববাদী থাকবে ? এ ব্যাপারে জনৈক উর্দূ ভাষী কবি বলেন ঃ

کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

---

১. –মা'আরিফুল হাদীস ঃ ৩/২৯৬

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کو چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پر جاجاکے نذریں چڑھائیں

شہیدوں سے جاجاکے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

মূর্তিপূজা অগ্নিপূজা অন্যে যখন করে ভাই,
কাফের বলে ডাকতে তাকে কোন কিছুই বাধা নাই।
প্রভু পুত্র বললে কেহ নিত্য বলি কাফের সে তো,
তারকাকে খোদা বলে ডাকলে কাফের হবে সেও।
কিন্তু মুমিনগণের সুযোগ অনেক বেশী আছে,
মনের সুখে যাকে তাকে পূজা জায়েয আছে,
নবীকে কখনো বসায় খোদার আসনে,
ইমামের মর্যাদা বসায় নবীর উপরে।
মাযারে মাযারে গিয়ে নযর নিয়ায করে,
শহীদের কবরে গিয়ে হাজত তলব করে,
এতে তাদের ঈমানের ক্ষতি নাহি হয়,
তাওহীদের বাণী তাতে নষ্ট নাহি হয়।

পীরের নামে মান্নত

মান্নত করা ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্যে সুনির্ধারিত। কাজেই কোন সৃষ্টিজীবের জন্যে মান্নত করা শিরক ফিল ইবাদত (ইবাদত সম্পর্কীয় শিরক) বলে গণ্য হবে। তাছাড়া সচরাচর মান্নত মানা হয় কোন আপদ-বিপদ দূর হওয়ার জন্যে অথবা কোন উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যে। কাজেই মান্নত ঐ সত্তার সাথে নির্দিষ্ট হবে–যিনি আপদ-বিপদ দূর করতে পারেন এবং প্রয়োজন মিটাতে পারেন।

সেই সত্তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্যে মান্নতকারী একমাত্র তাকেই বা তাকেও মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা ও কার্যসম্পাদনকারী মনে করে থাকে। এটা শিরক ফিররুবূবিয়্যাত।

আজকাল মাযার ও পীরদের জন্যে যে মান্নত করা হয়–এ ব্যাপারে ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া শাস্ত্রবিদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

...فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه: منها أنه نذر للمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفر.

"নিম্নোক্ত কারণে এ ধরনের মান্নত করা ঐকমত্যে বাতিল।

এক ঃ এ মান্নত সৃষ্টিজীবের নামে হচ্ছে, আর কোন সৃষ্টিজীবের নামে মান্নত হতে পারে না। কেননা, মান্নত করা একটি ইবাদত। আর ইবাদত কোন সৃষ্টিজীবের জন্যে হতে পারে না।

দুই ঃ যার জন্যে মান্নত করা হচ্ছে, তিনি হলেন মৃত। আর মৃত ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক হতে পারে না।

তিন ঃ মান্নতকারীর ধারণা যে, মৃত ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়াবলীতে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাখে। তার এ আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুফরী।"

–আল বাহরুর রায়িক ঃ ২/২৯৮, ফাতাওয়া শামী ঃ ২/৪৩৯–৪৪০

সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরকারক আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ "রূহুল মা'আনী" তে বলেন ঃ

وفي قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا .... إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى، حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى، وينذرون لهم النذور، والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى، وإنما ننذر لله عز وجل، ونجعل ثوابه للولي، ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ودعواهم الثانية لا بأس بها لولم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم، أو نحو ذلك، والظاهر من حالهم الطلب، ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل: انذروا لله تعالى، واجعلوا ثوابه لوالديكم، فإنهم

أحوج من أولئك الأولياء، لم يفعلوا. ورأيت كثيرا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء، ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعا في قبورهم...

উক্ত উক্তির সারসংক্ষেপ হল ঃ

"এ আয়াত إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا এ– এ ওলীদের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের নিন্দার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলা হতে বিমুখ হয়ে বালা মুসীবতে তাঁদের (ওলীদের) কাছে সাহায্য চায়, তাদের জন্যে মান্নত করে।

এদের জ্ঞানীরা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওলীগণ আমাদের মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র। আমরা মান্নত তো আল্লাহ তা'আলার নামেই করে থাকি, তবে তার সাওয়াব ওলীদের জন্যে উৎসর্গ করি।

এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই যে, তারা প্রথম দাবীতে (ওলীগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জন্যে মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র) মূর্তিপূজারীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা বলে আমরা তো মূর্তিপূজা এ জন্যে করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করেন।

তাদের দ্বিতীয় দাবী 'আমরা মান্নত আল্লাহ তা'আলার জন্যেই করে থাকি, আর সাওয়াব ওলীদের জন্যে উৎসর্গ করি'–এর মাঝে কোন অসুবিধা নেই। যদি সে মান্নত দ্বারা ওলীদের নিকট রোগীর সুস্থতা কামনা অথবা পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসা বা এ ধরনের কোন কিছু প্রার্থনার নিয়ত না থাকে। কিন্তু সত্য কথা হল তাদের এ দাবীটিই অসার। কেননা, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত প্রকার মান্নত দ্বারা তারা সুস্থতা ও পলাতক ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনসহ অন্যান্য বিষয়াবলী কামনা করে থাকে।

এ কথা দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদি তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে মান্নত কর। আর সওয়াব পিতা-মাতার জন্যে উৎসর্গ কর। কেননা, ওলীদের চাইতে তারাই অধিক মুখাপেক্ষী। তাহলে দেখা যাবে তারা এতে রাজী নয়।

আমি (আল্লামা আলূসী) তাদের অনেককেই ওলীদের কবরের পাথরে সিজদা করতে দেখেছি। তাদের অনেকে (বর্তমান সকল কবরপূজারীই) ওলীদের ব্যাপারে এ আকীদা রাখে যে, তারা কবর থেকেই বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের অধিকার রাখে।"

– রুহুল মা'আনী ঃ ১৭/২১২–২১৩

পীর ও মাযারস্থিতদের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে পশু জবাই করা

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে এবং নৈকট্য অর্জন করার জন্যে পশু জবাই করা একটি ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট। প্রাণ মাত্রই প্রাণ সৃষ্টিকারীর জন্যেই উৎসর্গ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

"আপনি বলুন ঃ আমার নামায, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।"–সূরা আন্‌আম ঃ ১৬২–১৬৩

সূরা কাওসারে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. "অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবাণী করুন।" –সূরা কাওসার ঃ ২

সুতরাং, নামাযের ন্যায় নৈকট্য অর্জনের নিয়তে পশু জবাই করা আল্লাহ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো জন্যে (গাইরুল্লাহর জন্যে) নামায পড়া শিরক, ঠিক তেমনি গাইরুল্লাহর জন্যে পশু জবাই করা এবং প্রাণ উৎসর্গ করা নিঃসন্দেহে শিরক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لعن الله من ذبح لغير الله

"ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত, যে গাইরুল্লাহ্‌র নামে (আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো নামে) জবাই করে।"

–সহীহ মুসলিম ঃ ২/১৬০, হাদীস ১৯৭৮, সুনানে নাসায়ী ঃ ২/১৮৪ হাদীস ৪৪২২

যাহোক, পশু জবাই করা, প্রাণ উৎসর্গ করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন কারো জন্যে জবাই করল সে শিরক করল।

তাফসীরে নীশাপূরীতে আছে ঃ

قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذلك التقرب إلى غير الله صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد.

"উলামায়ে কেরাম বলেন, যে মুসলমান আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কারো নৈকট্য অর্জনের জন্যে পশু জবাই করবে সে মুরতাদ। আর তার জবাইকৃত পশু মুরতাদের জবাইকৃত পশুর ন্যায় হারাম বলে গণ্য হবে।"–ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া ঃ ১১৫

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ.

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যে সব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্যনির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়, এসব গোনাহ্র কাজ।" – সূরা মায়িদা ঃ ৩

উক্ত আয়াতাংশ (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) দ্বারা যা হারাম করা হয়েছে, তার দ্বারা সে জন্তুই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত, যাতে সে সন্তুষ্ট হয় এবং কাজ সামাধা করে দেয়।[১]

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) উক্ত মাসআলাটির সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর আলোচনার সার সংক্ষেপ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন ঃ

"وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ অর্থাৎ সে জন্তুও হারাম বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নামে নির্ধারিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কোন প্রতিমা হোক বা দুষ্ট রূহ, যার নামে পশু বলি দেওয়া হয় অথবা জিনের নামে জবাই করা হোক, যে জিন রাস্তা বা কোন স্থান দখল করে আছে, কোন প্রাণী উৎসর্গ করা ব্যতীত এলাকাবাসী ওদের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকতে পারে না (তাদের শিরকী ধারণা মোতাবেক) অথবা গাইরুল্লাহ কোন পীর, পয়গাম্বরই হোক, যাদের নামে উক্ত পদ্ধতিতে (আপদ-বিপদ দূর হওয়ার কাজ উদ্ধারের জন্যে) জন্তু উৎসর্গ করা হয়। এ সবই হারাম।

হাদীস শরীফে আছে ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে জবাই দিল সে অভিশপ্ত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নৈকট্য অর্জন করার জন্যে তার নামে জবাই করল, তার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অভিসম্পাত। জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হোক অথবা নাই পড়া হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না, হারামই থাকবে। যখন এ জন্তু একজনের নামে ঘোষণা হয়ে গেল, সেখানে জবাই

১. –বয়ানুল কুরআন ঃ ১/৯৭

করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়াতে কোন লাভ হবে না। কেননা, সে পশুটি অন্যের নামে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে মৃত জন্তুর চাইতেও অধিক অপবিত্রতা বিস্তার লাভ করেছে। কেননা, মৃত জন্তুর (মধ্যে খারাপ এতটুকুই যে) প্রাণ পাখি উড়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া হয়নি (তবে গাইরুল্লাহর নামও নেওয়া হয়নি)। অথচ প্রথমোক্ত অবস্থায় গাইরুল্লাহর নামেই নির্ধারিত করার পর জবাই করা হয়েছে যা সম্পূর্ণই শিরক। যখন তার মাঝে শিরকের অপবিত্রতা বিস্তার লাভ করেছে তখন আর বিসমিল্লাহ পড়ার দ্বারা তা হালালে পরিণত হবে না।

এ মাসআলার মূলতত্ত্ব হল কোন প্রাণ প্রাণদানকারী ব্যতীত কারো জন্যে কুরবাণী করা বৈধ নয়.।

এমনিভাবে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও অন্যান্য সম্পদ যদিও আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন কারো নৈকট্য অর্জনের জন্যে দেওয়া হারাম ও শিরক, তবে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছায় তা সদকা করতঃ সাওয়াব অন্যকে পৌছানো ঠিক আছে। কেননা, নিজ আমলের সাওয়াব অন্যকে দিয়ে দেওয়া জায়েয। যেরূপ ভাবে নিজ সম্পদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে দান করা জায়েয। কিন্তু জীবজন্তু ও পশুপাখির জান কারো মালিকানাধীন নয়, যা সে অন্যকে দান করতে পারবে। কাজেই এখানে ঈসালে সাওয়াবের বাহানা চলবে না।

কতক মূর্খ জাহেল এ মাসআলা বুঝতে ভুল করে এবং বলে থাকে, গোশত রান্না করে মৃত ব্যক্তির নামে অর্থাৎ তাকে সাওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে দিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। আর মৃত (ওলী ও বুযুর্গ) ব্যক্তির নামে পশু জবাই কালে আমাদেরও নিয়ত তাই থাকে। এ প্রকৃতির মানুষকে বুঝানোর জন্যে একটি পয়েন্টই যথেষ্ট । তা হল, যে ব্যক্তি পশু মান্নত করতে চাচ্ছে যদি তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয় 'তোমরা এ পরিমাণ গোশত ক্রয় কর এবং তা রান্না করে (কোন এলাকার) গরীবদেরকে দিয়ে দাও' (সাওয়াব পৌছানোর জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট) যদি তারা এ পরামর্শ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়, তাহলে তাদের দাবী ঠিক আছে। অন্যথায় এ কথাই নিশ্চিত যে, এ ধরনের মান্নতে নিয়তই থাকে গাইরুল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। আর একেই বলে শিরক।"[১]

শাহ সাহেব আরো বলেন, "গাইরুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়ত অন্তরে লুকিয়ে রেখে শুধু মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম জপা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়।

১. —ফাতাওয়া আযীযিয়া ঃ ৫৩৫-৫৩৬, ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দে তাওযীহিল বয়ান ঃ ২১১-২১৫, ২৩৬-২৩৮

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া তখনই কার্যকরী ও উপকারী হবে, যখন গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা অন্তর থেকে বের করে দেবে এবং বলবে, আমি উক্ত গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করেছি।"[১]

হাদীস শরীফে আছে ঃ

دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحد: قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه، فدخل الجنة. رواه أحمد في «كتاب الزهد»: ٨٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم ٧٣٤٣، و إسناده صالح.

"এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আরেক ব্যক্তি একটি মাছির কারণেই দোযখে প্রবেশ করেছে। উপস্থিত সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব হল। তিনি ইরশাদ করলেন, দু'জন পথিক এমন এক জাতির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের ছিল একটি মূর্তি। মূর্তির নামে কোন কুরবাণী প্রদান করা ব্যতীত কেউ খালি হাতে সেখান দিয়ে যেতে পারত না।

তাদের প্রথা অনুযায়ী তারা একজনকে বলল, তুমি কোন কুরবাণী দাও। সে উত্তরে বলল, 'আমার নিকট কুরবাণী দেওয়ার মত কিছুই নেই।' তারা বলল-'সামান্য মাছি হলেও কুরবাণী দাও।' সে তাদের কথা মত একটি মাছি কুরবাণী দিলে তারা তার পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। এ কারণে উক্ত ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পথিককে তারা কুরবাণী করতে বললে সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো জন্যে সামান্য কিছুও কুরবাণী দেব না'। এ কথা শুনে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করল।"

–কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ (রহঃ) ঃ ৮৪, শুআবুল ঈমান ঃ হাদীস ৭৩৪৩

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। শিরক হতে বাঁচিয়ে তাওহীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন!

---

১. –ফাতাওয়া আযীযিয়া ঃ ৫৩৭

পীর সাহেবের কবর ও মাযারে বার্ষিক ঈদ উদযাপন করা। হজ্বের ন্যায় পশু সাথে নিয়ে সেখানে সফর করা। কা'বা শরীফের ন্যায় তার কবর তাওয়াফ করা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন ঃ

لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود، قال ابن الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد....، كما في «عون المعبود» ٦:٢٤.

"তোমরা স্বীয় ঘরকে কবর বানিয়ো না। (অর্থাৎ কবরের ন্যায় ইবাদত-নামায, তেলাওয়াত ও যিকির ইত্যাদি বিহীন রেখো না) এবং আমার কবরে উৎসব করো না। (অর্থাৎ বার্ষিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন আসরের আয়োজন করো না) তবে হ্যাঁ, আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে (আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা পৌঁছিয়ে থাকেন)।" – সুনানে আবূ দাউদ ঃ হাদীস ২০৪০

এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ রওযা মুবারকে উৎসব পালন করতে বারণ করেছেন। তাহলে অন্য কে আর এমন আছে, যার কবরে তা বৈধ হবে?

আল্লামা মুনাভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন ঃ

يؤخذ منه أن اجتماع العامة في أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة، ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ، ويأكلون ويشربون، وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا، وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك، وإنكاره عليه هو وإبطاله. نقله في «عون المعبود» ٦:٢٣.

"এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ মানুষ যারা বছরের কোন নির্দিষ্ট মাসে বা দিনে (উরসের নামে) ওলীদের মাযারে একত্রিত হয় এবং বলে, আজ পীর সাহেবের জন্ম বার্ষিকী (বা মৃত্যু বার্ষিকী), সেখানে তারা পানাহারেরও আয়োজন করে, আবার নাচ-গানেরও ব্যবস্থা করে থাকে, এ সবগুলোই শরীয়ত পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। এ সব কাজ প্রশাসনের প্রতিরোধ করা জরুরী।" - আওনুল মা'বূদ ঃ ৬/২৩

উরসের সূরতেহাল যদি তাই হত যা আল্লামা মুনাভী (রহঃ) তুলে ধরেছেন, তাহলে বিষয়টি নাজায়েয পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু উরসের হাল চিত্র অনেক

ভিন্নতর। কা'বা শরীফের হজ্জের ন্যায় মাযারের হজ্জের অপর নামই হচ্ছে বর্তমানের উরস। এ উরস সম্পর্কে একটু ভাবা উচিত।

কুরআন-হাদীসে হজ্জের মূলতত্ত্ব এবং তার আদায় পদ্ধতি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্মানের জন্যে কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন-কা'বা, আরাফা, মুযদালেফা, মিনা ও হারাম শরীফ ইত্যাদি। লোকদেরকে উল্লেখিত স্থানসমূহে যিয়ারতের জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাই দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্থল, পানি ও আকাশ পথের বিভিন্ন বাহনে সফর করে লোকজন এ পবিত্র স্থানগুলোর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হয়। তারা মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সফরের কষ্ট সহ্য করে সেলাই বিহীন এক বিশেষ পোশাকে সেখানে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁরই নামে কুরবাণী করে, মান্নত আদায় করে, কা'বা শরীফের তাওয়াফ করে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাকবীল (চুমো খাওয়া), ইলতিযাম (জড়িয়ে ধরা) এবং সাঈ তথা দৌড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথ পালন করে। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিভিন্ন প্রয়োজন কামনা করে এবং তার শাহী দরবারে দু'আ করে।

এ কাজগুলোর সমষ্টিকেই শরীয়তে হজ্জ বলা হয়। এ হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই এক ও অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। এ কাজগুলোই যদি গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ভিন্ন কারোর) জন্যে করা হয়, তাহলে এটা শিরক হবে এবং সে ব্যক্তি হবে মুশরেক।

যদি নিরপেক্ষ ও ইনসাফের দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আজকাল মাযারগুলোতে সাধারণতঃ উরসের নামে যা যা হচ্ছে, তা মূলতঃ হজ্জের কাজগুলোই করা হচ্ছে।

মাযারের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ সফর করা হয়। হজ্জের হাদীর ন্যায় তারা সাথে পশু নিয়ে যায়। সেখানকার বিশেষ স্থান ও কবরগুলো তাওয়াফ করা হয়, কবরে সিজদা করা হয়। কবরের পর্দা ও খুটিতে চুমো খায় (তাকবীল), জড়িয়ে ধরে (ইলতিযাম), কবরবাসীর জন্যে কুরবাণী করে। মান্নত আদায় করে। মাযারকে হারাম শরীফের ন্যায় সম্মান করা হচ্ছে। আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে সরাসরি কবরবাসীদের কাছে আপদ-বিপদ দূর হওয়ার জন্যে, কাজ সমাধা হওয়ার জন্যে, মনের বিভিন্ন বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু'আ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যানুযায়ী হজ্জের স্থানসমূহের সম্মান ও ভক্তির চাইতে মাযারের ভক্তি-শ্রদ্ধাই বেশী ও সূক্ষ্ম। এ সব কাজ যদি শিরক না হয়, তবে আর কিসের নাম হবে শিরক ?

সিজদা এক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। তাওয়াফ হবে এক আল্লাহ্ তাআলার ঘরের। দু'আ হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। কুরবাণীর পশু নিয়ে সফর হজ্বের জন্যে নির্দিষ্ট। মান্নত আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট। ঘাস না কাটা, পশু-পাখি শিকার না করা ইত্যাদি বিধান হারামাইন শরীফাইনের সাথে সুনির্দিষ্ট।

উল্লেখিত কাজসমূহের কোনটিকে আপন স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র প্রয়োগ করা শিরক ও বিদআতের শামিল।[১]

ভালভাবে বুঝা উচিত, জাহেলি যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঈদ উৎসব হত। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে তার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' দান করলেন। এ ঈদ দ্বয়েরও রয়েছে অনেক হুকুম ও আদব।

অনুরূপভাবে জাহেলি যুগে এমন অনেক স্থান ছিল, যেখানে তারা ইবাদত স্বরূপ সমবেত হত। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া পরবশঃ হয়ে মুসলমানদেরকে সে স্থানগুলোর পরিবর্তে হজ্বের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান দান করেছেন। শরীয়ত এ সব স্থানের বিভিন্ন বিধান ও আদব শিক্ষা দিয়েছে।[২]

এখন যদি আমরা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ঈদ ও স্থানসমূহ্ পরিত্যাগ পূর্বক অথবা সেগুলোর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরো ঈদ ও অনুরূপ স্থানের সংযোজন সাধন করি, তাহলে এটা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অমর্যাদা এবং তার বিধান লংঘন ছাড়া আর কি হবে?

পীর সাহেবকে হেদায়াতের মালিক মনে করা বা কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং জাহান্নাম হতে মুক্তিদানে সক্ষম মনে করা

এ শিরকী আকীদা বিশ্বাসটি বহু মূর্খ মুরীদদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অথচ পীর সাহেবের কাজ শুধু পথ প্রদর্শন করা, সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। আর মনযিলে মাকসূদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো অর্থে ব্যবহৃত যে হেদায়াত, সে হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সে হেদায়াত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালামদের হাতেও দান করেননি।

১– রিসালাতুত তাওহীদ ঃ ৯৯–১০১
২–আওনুল মা'বূদ শরহু সুনানে আবি দাউদ ঃ ৬/২০৩

সূরা কাসাসে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।"–সূরা কাসাস ঃ ৫৬

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

" আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহ্র কাছে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। এদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।" –সূরা মায়িদা ঃ ৪১

সূরা জিনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

"বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার বা সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন ঃ আল্লাহ্র কবল হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। বস্তুতঃ আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো এবং তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।" –সূরা জিন ঃ ২১–২৩

সুতরাং, সৎ পথে পরিচালিত করা, মনযিলে মাকসূদে পৌঁছিয়ে দেওয়া যখন কোন নবীর ক্ষমতাধীন ছিল না, সেখানে পীর সাহেব সে ক্ষমতা কোথায় পাবেন ?

এমনিভাবে জান্নাতদান করা, জাহান্নাম হতে মুক্তি দেওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ক্ষমতা কারো হাতে অর্পণ করেননি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন ঃ

يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك ضرا ولا نفعا.

'হে ফাতেমা! তুমি নিজকে জাহান্নাম হতে বাঁচাও। আমি কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই।' –সহীহ মুসলিম ঃ ২/১১৪, জামে তিরমিযী ঃ হাদীস ৩১৮৫

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، ولاأغني عنك من الله شيئا.

"হে কুরাইশ! তোমরা নিজকে বাঁচানোর চিন্তা কর। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে আব্দে মোনাফের বংশধর! (শুনে রেখো) আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না।

হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সফিয়্যা! আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! সম্পদ চাইলে বল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমি তোমার কোন উপকারে আসব না।"

–সহীহ বুখারী ঃ হাদীস ৪৭৭১, সহীহ মুসলিম ঃ ২/১১৪

মোটকথা, প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল ঈমান, আমলে সালেহ, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও করুণা কামনা করা। কেননা, জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পাওয়া একমাত্র তাঁর করুণার উপর নির্ভরশীল। এ সফলতা না শুধু আমল দ্বারা হতে পারে, না তা পীর সাহেবের হাতে গচ্ছিত আছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولاأنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.

"নিজের আমল ঠিক কর। (নফল ইত্যাদিতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, কারো আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও না? উত্তরে ইরশাদ করলেন, আমাকেও না, তবে যদি আল্লাহ তা'আলার রহমত আমাকে

ঢেকে নেয়। শুনে রেখো! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় আমল সেটি, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হোক না কেন।"

– সহীহ্ বুখারী ঃ হাদীস ৬৪৬৭, সহীহ্ মুসলিম ঃ ২/৩৭৭

অন্য হাদীসে আছে ঃ

لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد، و القصد، تبلغوا.

"তোমাদের কাউকে তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও পারবে না ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না আমাকেও না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার রহমত যদি আমাকে ঢেকে নেয়। তোমরা নিজেদের আমল ঠিক কর, (নফলের ক্ষেত্রে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। সকাল, বিকাল ও রাতের কিছু অংশে (অল্প অল্প নফল) ইবাদত কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর (অর্থাৎ অতি সামান্যও নয় আবার অনেক বেশীও নয়, ইনশাআল্লাহ্ অভীষ্ট লক্ষ্যে) পৌছে যাবে।"

–সহীহ্ বুখারী ঃ হাদীস ৬৪৬৩, সহীহ্ মুসলিমঃ ২/৩৭৭

পীর সাহেবের ব্যাপারে হুলূলের আকীদা রাখা

হুলূল অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা পীর সাহেবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার আকীদা রাখা। এটা কুফরী আকীদা। এ কুফরী আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ ২৬৭-২৬৮, ২৭৩-২৭৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হবে। সেখানে ভালভাবে দেখে নেবেন আশা করি।

৬. পীর মুরীদীর অন্তরালে যৌনতার প্রসার

পীর মুরীদীর আসল কাজ আত্মার সংশোধন। প্রবৃত্তি চাহিদার মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে যৌন সম্ভোগেচ্ছা। যৌনাচার ও তার প্রারম্ভিক কাজ পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। এটা শুধু ঈমানের দাবী তাই নয়, বরং সুষ্ঠু প্রকৃতি ও সুস্থ রুচীরও দাবী বটে। কে না জানে যে, শরীয়ত পর্দাহীনতাকে হারাম করেছে।

তেমনিভাবে ভিন্ন মহিলাদের সাথে মেলা-মেশা, সুশ্রী বালকদের সাথে উঠা-বসা করা, কুদৃষ্টি, ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে নরম সুরে কথা বলা, গান-বাজনা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং যে সকল কাজ দ্বারা কামবাসনা বৃদ্ধি পায়, যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম হয়–সবই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এগুলো হারাম হওয়ার

বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, তা যরুরিয়াতে দ্বীন তথা সর্বজন বিদিত দ্বীনী বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আফসোস! তাসাওউফ পন্থীদের একটি দল এমনও রয়েছে, যারা উপরোক্ত হারাম কাজগুলোকে যে শুধু হালাল মনে করে তাই নয়, বরং রীতিমত (নাঊযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হওয়ার দাবী করে এবং সামা'র নামে সেগুলো করে থাকে।

ভেবে দেখার বিষয়! হারামকে হালাল মনে করাই যেখানে কুফরী, সেখানে হারামকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম জ্ঞান করা অথবা তাকে ইবাদত মনে করা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ হবে? আর এ কাজে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের কি দশা হবে?

আর 'সামা' سماع যার একটি প্রকার পরবর্তী সূফীদের এক জামাআতের মতে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে মুবাহ তথা বৈধ। সেই সামা'র নাম দিয়ে পূর্বোক্ত হারাম কাজগুলোকে হালাল করা, শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম সাব্যস্ত করা এমনই, যেমন কেউ মদকে শরবত নাম দিয়ে হালাল বলতে শুরু করল। কেননা, যে সামার সাথে বর্তমানের ফকীর দরবেশদের সম্পর্ক, তাতে পর্দাহীনতা হয়, মহিলা ও সুন্দর সুন্দর বালকদের সাথে মেলা-মেশা হয়, গজলের বিষয়বস্তু হয়ত অশ্লীল বা শিরক, কুফরী, অলীক ও জাল হয়ে থাকে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝেও সর্বপ্রকার লোকই থাকে। কেউ প্রবৃত্তি পূজারী, আবার কেউ যৌনপূজারী। এ প্রকৃতির আরো অনেক বখাটে লম্পট লোকদের আগমন ঘটে উক্ত আসরে। সাথে থাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। এছাড়া আরো বহু গর্হিত কাজ তো সংঘটিত হয়-ই। সবচাইতে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে এগুলোকে নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

সুতরাং, এ ধরনের সামা কুরআন-হাদীস, ইজমায়ে উম্মত বিশেষতঃ হককানী সূফীদের ঐক্যমতেও হারাম। (আর একে নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী) আজ পর্যন্ত কোন মুসলমানই একে জায়েয বলেনি। যে ব্যক্তি এর বৈধতার সম্বন্ধ কোন হক্কানী বুযুর্গের দিকে করে, সে মূলতঃ পুতপবিত্র জামাআতের উপর অপবাদ ও মিথ্যারোপ করে।[১] এ ব্যাপারে শতশত উক্তি, উদ্ধৃতি হতে এখানে আমি মাত্র একটি উক্তি উল্লেখ করছি ঃ

'তাফসীরাতে আহমাদিয়া'–কিতাবে আছে ঃ

"আমাদের যুগে লোকেরা সামা'র ব্যাপারে খুব তৎপর। তারা শুরার পেয়ালায় মাতাল হয়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, অবৈধ কাজ করে। খারাপ চরিত্রের পুরুষ,

---

১.–মাজমূউল ফাতাওয়া ঃ ১১/৫৪২-৫৪৬, ৫৬৭-৫৮৬, ইসলাম আওর মূসীকী ঃ ২৫৯-২৬০, ৩৩৯-৩৪০

শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী বালকদেরকে একত্রিত করে, গান-বাজনা শ্রবণ করে ইত্যাদি। এরূপ করা যে কবীরা গোনাহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এগুলোকে হালাল মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী।" –তাফসীরাতে আহমাদিয়া ঃ ৬০৪-৬০৫

পরবর্তী সূফীদের মতানুযায়ী বৈধ সামা'র কতিপয় শর্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল। অবশ্য এসব শর্তবিশিষ্ট সামা'কেই পূর্ববর্তী হক্কানী সূফীগণ মাকরূহ বলতেন।

পরবর্তী সূফীদের মতে মুবাহ সামা'র শর্তসমূহ ঃ

১. শ্রোতা প্রবৃত্তিপূজারী না হতে হবে, যাতে সুর শুনে কামভাব সক্রিয় না হয়ে উঠে, বরং শ্রোতা পরহেযগার, মুত্তাকী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে সামা'র দ্বারা শ্রোতার মনে যিকির ও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

২. মাহফিল বা আসরে কোন মহিলা কিংবা শ্মশ্রুবিহীন সুন্দর বালক উপস্থিত না থাকা।

৩. 'সামা' দ্বারা শুধু আমোদ-প্রমোদই উদ্দেশ্য না হওয়া, বরং আল্লাহ তা'আলার যিকিরে আগ্রহ সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টি রাখা।

৪. পাঠক কোন মহিলা বা সুশ্রী বালক না হওয়া, বরং শ্রবণকারীদের অনুরূপ হওয়া।

৫. গযল ও কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল ও নাজায়েয না হওয়া।

৬. সামা'র সাথে কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না থাকা।

৭. লৌকিকতা ও লোক দেখানোর জন্যে ওয়াজ্দ তথা খোদাপ্রদত্ত বিশেষ অবস্থার প্রকাশ না করা।

উল্লেখিত শর্তসমূহের প্রতি খেয়াল রেখে যদি 'সামা' অনুষ্ঠান হয় (যা বর্তমানে অস্তিত্বহীন), তবুও তার গুরুত্বপ্রদান করা বিজ্ঞ সূফীদের নিকট অপছন্দনীয়। (তাদের মাঝে হযরত বড় পীর সাহেবও রয়েছেন) কেননা, খাইরুল কুরূনে (সাহাবী, তাবেঈ, তাবেতাবেঈর যুগে)–এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই যদি কেউ একে সুন্নাত ধারণা করে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে, তাহলে এটা সর্বসম্মতিক্রমে বিদআত বলে বিবেচিত হবে।[১]

উল্লেখিত শর্তারোপিত সামা সম্পর্কে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এটা প্রাথমিকদের জন্যে গোমরাহী। আর তা উপরস্থদের কোন প্রয়োজন নেই।'[২]

যাহোক, হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে 'সামা' শব্দের আড়ালে যৌন সম্ভোগের প্রচার-প্রসার ধর্মহীনতা বৈ কিছুই নয়। হক্কানী তাসাওউফের সাথে তার

---

[১]-মাজমূউল ফাতাওয়া ঃ ১১/৫৮৩, ৫৯২-৫৯৮,৬০৪-৬২৯, ইসলাম আওর মূসীকী ঃ পূর্ব কিতাব।
[২]-রুহুল মাআনী ঃ ৬/৪৬৭, ইসলাম আওর মূসীকী ঃ ৩৫৯

আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এ তো মনুষত্বের প্রথম সবক হায়া-শরম ও পবিত্রতার পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা করুণা করুন এবং এ আপদ হতে উম্মতকে নিরাপদ রাখুন।

৭.পরিভাষার অন্তরালে কুফরী, নাস্তিকতা, শিরক ও বিদআতের প্রচার প্রসার

হক্কানী সূফিয়ায়ে কেরামের বাক্যবলীতে সূলুক ও আত্মশুদ্ধি মাসআলা সংক্রান্ত কিছু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট সেসব পরিভাষার শরীয়তগত অর্থও প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাসাওউফ দাবীদাররা সেসব পরিভাষাকে নিজেদের কুফরী মতবাদসমূহের প্রচার প্রসারের জন্যে সোপান বানিয়েছে। সেসব পরিভাষায় বিকৃতিসাধন করে তার আড়ালে তাদের কুফরী মতবাদ, কাল্পনিক কথাবার্তা, শিরক ও বিদআতের প্রচলন ঘটিয়েছে। যেখানে তারা প্রয়োজন বোধ করেছে সেখানে আরো নতুন নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করেছে এবং সেগুলোর অন্তরালে আজেবাজে আরো বহু কিছুর প্রচার প্রসার করেছে।

সে উভয় প্রকার পরিভাষাসমূহের (বিকৃত ও আবিষ্কৃত) ফিরিস্তী অনেক লম্বা। সেসব পরিভাষার মধ্যে রয়েছে ঃ শরীয়ত-তরীকত, হাকীকত-মারেফত, যাহের-বাতেন, ফানা-বাকা, ওয়াহ্‌দাতুল ওয়াজূদ- ওয়াহ্‌দাতুশ শুহূদ, ইলমে লাদুন্নী, মুজাহাদা, নিসবত, ক্বলব জারী করা, মুমিনের ক্বলব আল্লাহর আরশ, যে নিজকে চিনেছে সে তার আল্লাহকে চিনেছে, যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যসমূহ।

ইচ্ছা ছিল এ পরিভাষাসমূহের কোন্ কোনটি পরবর্তীতে আবিষ্কৃত, কোনটির আসল অর্থ কি ? এবং তাতে কি কি বিকৃতি হয়েছে, কোনটির মাধ্যমে কুফরী মতবাদ, শিরক ও বিদআতের প্রচলন করা হয়েছে—সবিস্তারে উল্লেখ করব। কিন্তু মুরুব্বীয়ানে কেরাম বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই পরামর্শ দিলেন যে, এই বিষয়টি ভিন্ন কিতাব আকারে লেখা হোক। আর এখানে শুধু এতটুকু ইঙ্গিত পর্যন্তই রাখা হোক। এজন্যে আমি এখানে এ ইঙ্গিত পর্যন্তই দিয়ে সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক এনায়েত করেন, তাহলে একে ভিন্ন পুস্তকাকারে লেখার ইরাদা আছে। যদিও সেসব পরিভাষার কোন কোনটির আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে এ পুস্তকেও এসেছে, তথাপি পুস্তকাকারে তার সারগর্ভ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

সমসাময়িক কয়েকজন পীর সাহেব

তাসাওউফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত মোতাবেক চলা এবং মানুষকে সে পথে চলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা এবং চালানোর প্রচেষ্টা করা। অন্যভাবে বলতে গেলে তাসাওউফের উদ্দেশ্য দাঁড়ায় শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ–অনুকরণে পূর্ণতা অর্জন করা। এজন্যে তাসাওউফ দীক্ষা এমন সূফী বা এমন পীর সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া জরুরী, যিনি শরীয়তের জ্ঞানে বিজ্ঞ এবং সুন্নাতেরও পরিপূর্ণ অনুসারী। এরূপ পীরের কিছু আলামত ও লক্ষণ রয়েছে। বিজ্ঞ হক্কানী বুযুর্গগণ কুরআন–হাদীসের আলোকে সেসব আলামত নির্ধারণ করেছেন। আমরা উক্ত আলামতগুলো ৭৮–৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি।

শরীয়ত অস্বীকারকারী, শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ বা বিদআতী (সুন্নাত বিরোধী) কোন পীরের হাতে বাইআত হওয়া, তার সোহবত ও সংশ্রব অবলম্বন করা সম্পূর্ণ হারাম। তাই বাইআত হওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। যেন অপাত্রে বাইআত হয়ে আসল পুঁজি হারাতে না হয়।

বর্তমান যুগে ভারত উপমহাদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে বিদআতী, মূর্খ এমনকি বেদ্বীন পীরের খুবই ছড়াছড়ি। এ কিতাবে সকল মূর্খ ও বিদআতী পীর এবং তাদের মূর্খতা, বিদআতসমূহের পর্যালোচনা করা কঠিন ব্যাপার। এরজন্যে দরকার বিরাট কলেবরের স্বতন্ত্র পুস্তক। প্রত্যেক ধর্মহীন পীর এবং তার কুফরী আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করাও বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির কারণ হবে।

তাই এখানে আমি শুধু এমন কয়েকজন পীরসাহেবের ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাচ্ছি, যাদের কিছু পুস্তক বা বাণী সংকলন আমার সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। যাদের গ্রন্থ বা মালফূযাত তথা বাণী সংকলনে আমার এমন কিছু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেগুলো একেবারে সুস্পষ্ট কুফরী। তাতে কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশ নেই। আমি কেবলমাত্র ইলমের আমানত রক্ষার্থে এসব তত্ত্বগুলো তুলে ধরছি। যাতে নিশ্চিত বাতিলের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালনের কারণে বাতিলপন্থীদের সঙ্গে আখেরাতে উঠতে না হয়।

মাইজভাণ্ডারের পীর সাহেবান

মাইজভাণ্ডারের মাযারসমূহে বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদআত প্রচলিত আছে। আমাদের জানা মতে সেখানকার পীর সাহেবদের পক্ষ হতে এসব শিরক, বিদআতের কোন বাদ–প্রতিবাদ হয় না। সেখানকার সাথে সম্পৃক্তদের অনেকেই সাধারণতঃ বাতেনী নামাযের নামে নামায ফরজ হওয়ার কথাকেই অস্বীকার করে থাকে। সেখানকার সংশ্লিষ্টদের মুখে সুস্পষ্ট কুফরী ও শিরক সম্বলিত অনেক শে'র–আশআর, কবিতা–গজল ব্যাপকভাবে চালু আছে। এসবের অনেক উদাহরণ সায়্যিদ মুনীরুল হক, মুনতাযিম গাওছিয়া আহমাদিয়া মনযিল কর্তৃক প্রকাশিত 'রত্নভাণ্ডার'–এ পাওয়া যায়।

যেমন উক্ত পুস্তিকার ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ

"আহ্‌মদে বেমিম পেয়ারে–গাউছে মাইজভাণ্ডার।" অর্থাৎ তার দাদা পীর সায়্যিদ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী মীমবিহীন আহমাদ। মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ 'আহাদ' হওয়া। অর্থাৎ সে আল্লাহ (ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু)। এ ধরনের ইল্‌হাদ, শিরক ও কুফরী হতে আল্লাহ তাআলার নিকট শতবার আশ্রয় কামনা করি।

উক্ত সিলসিলার দ্বিতীয় পীর সাহেব সায়্যিদ দিলাওয়ার হুসাইন (ইন্তেকাল ঃ ১৯৮২ ইং) "বেলায়তে মোত্‌লাকা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ পুস্তকটি তাদের তরীকার মৌলিক পুস্তকের মর্যাদা রাখে। এটিও কুফরী, অলীক ও বাজে আলোচনায় ভরপুর। সেসব কুফরীর বদৌলতেই শ্রী যোগেশ চন্দ্র সিংহ–এর মত হিন্দু মুশরেকের অভিমত লাভ করতে পেরেছে। এ অভিমতটি উক্ত পুস্তকের সপ্তম সংস্করণের ১৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় ছেপেছে।

উক্ত বইয়ের কুফরী মতবাদ ও কুফরী আকীদাসমূহের মধ্য হতে মাত্র দু'টির কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

১. 'তাওহীদে আদ্‌য়ান', যার সারমর্ম হল—মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দ্বীন ইসলাম ছাড়াও যে কোন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে মানুষ আখেরাতে মুক্তি পেতে পারে।

এটি সম্পূর্ণ কুফরী আকীদা। কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইজমায়ে উম্মতের অসংখ্য বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রথমে এ মতবাদ সম্পর্কে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' নামক পুস্তকের কিছু বাক্য উল্লেখ করা হল ঃ

"একরার বিল লেছান" মুখে স্বীকার করা। "তছদীকে বিল যানান" অন্তরে বিশ্বাস করা। ঈমানের এই দুই দিকের মধ্যে ইহা "তছদীকে বিল যানান" ইহা দৃঢ় বিশ্বাস সম্বলিত বিধায় ইহাকে "ঈকান" বলা হয়। তাই এখানে ভাষা বা চিন্তার বাহ্যিক প্রকৃতি শিথিল ও ভাবের ভাষাহীন প্রকৃতি সজাগ ও চেতনা সম্পন্ন। ইহাতে স্থান, কাল, গোত্র সম্প্রদায়, বা ধর্মবৈষম্য জনিত ভাব বিলুপ্ত। ইহা ছালেককে অদ্বৈত খোদা ধর্মে অভ্যস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিতে দেখা যায়। যাহা বেলায়তে মোতলাকার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ "খুছুছিয়ত।" ইহা বেলায়তে মোকাইয়্যাদাতে খুবই কম বিকশিত হইয়াছে। নবুয়তে ফোরকানী অর্থাৎ আদেশ নিষেধ বা বিভিন্নরূপ ভেদ প্রদানকারী বিধায় ; উক্ত "ঈকান" রহস্য বিকশিত হওয়া বিশেষ কষ্ট সাধ্য ছিল। তৌহিদ; দ্বৈতভাব পরিহারকারী বিধায়, বিশ্ববাসীকে একই চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে ক্ষমতা সম্পন্ন। ইহা এই মৌলিক ত্বরীকত পন্থাকেই সম্ভাব্য, যাহা খাতেমুল বেলায়ত মওলানা ছৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ (কঃ) মালামিয়া কাদেরীর মসরবে পাওয়া যায়। তাঁহার এই অপূর্ব নির্বিলাস ছুফী সভ্যতা বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত। **শরীয়ত পার্থিব নাছূতী স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।**

যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, এই মাকামের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কোরআন পাক, চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল ভ্রান্তি মুক্ত। কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক। যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদীছ ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাজারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সওদা করিবার অধিকার আছে, সেইরূপ মানবের বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বাছিয়া নিবারও অধিকার আছে এবং ইহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ইহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর ধর্মাবলম্বীরা সেইরূপ এই ধর্মমনন প্রকৃতির সঙ্গে আচার ধর্মের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করিতে না পরিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোস্‌লেম বিধান ধর্মাচারীরা তদ্রূপ স্বার্থপর ধর্মবিরোধপন্থী লোকদের পাল্লায় পড়িয়া অথর্ব বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নিজে ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহারা খোদার এবাদতে প্রেম, প্রেরণা, ভুলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা লক্ষ্য করিয়া কোরআন পাক বলিয়াছে ঃ "ঐ বিশ্বাসীরাই সফলকাম, যাহারা নামাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতি নম্র ও ভীতি বিহ্বল" (কোরআন) ঐ ব্যক্তিরা, যাহারা নামাজে নিজ স্রষ্টা প্রেম জাগরণ সম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানজ সংরক্ষক ও নিয়মানুবর্তী।"

"ঐ লোকদের জন্য ওয়ায়েল দোজখ হইবে যাহারা জ্ঞানজ ছালাত সম্বন্ধে অসতর্ক।" কোরআন ছুরা মাউন ৫ আয়াত এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করিয়াছেন।

ছালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ আগুনকে প্রজ্জ্বলন ও উদ্দীপন করা। অর্থাৎ খোদা-প্রেমের ধামা চাপা পড়া আগুনকে জাগ্রত করা। সেইরূপ 'আকীম' শব্দ বিচ্ছিন্ন ও পতিত খিমা বা তাবুকে বিন্যস্ত করার জন্য আরবেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানে ইহার অর্থ খোদার-প্রেমাগ্নি জাগ্রত করা এবং তজ্জন্য নিজেকে গুছাইয়া লাওয়া-বা-যথাযথ বিন্যস্ত করা বুঝায়। সুতরাং যেই এবাদতে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগরিত হয়না তাহা এবাদত বা সুষ্ঠু ছালাত যোগ্য নহে। **বিন্যস্ততার দিক্ নিয়া বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্নরূপ হইলেও যেখানে এই খোদা-প্রেম জাগ্রত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাকে ছালাত বলা যাইতে পারে।**

ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্ম বিরোধ মিটিয়া যাইতে বাধ্য। বিশ্ব ধর্মবিরোধ মিটাইয়া ইহার সমন্বয় সাধন করিতে বেলায়তে মোতলাকায়ে আহ্‌মদী-ই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এই বেলায়তের প্রভাবেই জগত হইতে ধর্ম বিরোধ তিরোহিত হইতে পারে। মানব জাতির চারিত্রিক অবনতি এই বেলায়তের সুষ্ঠু কর্মপন্থাই রোধ করিতে পারে। যাহা

এবাদতে মোতনাফিয়ার কার্য বলিয়া উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভিন্নভিন্ন জাতির ভিন্নভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সর্বধর্ম সম্মত মত এই যে, মানব জাতির চরিত্রগত অবনতি রোধ করতঃ চরিত্রবান মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। যাহা নেহায়ত মৌলিক।" —বেলায়তে মোতলাকা ঃ ৮৯—৯১

১২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"মানবের রুচী অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদয়্যান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোতলাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে।"

পূর্বেও এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কালিমা পাঠকারী মুসলমান মাত্রই জানে যে, এরূপ আকীদা–বিশ্বাস পোষণ করা সুস্পষ্ট কুফরী এবং এরূপ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি কাফের। শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের পর আল্লাহ তাআলার নিকট অন্য কোন শরীয়ত বা দ্বীন–ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ أَأَسْلَمْتُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

"এবং আহলে কিতাব এবং নিরক্ষরদেরকে (আরবের মুশরেকদেরকে)বলে দাও যে, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করছ? তখন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে হেদায়াত পেয়ে গেল। আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে (তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা,) তোমার দায়িত্ব তো হল শুধু পৌছে দেওয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।" —সূরা আলে ইমরান ঃ ২০

সূরা আলে ইমরান–এর অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" —সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

সহীহ মুসলিম ১/৮৬, হাদীস ২৪০–এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত আছে ঃ

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.

"ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মতের ইয়াহুদী বা নাসারা যে–ই আমার দাওয়াত পাবে আর আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে হবে জাহান্নামী।"

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন ঃ

وإنما ذكر اليهود والنصرى تنبيها على من سواهما، لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شانهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب لهم أولى.

"ইয়াহুদ–নাসারার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে, যেন অন্যদের ব্যাপারে সতর্কারোপ হয়ে যায়। কেননা, ইয়াহুদ–নাসারার রয়েছে আসমানী কিতাব। তাদের নিকট আসমানী কিতাব থাকা সত্ত্বেও যখন অবস্থা এমন, তাহলে যাদের কিতাব নেই তাদের অবস্থা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।"

—শরহে মুসলিম ঃ ১/৮৬

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা এ ঘোষণাও দান করেছেন যে—

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"

—সূরা মায়িদা ঃ ৩

কত লেখব! কুরআন মাজীদের এক–দু' আয়াত নয়, বরং হাজারো আয়াতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে, কুরআন–হাদীস, ইসলাম ও শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণ ব্যতীত পরকালে মুক্তি সম্ভব নয়। কোন

মনগড়া দ্বীন তো দূরের কথা পূর্ববর্তী কোন আসমানী শরীয়তের অনুসরণও জায়েয নেই। এটি উম্মতের সর্বজনবিদিত আকীদা। কালিমা পাঠকারী মুসলমান মাত্রই সে যতই সাধারণ হোক না কেন এ বিষয়টি অবশ্যই জানে। কিন্তু মাইজভাণ্ডারের পীর সাহেব প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে স্ব স্ব ধর্মে অটল থাকার অনুমতি প্রদান করছেন। যেন নিজকে সৃষ্টিকর্তা, মা'বূদ ও শরীয়ত প্রবর্তক মনে করেন। এজন্যেই তো তিনি এ বিষয়ের অনুমতি দিচ্ছেন যা থেকে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করে দিয়েছেন।

২. উক্ত 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' পুস্তকের কুফরীসমূহের মধ্য হতে আরেকটি সুস্পষ্ট কুফরী হচ্ছে যে, তিনি বিশেষ বিশেষ ওলীর এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ মুরীদের জন্যে শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করা বৈধ মনে করেন। তাদের জন্যে ইবাদত করাকে জরুরী মনে করেন না। তিনি পরিস্কার বলেন যে, শরীয়তের অনুসরণ শুধু নাসূতিদের (নফসে আম্মারা কবলিত সাধারণ মানুষ) জন্যে জরুরী। এ ছাড়া অন্যদের জন্যে শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণও জরুরী নয় ; স্ব স্ব দ্বীনের অনুসরণই যথেষ্ট।

উক্ত পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ

> "যেই জ্ঞান দর্শন যুক্তি সম্বলিত নীতির উপর রিসালত বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত তা হলো "এবাদতে মোতনাফিয়া' ও 'মুয়ামেলাতে এয়েতেবারিয়া' অর্থাৎ, পাপকার্য থেকে বারণকারী এবাদত ও পরস্পর স্বার্থ সম্পর্কিত কার্যকলাপ। এটা রিসালত বা শরীয়তের প্রধান স্তম্ভ। **শরীয়ত নাসূত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।**"

'বেলায়তে মোত্‌লাকা'–এর ১১৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

> "**বিধান শিথিল অবস্থা ঃ** ইসলামী শরীয়তী আইন কানুন মায়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হুকুমতের হুকুমের সঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য। এবাদাতে মোতনাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরামগণ গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উস্‌কানীদাতা মতলববাজ "আলেম" নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা; মোরাকেবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু **স্বরীকত পন্থা শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায়, লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর**

হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বর্হির্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টির ভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। এই কারণে জিকরে জবানীকে নাছুতী এবং জিকরে কল্‌বীকে মলকূতী বলা হয়।

ছুফী ধান ধারণা ঃ ছুফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধকারী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায়, তাহারা ত্বরীকত পন্থী। তাঁহারা এখতেলাফ পরিহার করেন; অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। **বিধানধর্মের উপর নৈতিকধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন** এবং এবাদত বা উপাসনার উপর, **"এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন, যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য।** যথা কোরআন পাক ঃ– বল–"যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস, আমার অনুগত হও, খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ বিদুরিত করিবেন। খোদা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

আজিম নগর নিবাসী সৈয়দুল হক ফকীর ছাহেবকে হযরত আকদাছ একদা বলিয়াছিলেন ঃ– "সৈয়দুল হক মিঞা। **আপনি আমার আবদুল মজিদ মিঞার সঙ্গে উঠা বসা করিবেন।"** তিনি বলিলেন, আমি গরীব। মজিদ মিঞা বড় লোক, নামাজ রোজার দস্তুরবন্দও নহেন। এহেন অবস্থায় আমার কি উপকার হইবে? হযরত আকদাছ উত্তরে বলিলেন, **'মজিদ মিঞার কোরআন কিতাব মজিদ মিঞার জন্য, আপনার কোরআন কিতাব আপনার জন্য।** আপনি তাহার সহিত দোস্তি রাখিবেন, আমি আপনাকে দেখিব।"

উক্ত পুস্তকের ১১৯–১২০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"ইহার পরবর্তী ধাপ হইলো নফ্‌ছে মোলহেমা অর্থাৎ খোদায়ী প্রেরণা উৎস প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি। রাজিয়া, মর্জিয়া ও কামেলা প্রভৃতি যে যেই মকামের বা স্তরের লোক, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুরাগ ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট মতে মুরীদ বা ছালেক আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক অনুরাগী বিধায়, ইহাদিগকে মুরীদ বলে। **শরীয়ত (শুরু ও প্রাথমিক)**

তকলিদী দলবদ্ধ গৌণ ও প্রথম স্তরের লোক বিধায় তাহাদিগকে শুধু উম্মত বলা হয়। তরীকত পন্থীগণ শুধু উম্মতই নহেন, বরং মুরীদও বটে। ছালেক বা খোদাপথচারী, নিজ নফ্ছ বা সত্ত্বার উপর উল্লেখিত স্তরের অভ্যন্তরে ডুব দিলেই বুঝিতে পারে, নিজে কোন মকামে বা স্তরে আছে। আম্মারা স্তরে থাকিলে সে শরীয়তে তক্‌লিদীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। যেহেতু ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর স্তর। এই স্তরের লোক শৃঙ্খলিত না থাকিলে স্বাভাবিকভাবে ফ্যাছাদ ও রক্তপাত করে, যাহা আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতারা অনুমান করিয়াছিল।" তাই **প্রত্যেক ধর্ম–বা সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার।** ধর্মহীন লোকেরা বহুকিছু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও এযাবৎ তাহারা বিশ্ব সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে নাই, বরং দিন দিন নূতন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।"

এখন আপনিই দেখুন, ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতার কোন্ বিষয়টি বাদ **দেওয়া হয়েছে—যা উক্ত পুস্তকে** উল্লেখ করা হয়নি। তাতে উল্লেখিত **বিষয়গুলোর মধ্যে ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ** এমন কথাবার্তা রয়েছে যা শিরক ও কুফরীর কোন প্রকারই বাদ পরেনি, সবই তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

ক—তরীকত শরীয়ত ভিন্ন কোন জিনিস।

খ—বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যে শরীয়তের অনুসরণ করা জরুরী নয়।

গ—বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালন করা অপরিহার্য নয়।

ঘ—বিশেষ ব্যক্তিবর্গের শরীয়ত ও কুরআন হাদীস সাধারণ মানুষের শরীয়ত ও কুরআন হাদীস থেকে ভিন্ন।

ঙ—সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণও অপরিহার্য নয়, বরং নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দ্বীনের অনুসরণ করতে পারে।

এসব কুফরী আকীদা সম্পর্কে এখানে পর্যালোচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা, এসম্পর্কে ১৫৫—১৮৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত কথা এতটুকু যে, সে যখন নিজেই শরীয়তে মুহাম্মাদী হতে বের হওয়াকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে এবং

বেরও হচ্ছে, তখন আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, সে তার নিজস্ব বক্তব্য মোতাবেকই শরীয়তে মুহাম্মাদীর গণ্ডি বহির্ভূত কাফের ও মুরতাদ–এর বেশী কিছু নয়।

সায়্যিদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ চন্দ্রপাড়া, ফরীদপুর

তিনি ছিলেন এনায়েতপুরী সাহেবের একজন খলীফা এবং দেওয়ানবাগী পীর সাহেবের পীর। ওফাত ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সায়্যিদ আবুল ফযল কর্তৃক লিখিত 'হাক্কুল ইয়াকীন' পুস্তকের ২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"কোন লোক যখন মকামে ছুদুর, নগোর, শামসী, নুরী, ক্বুরবে মাকিনের মোকাম অতিক্রম করিয়া নফসীর মোকামে গিয়ে পৌছে তখন **তাঁহার কোন ইবাদত থাকে না।** জজবার অবস্থায়ও কোন লোক যখন ফানার শেষ দরজায় গিয়ে পৌছে তখনও তাহার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করিলে কুফরী হইবে। তাসাওফের বহু কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।" —হাক্কুল ইয়াকীন (অনুভবলব্ধ জ্ঞান) দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২৯

এ মতবাদও যে একটি কুফরী মতবাদ, তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। এ পুস্তকের ১৬৭—১৭১ নম্বর পৃষ্ঠায় এ মতবাদটি কুফরী হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান আছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

শরয়ী উযর বা কারণ ব্যতীত ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা–বিশ্বাসই কুফরী আকীদা আর তিনি ইবাদত করাকেই কুফরী বলছেন!! সুতরাং শরীয়তের একটি ফরয কাজকে কুফরী ঘোষণাদানকারীর কি হুকুম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!!

উল্লেখ্য যে, আবুল ফযল সুলতান আহমদের কিতাব 'হাক্কুল ইয়াকীন'–এ দেওয়ানবাগী পীর সাহেবেরও অভিমত আছে। বুঝা গেল তিনিও উক্ত কুফুরী আকীদার সাথে একমত।

আট রশির পীর সাহেব

বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে যে কি সব বিদআত, খুরাফাত ও শরীয়ত গর্হিত কাজ হয় তা পাঠকমাত্রই জানেন। আমি এখানে পীর সাহেবের শুধু একটি উক্তি উল্লেখ করব। এর মাধ্যমেই পীর সাহেবের ঈমান–আকীদার বাস্তব চিত্র বেরিয়ে আসবে।

পীর সাহেব বলেন ঃ (বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, সংবাদদাতা) **"হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে** এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসবে।

তিনি বলেন, ইসলামের সত্যাদর্শ ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন—মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জন করে শুধু মানুষের জন্য নয় ; সৃষ্টির সকল জীব ও বস্তুর প্রতি মর্যাদা ও মমত্ববোধ তার বৃদ্ধি পায়। মানুষের শ্রেয়বোধকে জাগ্রত করাই ধর্মের মূল কথা।"

—সংবাদ ২৮-২-৮৪ইং, আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা ঃ পৃষ্ঠা ৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৮৪ইং, সংকলনে ঃ মাহফুযুল হক। লেখাটির শিরোনাম—'মানুষের শ্রেয়বোধকে জাগ্রত করাই ধর্মের মূল কথা।'—আটরশির পীর সাহেব।

এ আকীদা-বিশ্বাসের পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। এ আকীদাটি কুফরী হওয়া সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা আছে। মাইজভাণ্ডারীদের আকীদা-বিশ্বাসসমূহে এ ধরনের কুফরী আকীদার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। (দেখুন ঃ ২৪১-২৪৩পৃষ্ঠা)

দেওয়ানবাগী পীর সাহেব

দেওয়ানবাগী সাহেবের তত্ত্বাবধানে রচিত তথাকথিত 'মুহাম্মদী ইসলাম'-এর কয়েকটি বই পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে। বিশেষভাবে সূফী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত "সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী অবদানঃ আল্লাহ্ কোন পথে?" এবং "সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার" এই বই দু'টি আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়েছি।

এই বই দু'টি যদিও সরাসরি দেওয়ানবাগী সাহেবের রচনা নয়, কিন্তু বই দু'টির নাম থেকেই সুস্পষ্ট যে, তা তাঁরই তত্ত্বাবধানে লেখা হয়েছে এবং তাতে তাঁরই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তাছাড়া প্রথম পুস্তক" আল্লাহ কোন্ পথে?"-এর শুরুতেই "সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন" শিরোনামের অধীনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ঃ

" 'সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী অবদানঃ আল্লাহ্ কোন্ পথে?' নামক এ গ্রন্থখানি ইসলামী জগতে এক অনন্য রচনা সম্ভার। এ গ্রন্থখানির মাধ্যমে ইসলামের সেই মৌলিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা বিধর্মীদের চক্রান্ত ও স্বধর্মীদের ভুল ব্যাখ্যার কবলে পড়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ **অমূল্য গ্রন্থখানির রচনা ও সম্পাদনা মোহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী মহান সংস্কারক, সূফী সম্রাট হযরত মাহবুব**

-এ- খোদা দেওয়ানবাগী (মাঃ আঃ) হুজুর কেবলা জানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ও পূর্ণ ফয়েজ-বরকতে করা হয়েছে। গ্রন্থখানির রচনা ও সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে নিবেদিত হল এ মহামানবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। – রচনা ও সম্পাদনা পরিষদ”

পুস্তক দু'টি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হল, দেওয়ানবাগী সাহেবের তথাকথিত 'মুহাম্মদী ইসলাম' মূলতঃ বিভিন্ন কুফরী চিন্তাধারা, বাতিল মতাদর্শ, রসম-রেওয়াজ ও বিদআতসমূহ ইত্যাদির সমষ্টি। অবশ্য প্রতিটি কুফরী চিন্তাধারা ও বাতিল মতবাদের দাওয়াত তাঁরা (দেওয়ানবাগী সাহেব ও তাঁর মতাবলম্বীরা) গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টভাবে প্রদান করেননি, বরং শব্দের হেরফেরের আড়ালে মুসলমানদের তা খাওয়ানোর অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু কতিপয় কুফরী চিন্তাধারার দাওয়াত এমন পদ্ধতিতে প্রদান করেছেন যে, শত চেষ্টা করেও সেগুলো গোপন রাখতে পারেননি। আখের কলম ও মুখ থেকে তা বেরিয়েই গেছে।

আমি গ্রন্থ দু'টির আলোকে দেওয়ানবাগী সাহেবের 'মুহাম্মাদী ইসলাম'–এর নীল নকশা উপস্থাপন করছি। আশা করি পাঠকবৃন্দ কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই শুধু নকশা থেকে তাঁর কুফরীর ভয়ানক থাবা স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারবেন।

দেওয়ানবাগী সাহেবের 'মুহাম্মাদী ইসলাম'–এর নীল নকশা

১. দেওয়ানবাগী সাহেবের তথাকথিত 'মুহাম্মাদী ইসলাম' হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের বিকৃত ও কর্তিত রূপের নাম। তাতে দ্বীন ইসলামের মূলতত্ত্ব ও পরিভাষাসমূহের বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাঁর 'মুহাম্মাদী ইসলাম'-এর দ্বারা আগেকার যুগের যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীদের কুফরী চিন্তাধারা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

উপমা স্বরূপ জাহান্নামের আকীদার কথা ধরা যাক। এই আকীদা বিকৃতি করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

> “মানুষের দেহ স্থুল কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম। সুতরাং জাগতিক কোন আগুন দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্বালানো সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর মানুষের শরীর ধ্বংস হয়। উহাকে জাগতিক অর্থে আগুন দিয়ে পোড়ানোর প্রশ্ন অবান্তর। (কাজেই আসল কথা হল) আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা এক বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করতে থাকে । প্রভুর পরিচয় নিজের মাঝে না পাওয়া অবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে বে-ঈমান হয়ে কবরে যায়। তখন তার

আত্মা এমন এক অবস্থায় আটকে পড়ে যে, পুনরায় আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের পথ পায় না। তা আত্মার জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক। **আত্মার এরূপ চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বলে।"** —আল্লাহ্ কোন্ পথে? ঃ ৪৪, ৪৩

অথচ প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, জাহান্নাম আযাবের ঘর যা কাফের-ফাজেরদের জন্যে বানানো হয়েছে, তাতে আগুনে জ্বালানো হবে, বিশধর সাপ-বিচ্ছু কাটবে এবং তাতে বহু রকমের আযাবের ব্যবস্থা করা হবে। কুরআন হাদীসে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা শুনলে শরীরের লোম শিহরিয়ে উঠে। তার আসল হাকীকত কল্পনাও করা যায় না। এসব কঠিন আযাব রূহ ও শরীর উভয়ের উপর হবে, দেহকে আরো বিশাল করে দেওয়া হবে, যাতে আযাবের তীব্র যন্ত্রনা উপলব্ধি করতে পারে।

জাহান্নামের আযাব মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের পর শরীর ও রূহ উভয়ের উপর হবে এবং কি আযাব হবে তারও বর্ণনা কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান আছে। সেই আযাব বিচ্ছেদ বেদনার আযাব নয়। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত 'জাহান্নাম'—এর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বক্তব্য কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দেওয়ানবাগী সাহেব জাহান্নামের আকীদা বিকৃতি সাধনের সাথে সাথে জাহান্নামের আগুনের কথাও অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ "মানুষের দেহ স্থুল, মৃত্যুর পর মানুষের শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে। উহাকে জাগতিক অর্থে আগুন দিয়ে পোড়ানোর প্রশ্ন অবান্তর।"

অথচ জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে শত শত আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান আছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার! দেওয়ানবাগী সাহেব এক বাক্যে সবগুলো অস্বীকার করে দিলেন!!

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

نارکم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم. قالوا: إن كانت لكافية يا رسول الله ، فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء كلها مثل حرها.

"মানুষ যে আগুন জ্বালায়, দুনিয়ার এই আগুন (তার তাপমাত্রা) জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই আগুনইতো (শাস্তির জন্যে) যথেষ্ট! তারপর আবার অনুরূপ উনষাটগুণ (তাপমাত্রা) বৃদ্ধি করা হয়েছে।"—সহীহ মুসলিমঃ ২/৩৮১, হাদীস ২৮৪৩, সহীহ বুখারীঃ ১/৪৬২ হাদীস ৩২৬৫

জাহান্নামের আকীদা বিকৃতি এবং জাহান্নামের আগুন অস্বীকারের সাথে সাথে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথাও তিনি অস্বীকার করেন। এজন্যেই তিনি বলেছেন ঃ "শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে আগুন দ্বারা কিভাবে জ্বালানো হবে এবং রূহ সূক্ষ্ম তাকেও জ্বালানো যাবে না।"

মক্কার মুশরেকরা তো একথাই বলত ঃ

أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.

"আমরা যখন অস্থিতে পরিণত এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুন ভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৮

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের শত শত আয়াতে তাঁদের এই কুফরী খন্ডন করেছেন। শুধু ইসলামই নয়, বরং সকল আসমানী দ্বীনই মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আর দেওয়ানবাগী সাহেবই বুনিয়াদী বিশ্বাস অস্বীকার করতঃ পুনরুত্থান অস্বীকারকারী মক্কার মুশরেক ও কাফেরদের কাতারে নিজকে শামিল করলেন।

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا.

"আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দেব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে ঃ আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা

নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব ? তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ? তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই, অতঃপর যালেমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি।" –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭-৯৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ
بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ.

"এবং তারা বলে, কিছুই নয়, এ যে স্পষ্ট যাদু। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব ? আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি ? বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র - যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের। এটাই তো প্রতিফল দিবস। (বলা হবে,) এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত আল্লাহ্ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।" –সূরা সাফফাত ঃ ১৫-২৩

উক্ত সূরার অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ
فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ
الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ.

"তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল, সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব ? আল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও ?

অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যে আমলদারদের আমল করা উচিত।" –সূরা সাফফাত ঃ ৫১-৬১

এ পর্যন্ত দেওয়ানবাগী সাহেবের বিকৃতিসমূহের একটিমাত্র নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাঝে একই সাথে তিনটি মৌলিক কুফরী চিন্তাধারা বিদ্যমান। **জাহান্নামের বিকৃতি (আর কোন বস্তুর মূলতত্ত্বে বিকৃতি সাধন করা মূল বিষয়টি অস্বীকারেরই নামান্তর), জাহান্নামের আগুনের অস্বীকার এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অস্বীকার।**

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অস্বীকার করার অর্থ জান্নাত, আমলনামা, মীযান, পুলসিরাত ও হাশর-নশর ইত্যাদি অস্বীকার করা এবং ঘটনাও তাই। তাঁরা উক্ত পুস্তকের ৪০, ১২৮, ৫৭, ৬১ ও ৫৫ নং পৃষ্ঠাসমূহে সে সবের মূলতত্ত্বসমূহে বিকৃতি সাধন করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন। যদিও কতক স্থানে বিকৃতিকে গোপন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এ সম্পর্কে সামনে আরো ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করব ইন্‌শাআল্লাহ্।

যাহোক, ইসলামের মূলতত্ত্ব ও পরিভাষাসমূহে তাঁদের বিকৃতি সাধনের ফিরিস্তী অনেক লম্বা যার আরো কিছু ব্যাখ্যা সামনে করব ইনশাআল্লাহ্। এখন তাঁর তথাকথিত মুহাম্মাদী ইসলামের নকশা প্রদান করছি। তাঁর মুহাম্মাদী ইসলামের আসল ভিত্তিই হল বিকৃতির উপর।

২. উক্ত তাহরীফ তথা বিকৃতি সাধন ও ধর্মদ্রোহিতাকে ঢাকার জন্যে বাতেনী ফেরকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। বাতেনীদের বক্তব্য হলঃ কুরআন মাজীদের যে ব্যাখ্যা নবী ও সাহাবী যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভিত্তিতে স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের তাহরীফকৃত অর্থই আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য। এই চিন্তাধারা ও মতবাদের নাম বাতেনিয়্যাত, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমা মতে নিকৃষ্টতম কুফরী মতবাদ।

এই মতবাদের সারমর্ম হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি! পারেনি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বুঝতে!!

অথচ আল্লাহ তা'আলাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই তাঁকে কুরআনের অর্থ বুঝিয়েছেন। সুতরাং, যদি স্বয়ং নবীই কুরআনের উদ্দেশ্য না বুঝে থাকেন, তাহলে তার স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলাই নিজের কালামের উদ্দেশ্য বুঝেননি!! শুধু মুলহিদ ও ধর্মদ্রোহীরাই কুরআনের উদ্দেশ্য বুঝেছে! (এ মতবাদ কুফরী হওয়া সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা আমাদের পুস্তকের ১৭১-১৮৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।)

দেওয়ানবাগী সাহেব এবং তাঁর অনুসারীরা সেসব কুফরীকে 'মুহম্মাদী ইসলাম'-এর নামে পুনর্জীবন দান করছেন। বাতেনীদের নিকৃষ্টতম কুফরী প্রচার-প্রসারে দেওয়ানবাগী সাহেব কতটুকু অবদান রেখেছেন, সে বিবরণ তাঁর তাহরীফ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর পুস্তক থেকেই প্রদান করব ইনশাআল্লাহ্।

৩. বেদ্বীন সূফীদের এক জামাআত এ কুফরীর প্রবক্তা ছিল যে, কুরআন-হাদীসের ইল্ম হল পুঁথিগত ইল্ম, আসল ইল্ম হল ক্বলবের ইল্ম (কাশফ ও ইলহাম)। ক্বলবের ইল্ম যার হাছিল আছে, তার আর কুরআন-হাদীসের ইল্মের কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তার আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাধ্যম বানানোর দরকার নেই; যার অন্তরে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পয়গাম অবতীর্ণ হয়, তার আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাধ্যম বানানোর কি প্রয়োজন ?! বরং রিয়াযত-মুজাহাদা (সাধনা) দ্বারা যে বেলায়াত তথা ওলী হওয়ার স্তর অর্জিত হয়, এটাও আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের স্বতন্ত্র পথ, এখানে রাসূলকে মাধ্যম বানানোর কোন যরূরতই নেই। এই জন্যে তাঁদের মতে কুরআন-হাদীসের ইল্ম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আজ পর্যন্ত উম্মতের মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, তা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অন্যকে শিক্ষাদান করা অহেতুক কাজ, বরং তাঁদের নিকট আসল কাজ হল রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে অন্তরকে পয়গামে ইলাহী অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী করে তোলা, অতঃপর সকল মাসআলা ও সমস্যা কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের ইল্ম দ্বারা সমাধান না করে সরাসরি ক্বলবের মাধ্যমে সমাধা করা। নাউযুবিল্লাহ!

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ মতবাদে সরাসরি রিসালাতকে অস্বীকার করা হয়েছে, রয়েছে এতে কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের অস্বীকৃতি। সাথে সাথে কাশ্ফ ও ইল্হামকে ওহীর মর্যাদা দান করার মত মৌলিক কুফরী আকীদাও বিদ্যমান রয়েছে।

নিশ্চিত জানুন যে, দেওয়ানবাগী সাহেব ঠিক এসব মতবাদ ও চিন্তাধারাই রাখেন এবং মানুষকে সেদিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই তিনি স্বীয় মুরীদদেরকে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করার পরিবর্তে ক্বলব জারি করে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতঃ সকল মাসআলা ও সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন ঃ

"সমাজের মানুষ স্বীকার করুক আর নাই করুক তথাপি একথা সত্যি যে, মানুষের পক্ষে সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং শুদ্ধভাবে ধর্মকর্ম করতে চাইলে মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলতে হবে।

তাই আমাদের এখানে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকি। আপনি যদি এ পদ্ধতি বাস্তবে অনুশীলন করতে পারেন তাহলে এক সময় অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাথে আপনার যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনি সংবাদ পেতে শুরু করবেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করার উপায় বা মাধ্যম হচ্ছে তিনটি। যথাঃএলহাম, কাশ্‌ফ ও ফায়েজ।"-ধর্মীয় সংস্কারঃ ৩২৮

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন ঃ

"যারা জাকের তারা জানেন, আমার কাছে যত জটিল নালিশ দেন না কেন, আমি বলে দিই–একটি মান্নত করেন। মসিবতটি আপনার কাছে যত কঠিন মনে হয় সেই পরিমানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটি মান্নত করে তাঁর সাহায্য চান। আল্লাহ্ যদি দয়া করে মসিবত দূর করে দেন, আপনার বিপদ যদি দূর হয় তারপর দরবারে এসে মান্নত আদায় করে যাবেন। এরকম বলার পেছনে আরো অনেক কারণ আছে - মসিবত দূর করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা যারা তরীকা নিয়েছেন, যাদেরকে ক্বালব দেখিয়ে দিয়েছি, যাদের ক্বালবে জ্বিকির জারী হয়, হাদীস মোতাবেক তারা মোমেন, কুরআনের পরিভাষায় তারা ঈমানদার। যার ক্বালবে জ্বিকির জারী আছে আল্লাহ্‌র ভাষায় সে মোমেন বা ঈমানদার। সুতরাং আমি আপনাদেরকে শিক্ষা দিই কিভাবে

ক্বালবে জ্বিকির জারী হবে। আল্লাহ্‌ বলেন, 'আল্লাহ্‌ ওয়ালিউল্লাজিনা আমানু - অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। যিনি মোমেন হতে পেরেছেন, আল্লাহ্‌ তার গার্জিয়ান হয়ে গেছেন। মোমেন তার অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করুক এটাই আমি চাই। তাই আমি এভাবে শিক্ষা দিই।'

"মসিবতের সমাধান খুঁজে পাবার পদ্ধতিকে সল্যবের মধ্যে সীমিত না রেখে, যাদেরকে সবক দিয়েছি তাদেরকে বলি মানতের পরিমাণ আপনিই ঠিক করে নিন। এর অর্থ, আপনাকে মোরাকাবায় বসে ক্বালবে খেয়াল করে, দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ক্বালবে খেয়াল করে আপন শায়খের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ করে জানতে চান- আপনার এ সমস্যার সমধান কি হবে। আপনি গভীরভাবে ক্বলবে খেয়াল করে মোর্শেদের মাধ্যমে কাকুতি মিনতি করুন, গভীরভাবে খেয়াল করে আজীজি করতে থাকুন, হয়তো আপনার হৃদয় থেকে ভেসে আসবে, এ সমস্যার এই সমাধান। আরো গভীরভাবে যদি খেয়াল করেন, হয়তো আপনার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠবে, ইঙ্গিত দেবে-এটা এই হবে। কিছু না কিছু আপনাকে বলবেই। তাই কিছু না বলা পর্যন্ত একাগ্রতার সাথে আপনি মোরাকাবায় অপেক্ষা করেত থাকুন।

"আমি চাই-আপনাকে যে ক্বলব দেখিয়ে দিয়েছি, আপনার সেই লতিফা সক্রিয় হতে হবে, আপনার ক্বলব চলতে হবে। তরীকা বা আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি আমি শিখে বসে থাকলে আপনার কোন লাভ নেই, তরীকা আপনার হৃদয়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনার ক্বলব যখন চালু হবে, সমস্যায় পড়ে আপনার বিপদের জন্যে যখন ক্বলবে গভীরভাবে খেয়াল করতে থাকবেন, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আপনার হৃদয়ে সংবাদ ভেসে আসবে, এই সমস্যার এই সমাধান। এ ভাবে ক্বলবের মাধ্যমে আপনি যোগাযোগের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। পরে দেখবেন ধীরে ধীরে শান্তি পাচ্ছেন, কেননা আপনি শিখে নিয়েছেন- কি ভাবে সমস্যার জন্যে মোরাকাবায় বসলে সমাধান পাওয়া যায়। এভাবে কিছু সময় আপনাকে খাটতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে, ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে হবে।

ক্বালবে জ্বিকির জারী হবে। আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজিনা আমানু - অর্থাৎ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। যিনি মোমেন হতে পেরেছেন, আল্লাহ্ তার গার্জিয়ান হয়ে গেছেন। মোমেন তার অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করুক এটাই আমি চাই। তাই আমি এভাবে শিক্ষা দিই।'

"মসিবতের সমাধান খুঁজে পাবার পদ্ধতিকে সল্বের মধ্যে সীমিত না রেখে, যাদেরকে সবক দিয়েছি তাদেরকে বলি মানতের পরিমাণ আপনিই ঠিক করে নিন। এর অর্থ, আপনাকে মোরাকাবায় বসে ক্বালবে খেয়াল করে, দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ক্বালবে খেয়াল করে আপন শায়খের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ করে জানতে চান- আপনার এ সমস্যার সমধান কি হবে। আপনি গভীরভাবে ক্বলবে খেয়াল করে মোর্শেদের মাধ্যমে কাকুতি মিনতি করুন, গভীরভাবে খেয়াল করে আজীজি করতে থাকুন, হয়তো আপনার হৃদয় থেকে ভেসে আসবে, এ সমস্যার এই সমাধান। আরো গভীরভাবে যদি খেয়াল করেন, হয়তো আপনার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠবে, ইঙ্গিত দেবে-এটা এই হবে। কিছু না কিছু আপনাকে বলবেই। তাই কিছু না বলা পর্যন্ত একাগ্রতার সাথে আপনি মোরাকাবায় অপেক্ষা করেত থাকুন।

"আমি চাই-আপনাকে যে ক্বলব দেখিয়ে দিয়েছি, আপনার সেই লতিফা সক্রিয় হতে হবে, আপনার ক্বলব চলতে হবে। তরীকা বা আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি আমি শিখে বসে থাকলে আপনার কোন লাভ নেই, তরীকা আপনার হৃদয়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনার ক্বলব যখন চালু হবে, সমস্যায় পড়ে আপনার বিপদের জন্যে যখন ক্বলবে গভীরভাবে খেয়াল করতে থাকবেন, তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে আপনার হৃদয়ে সংবাদ ভেসে আসবে, এই সমস্যার এই সমাধান। এ ভাবে ক্বলবের মাধ্যমে আপনি যোগাযোগের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। পরে দেখবেন ধীরে ধীরে শান্তি পাচ্ছেন, কেননা আপনি শিখে নিয়েছেন- কি ভাবে সমস্যার জন্যে মোরাকাবায় বসলে সমাধান পাওয়া যায়। এভাবে কিছু সময় আপনাকে খাটতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে, ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে হবে।

"আমি পূর্বে একথা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার কাছে সংবাদ পৌছার মাধ্যম হচ্ছে তিনটি- কাশফ, এলহাম ও ফায়েজ। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় এ তিনটি মাধ্যমের কোন একটি দ্বারা আল্লাহ্‌র সংবাদ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এছাড়াও ঘুমন্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার যোগাযোগ হতে পারে, বান্দা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেতে পারে স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নের মাধ্যমে নবীগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র সংবাদ লাভের ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সবচেয়ে প্রিয়বস্তু আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন স্বপ্নের মাধ্যমে। এছাড়া হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভবিষ্যত জীবনের উচ্চ মর্যাদা লাভের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে।'

"যার আত্মা যত বেশী পরিশুদ্ধ তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে তত পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) - এর জীবনী থেকে জানা যায় - অহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী লাভের পূর্বে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে সংবাদ অবগত হতেন। আগের রাতে দেখা স্বপ্ন পরদিন হুবহু তাঁর জীবনে ঘটে যেত। স্বপ্নের মাধ্যমে সংবাদ লাভ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নবীজী বলেছেন - ধার্মিকগণের স্বপ্ন হলো পয়গম্বরীর ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফ, এলহাম কিংবা ফায়েজের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্‌র সংবাদ পেতে পারে, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমেও তেমনি আল্লাহ্‌র সংবাদ পাওয়া সম্ভব। আমি আপনাদের কাছে বিস্তারিত আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'আমি চাই বান্দা আল্লাহ্‌কে চিনুক, আল্লাহ্‌র সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হোক। আল্লাহ্ তো বান্দা থেকে দূরে নন, তিনি অতি নিকটে।

"আপনাদেরকে পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার পরও অনেকে এসে আমাকে অনুরোধ করেন মানতের পরিমাণ বলে দেয়ার জন্যে। তখন আমি খুব বিরক্তি বোধ করি। জ্ঞান অর্জন করে এগুতে হলে আপনার পড়া আপনাকেই অনুশীলন করতে হবে। আমি পড়ে দিলে আপনার অগ্রগতি হবে না। ঐ জ্ঞান নিজে অর্জন করেই তারপর শিক্ষকতার দায়িত্বে এসেছি।"

"সুতরাং আপনার ভেতরে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি চালু করার জন্যে বলি যে, নিজের থেকে মানত করে নিন। একবারে যদি না পারেন, চেষ্টা করতে থাকুন, নিজের মধ্যে যোগাযোগ অর্থাৎ- হৃদয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দয়া আপনার কাছে চলে আসবে। যোগাযোগের এমন এক পদ্ধতি চালু হবে, যে যোগাযোগ দীর্ঘ দিন যাবত বন্ধ ছিল। সমাজের মুসলমান মনে করে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয়, হযরত রাসূল (সঃ) পর্যন্ত এই যোগাযোগ শেষ। হযরত রাসূল (সঃ)-এর পর যেহেতু আর নবী হবেন না, তাই আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগও হবে না। কথাটা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়। যেহেতু হযরত রাসূল (সঃ)-এর উম্মতগণের মধ্যে যারা হযরত রাসূল (সঃ)-এর ক্বলবী বিদ্যায় বিদ্বান তাঁরা বনী ইসরাঈলের নবীর সমান মর্যাদার অধিকারী, তাঁদের সাথে আল্লাহ্‌র যোগাযোগ হবে না, এ কথা সত্য নয়। যাঁরা নায়েবে রাসূল, তাঁদের সাথে আল্লাহ্‌র ও রাসূল (সঃ)-এর যোগাযোগ হওয়াটাই স্বভাবিক। **আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের একমাত্র ইন্দ্রিয় হলো আপন ক্বলব বা হৃদয়। জ্বিকির জারি করে নির্জনে বসে গভীরভাবে ক্বলবে খেয়াল করুন, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্বলবে সংবাদ পেতে শুরু করবেন।"** ধর্মীয় সংস্কার ঃ ৩২৯-৩৩১

এ আলোচনাতেই তিনি আরো ব্যাখ্যার সাথে বলেন ঃ

"প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ করতে শিখুক-আমি সেটাই চাই। হযরত রাসূল (সঃ) বর্বর আরব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া যায়, কিভাবে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়, কিভাবে আদর্শ মানুষ হওয়া যায়-এ বিষয়গুলো। আমাদের মাঝে এখন সে শিক্ষা নেই। তাই চেষ্টা করবেন ক্বালবের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ পদ্ধতি আয়ত্ব করে নিতে। আপনার সমস্যার সমাধান আমার কাছে জানতে চাওয়া ঠিক নয়। আমি পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি, **সে পথে চেষ্টা করে আপনি জেনে নিন, আল্লহ্‌র পক্ষ থেকে এর সমাধান কি। তাহলে আপনারই লাভ হবে। যে কোন সময় যে কোন সমস্যায় পড়ে, এ**

পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আল্লাহ্‌র সাহায্য পেতে পারবেন। আপনি নিজে পদ্ধতি শিখে নিলে বেশী ভালো না আমি একলা শিখে বসে থাকলে ভালো? আমার মোর্শেদ যোগাযোগের এ পদ্ধতি আমাকে শিখিয়েছেন। আপনাদের সমস্যার সমাধান যদি আমিই বলে দেবো তাহলে আপনারা কি শিখলেন? সুতরাং যোগাযোগের এই সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি আপনারাও শিখে নিন।" –ধর্মীয় সংস্কার ঃ ৩৩২

দেওয়ানবাগী সাহেবের কথাগুলোর প্রতি একটু চিন্তা করে দেখুন! ১

সকল ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। যোগাযোগ ও সম্পর্কের পর ক্বশ্‌বে আল্লাহ্ তা'আলার সংবাদ অবতীর্ণ হবে। অতঃপর সে মোতাবেক আমল করার কথা বলেছেন।

অথচ মুসলমান মাত্রই জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একমাত্র নবীদের প্রতি সংবাদ বা ওহী আসত আর অন্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন নবীদের থেকে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্যে তিনিই রাসূল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সকলের উপর ফরয এবং তাঁর শিক্ষা মোতাবেক আমল করা নাজাত লাভের একমাত্র উপায়।

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায় হল রাসূলের রেখে যাওয়া শিক্ষা অর্জন করা এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা।

কিন্তু দেওয়ানবাগী সাহেব আজ মানুষকে কুরআন-হাদীস ও ফিক্‌হ্ শিক্ষা অর্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (মিথ্যা) সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে কাশ্‌ফ, ইল্‌হাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে দ্বীনী-দুনিয়াবী সকল সমস্যা সমাধান করতে বলছেন। এটা কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞানার্জন থেকে মানুষকে দূরে রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়!

আমরা এই কিতাবের ১৪২–১৪৮ নংপৃষ্ঠায় কাশ্‌ফ, ইল্‌হাম ও স্বপ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কুরআন-হাদীসের আলোকে সেখানে লেখা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো কাশ্‌ফ, ইল্‌হাম ও স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়। অবশ্য সে মোতাবেক শরীয়তের দলীল বিদ্যমান থাকলে তাকে সত্য বলে

১. স্পষ্টতঃ যে, উক্ত কথাগুলো হুবহু দেওয়ানবাগী সাহেবের। রচনা পরিষদ এগুলো তাঁর কথা হিসেবেই উদ্ধৃতি চিহ্নের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

গণ্য করা হবে। আর তদানুযায়ী আমল করা মূলতঃ শরীয়তের সে দলীল মোতাবেকই আমল করা হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ত না, সে স্বপ্নে দেখল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন অথবা তার কাশ্ফ হল যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে রমযান মাসের রোযা রাখার কথা বলছেন।

সুতরাং, যে বিষয়টি শরীয়তের দলীল নয় সে দিকে দেওয়ানবাগী সাহেব কিভাবে মুসলমানদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। আখের তাঁর উদ্দেশ্য কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী, তাবেঈ কিংবা কোন ইমাম কি মুসলমানদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের বিধানাবলীর [illegible]র্জনের পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অন্তরে ওহী ও সংবাদ অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে কোন ওযীফা বাতিয়েছিলেন ?

দেওয়ানবগী সাহেবের ফর্মূলা মোতাবেক যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি আল্লাহ তা'আলার ওহী ও সংবাদ লাভে সক্ষম হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিলের এই পরম্পরা কেন জারি রাখলেন ? অতঃপর সমগ্র দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্যে এই দ্বীন-ইসলাম, এই পয়গাম্বর এবং এই কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণকে কেন অপরিহার্য করলেন ? প্রত্যেকের উপর ইলমে দ্বীন অর্জন করাকে কেন ফরয করলেন ? প্রত্যেককে তার উপর অবতীর্ণ ওহী ও সংবাদ মোতাবেক আমল করার নির্দেশ দিলেন না কেন?

দেওয়ানবাগী সাহেব ভালভাবেই জানেন যে, কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে অথবা পয়গাম্বরদের মধ্যস্ততা ব্যতীত যে ব্যক্তি ওহী ও সংবাদ অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে রিয়াযত ও মুজাহাদা করে তার উপর কার ওহী নাযিল হয় ? কার সাথে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় ?

দেওয়ানবাগী সাহেব কি কুরআন কারীমের এই আয়াত পড়েননি ?

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ .

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।" –সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬-৩৭

এ আয়াতে "যিক্‌রে রাহমান" দ্বারা এই কুরআন মাজীদ এবং তার ব্যাখ্যা সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা শয়তান নিযুক্ত করে দেন, সে-ই তার সঙ্গে থাকে। তাহলে এমন ব্যক্তির উপর শয়তান ছাড়া আর কার ওহী সংবাদ অবতীর্ণ হবে?

* অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

"নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে।" -সূরা আনআম ঃ ১২১

কিন্তু সমস্যা হল যে, মুজরেমদের আদি আদত ঃ তারা শয়তানের বাণীকে আল্লাহ তা'আলার বাণী সাব্যস্ত করে থাকে।

ভাববার বিষয় যে! দেওয়ানবাগী সাহেব ওহীর ইল্‌ম কুরআন ও সুন্নত এবং তা থেকে উৎসারিত ইসলামী ফিক্‌হ বর্জন পূর্বক কাশ্‌ফ ইল্‌হাম ও স্বপ্নের দিকে মানুষকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? উত্তর অতি স্পষ্ট যে, দেওয়ানবাগীর নিকট ইল্‌হাম ওহীর মান রাখে এবং ইল্‌হামকে ওহীর বিকল্প মনে করার কারণেই তিনি এমনটি করছেন।

"আল্লাহ্ কোন্ পথে" শীর্ষক গ্রন্থে 'লওহে মাহফূয' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন ঃ

> "হযরত রাসূল (সঃ) জাবালে নূরের হেরা গুহায় একাধারে ১৫ বছর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে ক্বদরের রজনীতে নিজের হৃদয়ের ৭ম স্তরে সংরক্ষিত সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত ঘটনাবলী অবগত হয়েছিলেন বিধায় বলা হয়েছে, ক্বদরের রজনীতে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বেলায়েতের যুগেও যিনি ধ্যান সাধনার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের ৭ম স্তরে সংরক্ষিত সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত ঘটনাবলী অবগত হয়ে থাকেন, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ আসতে পারে।
>
> "পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট (কিতাবুম মুবিন) বলতে-লাওহে মাহ্‌ফুজকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি

জীবের জীবন-ধারণ ও ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়সহ সমস্ত বিষয়াদি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

"পবিত্র কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী। মানুষের ক্বলবের ৭ম স্তরে আল্লাহ্‌র নূর সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। সাধনার মাধ্যমে ঐ নূর জাগ্রত করে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলে আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ আপন ক্বালবের ৭ম স্তর থেকেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। ক্বালব থেকে প্রাপ্ত এরূপ বাণীসমূহ সুস্পষ্ট অর্থাৎ সরাসরি লব্ধ।

লাওহে মাহফূজে কুরআন সংরক্ষিত একথার অর্থ পবিত্র ক্বালবের ৭ম স্তরে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত বাণীসমূহ সাধনার মাধ্যমে প্রয়োজন মত আল্লাহ্‌র এই বাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন নবী রাসূলগণ এ বাণী পেয়েছেন।"

– আল্লাহ্ কোন্ পথে?ঃ ১৩৩-১৩৪

উক্ত পুস্তকের ১০৫-১০৬ নং পৃষ্ঠায় 'ওহী কি? নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো নিকট ওহী আসতে পারে কি?" শিরোনামে তাঁরা আরো লেখেন ঃ

"আল্লাহ্ প্রাপ্ত সাধকগণ, তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা নিজের মাঝে ওহী ও এলহাম প্রাপ্তির অপূর্ব মিল খুঁজে পান। তাঁদের মতে- মহামানবদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উদ্ভাসিত সংবাদকে 'ওহী' বা এলহাম বলা হয়।

হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর মায়ের নিকটে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর ব্যাপারে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মায়ের নিকটেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনই ওহী বা প্রত্যাদেশ এসে ছিলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মৌমাছিদের প্রতিও নির্দেশ আসার বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

---

১. এক হল আভিধানিক অর্থে ওহী। অর্থাৎ আকল ও বুঝ শক্তি দান করা। এ অর্থে ওহী মৌমাছির প্রতিও হতে পারে এবং কাফের মুশরেক সকল মানুষের প্রতিই এ প্রকার ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের ইলহাম করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" –সূরা শামস ঃ ৭-১০ (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"আসলে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে গোপনে বার্তা এসে থাকে। যেমন–কোন ব্যক্তির মনে হঠাৎ একথা উদয় হলো যে, তার কোন বন্ধু বা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে টেলিফোন বা পত্র আসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়–তার মনে যে কল্পনার উদ্ভব হয়েছে, তা বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে টেলিপ্যাথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। **মূলতঃ মানুষের রূহ বা পরমাত্মা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় তার কাছে সব বিষয়ের খবরাখবর মওজুদ থাকে**। অথচ জীবাত্মা এ সবের কিছুই জানতে পারে না। অর্থাৎ-রিপুসমূহের কারণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে দূরত্ব বিরাজ করে, যা কঠিন পদার্থের মত আবরণ সৃষ্টি করে রাখে। ফলে পরমাত্মার জানা বিষয়গুলি সম্পর্কে জীবাত্মা মোটেই ওয়াকেফহাল থাকে না।

"সাধনার দ্বারা জীবাত্মার কু-রিপুসমূহ দূর করতে পারলে পরমাত্মার সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে, তখন **পরমাত্মা থেকে যে কোন গোপন খবর জীবাত্মার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়**। জীবাত্মা কর্তৃক পাওয়া এরূপ গোপন খবরকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'এলহাম' বলে। জীবাত্মা সাধানার দ্বারা যখন এলহাম লাভের উপযুক্ত হয় তখন উহাই নফসে মুলহেমায় পরিণত হয়।

যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা নিজের জীবাত্মাকে নফসে মুলহেমার স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়, **তাঁর কাছে পরমাত্মা তথা আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রত্যাদেশ এসে থাকে।**"

– আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ১০৫-১০৬

এখন দেখুন, দেওয়ানবাগী সাহেবের নিকট ইল্হামের মর্যাদা কোন পর্যায়ে ? তাঁর মতে সকলের ইল্হামই ওহীর এক প্রকার বিশেষ। এ আলোচনায় তিনি পরোক্ষভাবে একথাটিও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও

নবী রাসূলদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়, সে পারিভাষিক ওহীর সাথে পূর্বোক্ত ওহীর দূরবর্তী সম্পর্কও নেই এবং এ প্রকার ওহী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং তার দ্বারা দ্বীনী সমস্যার সমাধানের কথাই আসতে পারে না। বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু দেওয়ানবাগী সাহেব নিজেকে পারিভাষিক অর্থে ওহীওয়ালা বানানোর জন্যে শরীয়তের এরূপ মৌলিক পরিভাষাতেও **বিকৃতি** সাধন করেছেন।–লেখক

রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে নবুওয়ত লাভ করেছেন। অথচ দ্বীনের অকাট্য আকীদা যা প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, নবুওয়ত অর্জন করার বস্তু নয়; বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের বস্তু।

আর তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী লাওহে মাহ্ফূয হল আল্লাহ তাআলার সেই বাণী যা মুমিনের মধ্যে মওজূদ আছে। রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে তাকে অন্তরে উদ্ভব হয়।

চিন্তা করে দেখুন! বিদআতি রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জিত শয়তানী চিন্তাধারাকে কিভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার ওহী সাব্যস্ত করছেন ? এবং কিভাবে তা কুরআনের মানে অধিষ্ঠিত করছেন ?

কাদিয়ানীরা শুধু এক মুতানাব্বীর প্রতি ঈমান রাখার কারণে কাফের হয়েছে, এখন দেওয়ানবাগী সাহেব তো প্রত্যেককেই শুধু রিয়াযত মুজাহাদার (তাও অতি সামান্য যার বিবরণ ২৫৪–২৫৬ নং পৃষ্ঠায় তাঁরই উদ্ধৃতিতে প্রদান করা হয়েছে) মাধ্যমে ওহী ও লওহে মাহফূয ওয়ালা বানাচ্ছেন। এরপর মানুষের আর কুরআন, সুন্নাহ অথবা শরীয়তের অনুসরণের কি প্রয়োজন ? সকলেই তো নবী রাসূলগণের ন্যায় স্বতন্ত্র ওহী ওয়ালা!

শুধু এতটুকুই নয় বরং দেওয়ানবাগী সাহেবের ফর্মূলা মোতাবেক আমলকারীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার সাথে যাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ওহী, সংবাদ অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তারা আম্বিয়া (আঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ। কেননা, দেওয়ানবাগী সাহেবের কথা অনুযায়ী তারা যখন ইচ্ছা তখনই নিজ অন্তরে আল্লাহ তাআলার ওহী, সংবাদ অবতীর্ণ করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তারা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। (ধর্মীয় সংস্কার ঃ ৩২২-৩২৪)

কিন্তু নবী-রাসূল সম্পর্কে কুরআন হাদীসে স্পষ্ট একথা আছে যে, ওহী তাদের কর্তৃত্বে ছিল না। ওহীর প্রয়োজন ক্ষেত্রেও তারা ইচ্ছা মাফিক ওহী লাভ করতে পারতেন না। বরং তাঁরা ওহীর অপেক্ষা করতে থাকতেন, যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হত, তখনই শুধু ওহী আসত। (সহীহ বুখারী ঃ ২/৬৯৬, হাদীস ৪৭৫০, তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ৩/১৪৪-১৪৫)

মোটকথা, কুরআন হাদীস, শরীয়ত ও সুন্নাত এবং নবুওয়াত ও রিসালত ইত্যাদি সবকিছু অস্বীকার করাই তাঁদের মূল কাজ।

কিন্তু এগুলো সরাসরি অস্বীকার করলে, ওহীর এলম অস্বীকার এবং খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করলে, কে তাঁকে পীর মানবে ? কে তাকে মোটা অংকের

হাদিয়া দিবে। কে-ই বা তাঁর দরবারে মান্নত পেশ করবে ? মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে তিনি বারবার কুরআন হাদীস এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাম নিয়ে থাকেন।

৪. রিসালাত ও শরীয়ত অস্বীকার করা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে আখেরাত স্বীকার করে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে যার বিশ্বাস নেই। বাস্তবও তাই, দেওয়ানবাগী সাহেব এবং তাঁর অনুসারীরা পুনরুত্থান অস্বীকার করে এবং হিন্দুদের ন্যায় পরজন্মায় বিশ্বাসী।

তাই তাঁরা 'আল্লাহ কোন পথে?' নামক গ্রন্থের ৭০নং পৃষ্ঠায় "পুনরুত্থান বলতে কি বুঝায় ? উহা কখন এবং কিভাবে হবে ?" শীর্ষক শিরোনামে লেখেন ঃ

> "পুনরুত্থান বলতে পুনরায় উত্থিত হওয়া বা উঠাকে বুঝায়। প্রচলিত ধারণা মতে—পুনরুত্থান বলতে মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবন লাভ করাকে বুঝায়।"

তারপর তাঁরা পুনরুত্থান সম্পর্কিত বহু আয়াত অনুবাদসহ উল্লেখ করেন। তাতে পুনরুত্থানের ঐ ব্যাখ্যাই প্রদান করা হয়েছে, যাকে তিনি 'প্রচলিত ধারণা' বলে ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর এ আকীদা সম্পর্কে দু'টি হাদীস উল্লেখ করে বলেন ঃ

> "পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে ৩টি বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী, দ্বিতীয়তঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পদ্ধতি দুনিয়াতে প্রথম পয়দা হওয়ার পদ্ধতির অনুরূপ, তৃতীয়তঃ পুনরুজ্জীতি অবস্থার আকৃতি জীবনের আসক্তি, খাছলত বা কর্মানুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে আকৃতি ধারণা করে পুনরুজ্জীবন লাভ করা সম্ভব।" —আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ৭৬

তাঁরা আরো বলেন ঃ

> "মানুষের দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। দেহ স্থূল জগতের কিন্তু আত্মা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জগতের। দেহে অবস্থানের মাধ্যমে আত্মার উন্নতি ও অবনতি লাভ হয়ে থাকে। মানুষের জীবদ্দশায় কৃত পুণ্য-কিংবা পাপ কর্মের ফলে যথাক্রমে আত্মার এই উন্নতি কিংবা অবনতি ঘটে। নেক আমলের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করে আল্লাহ্তে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত দেহ ধারণ করা আত্মার অত্যাবশ্যক। যেমন কোন ছাত্র জ্ঞানার্জনের জন্য যথাক্রমে প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত

অধ্যায়ন করে থাকে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে বিদ্যার্জনের সব ক'টি স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে।"

"অনুরূপভাবে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পর আত্মার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুনরায় আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা। এজন্য যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনার পথে কোন বাহন আত্মার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে পুনরায় নতুন বাহন ধারণ করে তাকে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হয়। পুনরুত্থানের প্রক্রিয়ায় সাধনার অগ্রগতি অনুযায়ী আত্মা উন্নত স্তরের বাহন লাভ করে থাকে। একইভাবে যার সাধনা বিহীন জীবন তার শাস্তিপ্রাপ্ত আত্মা পুনরুত্থানের মাধ্যমে নিকৃষ্ট বাহন লাভ করে অনন্তকাল ব্যাপী আযাব ভোগ করতে থাকে। অর্থাৎ-আল্লাহর নৈকট্য লাভ তার ভাগ্যে আর হয় না। এভাবেই মানুষ জীবন মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। আল্লাহ্তে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত।"

"সূফী সাধকগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার বাস্তবতা খুঁজতে গিয়ে মানব জীবনে এর যে সুন্দর মিল খুঁজে পান, তা হলো আল্লাহ্তে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আত্মার জন্য স্থূল দেহ বাহন স্বরূপ, বাহন ব্যতীত আত্মার উন্নতি অবনতি কিংবা শাস্তি বা মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যুর ফলে আত্মা স্থানান্তরিত হয় এবং কর্ম অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়। কর্মানুযায়ী উন্নত ও অনুন্নত আত্মার বাহনে আরোহণ করে যে জীবন লাভ করে, তাকে পুনরুত্থান বলে। এভাবেই মানুষের পুনরুত্থান হবে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে।" —আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ৭৮

পাঠকদের নিকট মোটা অক্ষরের বাক্যগুলো মনোযোগের সাথে বার বার পড়ার আবেদন রইল। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কিভাবে পরজন্মার আকীদাকে তাতে ঢুকানো হয়েছে!!

হিন্দুরা তো এই পরজন্মার কথাই বলে যে, ভাল মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় সুন্দর আকৃতিতে প্রকাশ পাবে আর পাপীরা খারাপ আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। এই ভাবে তার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। না কিয়ামত আছে, না আখেরাত, না হিসাব-কিতাব, না জান্নাত ও জাহান্নাম!!

দেওয়ানবাগী সাহেবও স্পষ্ট বলেছেন যে, এভাবেই মানুষ জীবন মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে–আল্লাহতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত। আর তার বক্তব্য অনুযায়ী রূহ যখন আল্লাহ তাআলার মধ্যে ফানা হয়ে যাবে তখন তার মৃত্যু, হিসাব-কিতাব কিংবা পুনরুত্থান কোন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।

পরজন্মের প্রবক্তা হওয়ার অর্থ কিয়ামত, আখেরাত, হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, মীযান, আমলনামা ও জান্নাত-জাহান্নাম সব কিছুই অস্বীকার করা। দেওয়ানবাগী সাহেবের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনিও এসব বিষয় অস্বীকার করেন। এসব আকীদা ও পরিভাষা সম্পর্কিত শব্দাবলী তো তিনি স্বীকার করেন কিন্তু কুরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত সে সবের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন না। 'দেওয়ানবাগী সাহেবের দ্বীন ইসলাম বিকৃতি সাধন' শিরোনামে আমি সেগুলো ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করব ইন্‌শাআল্লাহ।

পুনরুত্থান সম্পর্কিত দেওয়ানবাগীর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা পড়ার পর "আল্লাহ কোন পথে?" পুস্তকের ভূমিকার লেখাটি পড়ুন। সেখানে আছে ঃ

> "প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করা হবে যা কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্ তাআলার যা মূল উদ্দেশ্য এবং কুরআন-হাদীসের প্রকৃত রহস্য তা পরবর্তিতে উল্লেখ করা হবে।" –১৪২-১৪৫

তাঁদের ভাষ্যানুযায়ী একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা পুনরুত্থানের আকীদার স্থলে হিন্দুদের পরজন্মায় বিশ্বাসী। আবার সাথে সাথে এ দাবীও করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসের যে যে স্থানে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ আছে, তা দ্বারা এই পরজন্মাকেই বুঝানো হয়েছে। নাঊযুবিল্লাহ!! অথচ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের দাবী আর পরজন্মায় বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ কুফরী। সুতরাং কোন কুফরী কথা কোনক্রমেই ঈমানী আকীদার ব্যাখ্যা হতে পারে না।

৫. যখন এরা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, জাহান্নামও স্বীকার করে না, সে জন্যে তাদের থেকে এ আশাও ছিল না যে, তারা কোন দ্বীন বা শরীয়তের অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করবে। কিন্তু 'আল্লাহ্ কোন পথে?'-এর ১২৬ নং পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তাদের নিকটেও নির্দিষ্ট বিধানাবলীর অনুসরণ করা অপরিহার্য। তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্মের উপর থেকেও মুসলমান থেকে উত্তম হতে পারে।

তাঁরা লেখেন ঃ

> "সুতরাং যে কোন ধর্মের লোক তার নিজস্ব অবস্থায় থেকে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর মত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে, **তাহলে নামধারী কোন মুসলমানের চেয়েও সে উত্তম।** মোট কথা, ইসলাম বা মুসলিম কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থায় থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যায়। আর যে কোন কুল থেকেই এই চরিত্র অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি হওয়া সম্ভব।" -আল্লাহ কোন পথে? ঃ ১২৬

প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগে যদিও এমন আসমানী দ্বীন অতিবাহিত হয়েছে, যেগুলো মান্যকরা স্ব স্ব যুগে অপরিহার্য ছিল এবং সে যুগে তার অনুসারীরা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশে পূর্বেকার সকল দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। এখন আখেরাতের মুক্তি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর শরীয়ত মোতাবেক আমল করার উপর নির্ভরশীল। এই স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত চলে আসা আকীদা অস্বীকার করাও তাদের কুফুরীর ভয়াবহ অবস্থা উপলব্ধির জন্যে যথেষ্ট।

৬. দেওয়ানবাগী সাহেবের তথাকথিত মুহাম্মাদী ইসলামের আরেক কুফরী হল আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে জঘণ্যতম কুফরী ধ্যান-ধারণা প্রচার ও প্রসার করা।

কোন্ বিবেকবান, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির অজানা যে, আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলী এবং কার্যাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তা'আলার মত বা সমমানের কেউ ছিল না, এখনো নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কেউ স্বীয় সত্তা ও গুণাবলী, কার্যাবলী ও ইচ্ছা শক্তিতেও তাঁর সাদৃশ বা সমকক্ষ নেই। সেই সত্তা সৃষ্টিকর্তা, অমুখাপেক্ষী, তাঁর থেকে কেউ হয়নি, তিনি কারো থেকে হননি– এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট, তিনি তো সৃষ্টিকর্তা। নিজ কুদরতে সব কিছুকে অস্তিত্বদান করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন।

তিনি মুরাককাব তথা কতিপয় অংশ বা উপাদানের সমষ্টি নন। এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। তিনি তো পুত পবিত্র সত্তা, সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি নন। তিনি নশ্বর নন,

অবিনশ্বর। তিনি সসীম নন, অসীম। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর শুরু নেই, শেষ নেই।

তিনি সময় ও স্থানেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র। তাঁর কুদরত, দয়া ও ইলম সমস্ত কায়েনাত পরিবেষ্টিত। এক অনু-পরমাণুও তাঁর কুদরত, ইল্ম ও দয়া বহির্ভূত নয়। সকল সৎগুণে তিনি গুণান্বিত, ত্রুটির সামান্য লেশমাত্রও নেই, নশ্বর ও লয় শংকামুক্ত। (সুবহানাল্লাহি আম্মা ইয়াছিফূন)

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এসব আকীদা-বিশ্বাস আকল তথা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল এবং কুরআন-হাদীসের সরাসরি বর্ণনা নির্ভরশীল। শুধু মুসলমানই নয়, বরং যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, বিবেকবান ব্যক্তিও তাতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি উপরোক্ত আকীদাসমূহের কোনটি অস্বীকার করবে, সে কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের দৃষ্টিতে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস বিষয়ক যে কোন বড় ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি দিলেই উক্ত আকীদাসমূহ আকল ও বর্ণনা ভিত্তিক দলীলাদিসহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর বিষয়টি শরীয়তে কোন ছোট খাট বিষয় নয়। এ ব্যাপারে অবহেলা ও অসতর্কতা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করার জন্যে এবং জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট। এমনকি আল্লাহ তা'আলার জন্যে যে গুণ ও বিশেষণ প্রমাণিত, শরীয়ত যদি সে বিশেষণের জন্যে কোন শব্দ নির্দিষ্ট করে থাকে, তাহলে তা পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করাও জায়েয নেই। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি কোন বাতিল কথার সম্বন্ধ করা কিংবা সৃষ্টির কোন বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ তা'আলার জন্যে প্রমাণ করা তো সরাসরি ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতা।

সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে সব উত্তম নাম, কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।" –সূরা আরাফ ঃ ১৮০

এই জন্যে ঈমানের প্রথম সবক তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তা, নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের আকীদা ঠিক না হবে, সুষ্ঠু বিবেক এবং কুরআন-হাদীসের অনুরূপ না হবে।

ক্বালবগুলো টিভি পর্দার মত ও ক্বালবের গুণাহের ময়লা সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হলে সেখানে আল্লাহর নূরের ছবি ভেসে আসে। টেলিভিশনকে সচল করলে তার পর্দায় যেমন ব্যক্তির আলোক দেহ দেখা যায়, তার কথা শোনা যায়, **তেমনি পরিশুদ্ধ ক্বালবের পর্দায় আল্লাহর নূরের চেহারা মোবারক দেখা যায়, তাঁর সাথে কথোপকথন করা যায়।'** – আল্লাহ কোন পথে?ঃ ২৪

তাঁরা আরো লেখেন ঃ

"মোটকথা কঠিন সাধনার মাধ্যমে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহকে নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্যেই অলী-আল্লাহগণের মর্যাদা এত বেশী। **আল্লাহ তাঁর বন্ধুর দেহ এবং আত্মার সাথে এমন নিবিড়ভাবে মিশে থাকেন,** যার ফলে অলী আল্লাহগণের দেহ ও আত্মা সমানভাবে পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে পড়ে।" –আল্লাহ কোন পথে?ঃ ২৮

অন্যত্র আরো লেখেন ঃ

"শুক্রকীটে অবস্থিত আল্লাহর সূক্ষ্ম শক্তি এবং ১২০ দিন বয়সে ফুঁকে দেয়া রূহ মানব শিশুর ক্বালবে প্রকাশ লাভ করে। **সর্বশেষ (অর্থাৎ-ষষ্ঠ) পূর্ণাঙ্গ স্তরে ঐ মানব শিশুই আল্লাহর সত্তা ক্বালবে ধারণ করে নিয়ে মাতৃগর্ভ হতে দুনিয়াতে আগমন করে। 'পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পন্ন করার পর আল্লাহ আরশে সমাসীন হন'–পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা মানব শিশুর ক্বালব আল্লাহর অবস্থানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"** –আল্লাহ কোন পথে? ঃ ৮৫

একস্থানে একথাও লেখেছেন যে ঃ

"প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর সত্তা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। যিনি সাধনার মাধ্যমে নিজের মাঝে সেই সত্তাকে জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর হৃদয়ই আল্লাহর আরশে পরিণত হয়।

আল্লাহর সংবিধানে সমগ্র সৃষ্টি জগত পরিচালিত হচ্ছে সূক্ষ্ম মহাশক্তির ফায়েজের দ্বারা। এজন্যেই বলা হয়, আল্লাহর কুরছি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল ব্যাপী। যেমন– কোন রাজা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রাজ প্রাসাদে থাকেন অথচ তাঁর হুকুমে সমগ্র রাজ্য

পরিচালিত হয়। তাই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজ প্রাসাদে যেতে হয়, তেমনি আল্লাহর সন্ধান পেতে হলে আল্লাহকে হৃদয়ে ধারণকারী মু'মেন তথা অলী-আল্লাহ্গণের নিকট যেতে হয়।"- আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ৩৬

উক্ত কিতাবের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ

" পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"মানুষ কেমন করে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়, যখন তোমরা মৃত ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু দেয়া হবে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। অতঃপর তোমরা তাঁর দিকেই প্রর্তাবর্তন করবে"

–সূরা বাকারাঃ ২৮

উপরোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, **আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি মানুষ সাধনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে পুনরায় মিলিত হতে না পারবে, ততক্ষণ সে** চিরমুক্তি লাভ করবে না। আল্লাহ্প্রাপ্ত সাধকদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষনে 'ফানা' সূফীদের সাধনায় একটি অতি উচুঁ স্তরের নাম। **যে স্তরে সঠিক গভীর সাধনার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহ্তে বিলীন করে দিয়ে একাকার হয়ে আল্লাহ্র গুণে গুণী হতে সক্ষম, উহাকে ফানাফিল্লাহ বলে।"** -আল্লাহ্ কোন পথে ২ ঃ ১৬৪

উক্ত পুস্তকের ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় তাঁরা আবার লেখেন ঃ

"জ্বীন মানুষের উপর ভর করে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে যায়। তখন মানুষের মুখ ব্যবহার করে জ্বীন কথা বলে, মানুষের হাত দিয়ে জ্বীন ধরে, মানুষের পা দিয়ে জ্বীন হাঁটে, মানুষের চোখ দিয়ে জ্বীন দেখে ও মানুষের কান দিয়ে জ্বীন শোনে। সে রকম আল্লাহ দয়া করে তার বান্দার সাথে মিশে বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের করে নেয়। জ্বীন গ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তির পার্থক্য হলো জ্বীনের আছর

হয় জবরদস্তির মাধ্যমে। আর আল্লাহর সাথে ফানা হওয়া যায় প্রেমের মাধ্যমে। এ স্তরে বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় বা পাকা হয় যে, গলা কাটলেও ঈমান দূর করা যায় না।”

–আল্লাহ কোন পথে? ঃ ১৬৬

উক্ত পুস্তকের ৮৭-৮৮ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে ঃ

“এখন প্রশ্ন– আল্লাহ্ এক অথচ তিনি কিভাবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আছেন? একটি উদাহরণের সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একই উৎস থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিভিন্ন আকারের এবং রং-এর বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিচিত্র প্রকার ও বর্ণের আলো দিচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন বাল্বের কারণে বিদ্যুতের বহিঃপ্রকাশ পৃথক মনে হলেও এসবের উৎস একটাই। অনুরূপভাবে এক আল্লাহ্র সূক্ষ্মশক্তি বিভিন্ন দেহের মধ্যে অবস্থিত ক্বালবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল। এ সবের ফলে আল্লাহ্র একত্ববাদ মোটেও ক্ষুণ্ন হয় না। যা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তির বুঝার বিষয়।

এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার যেমন রূপ ও গুণের কোন শেষ নেই, তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী মানুষেরও এই রূপ ও গুণের বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য।

হাদীস শরীফের বর্ণনামতে–এ পৃথিবীতে যত মানুষ আগমণ করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে, হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশের দুই পার্শ্বে তাদের অবস্থান ছিল। তাহলে বুঝা যায় যে, সকল মানুষই এক দিন আদম (আঃ)-এর ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান ছিল। তখন তাঁর সূরতে অর্থাৎ-আদম হিসেবেই সকলে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষের ভিতরে আত্মা নামক আল্লাহর যে সত্তা বিরাজ করছে, তা একদিন আল্লাহর নূর হিসেবে জাতের (আল্লাহর) সাথে বিলীন অবস্থায় ছিল। সুতরাং যদিও কোটি কোটি মানুষের মাধ্যমে তাঁর বহিঃপ্রকাশ, তথাপি তাঁর একক সত্তা কখনো বিঘ্নিত হয় না।

পিতার শুক্রকীট থেকে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করে, ওরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ

করে। অর্থাৎ একই পিতার ঔরশজাত একাধিক সন্তান চেহারা ও প্রকৃতিতে একে অপরের ভিন্ন। এভাবে প্রত্যেকটি শুক্রকীটের ভিতরে যে মানবসত্তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তা পরস্পর স্বতন্ত্র হয়ে বিকশিত হয়। একজন মানুষের জীবদ্দশায় তাঁর যতগুলি শুক্রকীট জন্মে, অনুকূল পরিবেশে যদি এদের সবক'টি পূর্ণাঙ্গ মানবরূপ লাভে সক্ষম হতো, তবে এ ধরাপৃষ্ঠে তাদের বহুকোটি রূপ একই মানুষের ঔরশজাত হিসেবেই প্রকাশ পেতো। এরা প্রত্যেকেই একে অপরের চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও বৈশিষ্টের অধিকারী হতো। ঔরসে অসংখ্য সন্তান জন্ম নেয়ার পরেও পিতার আপন বৈশিষ্টের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয় না। **অনুরূপভাবে তাঁর মূল সত্তাকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে মহান আল্লাহ্ অসংখ্য মানুষের ক্বালবে অবস্থান করতে পারেন।**" –আল্লাহ কোন পথে ঃ ৮৭-৮৮

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, দেওয়ানবাগী সাহেবের মতে সকল মাখলূক আল্লাহ তা'আলা থেকে বেরিয়েছে এবং তাঁর সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একথা কার না জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বদান করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে কেউ হয়নি, তাঁর সত্তা থেকে কারো জন্ম হয়নি। তিনি এসব থেকে পবিত্র। এগুলো মাখলূক তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং মাখলূকেরই ধারাবাহিকতা সূত্রের মাধ্যমে প্রবাহমান।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কুরআন কারীমের ঘোষণা ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর থেকে কেউ হয়নি এবং তিনি কারো থেকে হননি এবং কেউ তার সমতুল্য নেই।" –সূরা ইখলাসঃ ১-৪

তাঁর থেকে কেউ হয়নি এবং তিনি কারো থেকে হননি এটা যেমন কুরআন হাদীসের ভাষ্য তেমনি আকলের বিধান তাই।

দেওয়ানবাগী সাহেবের স্পর্ধা দেখুন! তিনি সমগ্র জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে স্পষ্ট ভাষায় কিভাবে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্য মানুষের প্রজননের সাথে তুলনা করলেন!! যে সৃষ্টি আর জন্মের মধ্যে ব্যবধান করতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য নিরূপন করতে অক্ষম, তার মধ্যে কিসের ইসলাম! তার তো সামান্যতম আকলও নেই।

দেওয়ানবাগী সাহেবের উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথাও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে বহু অংশ বা উপাদানে গঠিত মনে করেন। এ জন্যেই তিনি বলেন–আল্লাহ্র মাঝে সমস্ত মাখলূক মিশে ছিল। যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে তাঁর সমস্ত বংশধর মিশে ছিল। অতঃপর এক এক করে আল্লাহ তা'আলা থেকে পৃথক হয় এবং প্রত্যেকের অন্তরে তাঁর একেকটা টুকরা বিদ্যমান আছে!!

আমি আগেও লেখেছি যে, এরা মূল্যবান ঈমানটুকুর সাথে সাথে আকল জ্ঞানও খেয়ে ফেলেছে। তাঁদেরকে কে বুঝাবে যে, অংশ বা উৎপাদান সৃষ্টির হয়ে থাকে, সৃষ্টিকর্তার উপাদান বা অংশ হওয়া সম্ভব নয়। আকল ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণে সৃষ্টিকর্তা কোনক্রমেই উপাদানযোগ্য হতে পারে না। কে না জানে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা উপাদানে গঠিত হন, তাহলে তার গঠনকারী কে হবে ? যাকে গঠন করতে হয় সে তো মাখলূক তথা সৃষ্টি, সে সৃষ্টিকর্তা হবে কিভাবে ?

আর এ কুফরী তো আরো ভয়ানক যে, রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর মধ্যে নিরাকার হয়ে যায় অথবা আল্লাহ মানুষের মধ্যে জিনের ন্যায় কিংবা দুধ ও পানির ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। নাঊযুবিল্লাহ।

এটি এরূপ এক আকীদা যা শুধু দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিকোণেই নয়, বরং সুষ্ঠু বিবেকের কাছেও বাতিল ও অসম্ভব। এরূপ আকীদাপোষণকারী উম্মতের ইজমা মতে কাফের। ইমাম কাযী ইয়ায (রহঃ ইন্তেকাল ৫৪৪ হিঃ) বলেন ঃ

أجمع المسلمون على كفر أصحاب الحلول ومن ادعى حلول الباري سبحانه في أحد الأشخاص، كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة .

"সকল মুসলমানের ইজমা যে, যারা হুলূল তথা আল্লাহ বান্দার মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলে তারা কাফের। যেমন কতক সূফী, বাতেনী, নাসারা ও কারমাতীদের বক্তব্য।"–আশশিফা বিমারেফাতে হুকূকিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শাইখ কুতবুদ্দীন সূফী (রহঃ ইন্তেকাল ৫১৯ হিঃ) লেখেন ঃ

الدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين محال ، فإن رجلين مثلا لا يصير أحدهما عين الآخر لتباينهما في ذاتيهما كما هو معلوم، فالتباين بين العبد والرب

سبحانه وتعالى أعظم ، فإذن أصل الاتحاد باطل محال مردود. شرعا وعقلا وعرفا بإجماع الأنبياء والأولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين.

وليس هذا مذهب الصوفية، وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالى، فتشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: اتحد ناسوته بلاهوته» من معيار المريدين كما في الحاوى للفتاوى ٢: ٣١٠

"আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার একাকার হয়ে যাওয়ার অসারতার প্রমাণ হল যে, দু'জন মানুষের একাকার হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কেননা, উদাহরণ স্বরূপ দু'জন পুরুষ তাদের সত্তাগত ভিন্নতার কারণে একজন হুবহু অন্যজন হতে পারে না, যা সকলেরই জানা। আর একজন বান্দা ও রবের মাঝে ভিন্নতা (একজন সৃষ্টি আরেকজন স্রষ্টা) অনেক বেশী। মোটকথা নবী, রাসূল, আলেম উলামা, সূফী-দরবেশ এবং সর্বস্তরের মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, উরফ, আকল ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে ইত্তেহাদ তথা একাকার হয়ে যাওয়ার মূল কথাই বাতিল, অসম্ভব ও প্রত্যাখ্যাত।

ইত্তেহাদের এ মাযহাব সূফীদের নয়, বরং একদল চরমপন্থী ইলমের দৈন্যতার কারণে এরূপ কথা বলেছে। যার ফলে তারা ঐসব নাসরানীর সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে, যারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলে, তাঁর মানুষত্ব প্রভুত্বের সাথে একাকার হয়ে গেছে।" –মি'য়ারুল মুরীদীন–আল হাভী লিলফাতাভীঃ ২/৩১০

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহঃ ইন্তেকাল ৪৫০ হিঃ) বলেন ঃ

القائل بالحلول أو الاتحاد ليس من المسلمين بالشريعة بل فى الظاهر والتسمية، ولا ينفع التنزيه مع القول بالاتحاد والحلول، فإن دعوى التنزيه مع ذلك إلحاد، وكيف يصح توحيد مع اعتقاد أنه سبحانه حل فى البشر؟..........

وهنالك إن حل كله فقد انحصر في القالب البشري وصار ذا نهاية وبداية، أو بعضه فقد انقسم وتبعض، وكل هذه الأمور أباطيل وتضاليل .

" যারা হুলূল ও ইত্তেহাদের কথা বলে তারা শুধু নামের মুসলমান। মূলতঃ তারা শরীয়ত মানে না। আর উক্ত আকীদা (হুলূল) রেখে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করাও কোন কাজে আসবে না। কেননা, উপরোক্ত আকীদা রেখে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার দাবী করা সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে একাকার হয়ে গেছেন-এ আকীদার সাথে কিভাবে তাওহীদ সঠিক থাকে? তাছাড়া মানুষের শরীরে যদি তাঁর পুরো সত্তাই বিলীন হয়ে গেল (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে তো তিনি মানুষের সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন, শুরুও থাকল, শেষও থাকল (তাকে দেখাও গেল, স্পর্শও করা গেল) আর যদি তাঁর সত্তা মানুষের শরীরে আংশিক বিলীন হয়ে গেল (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে তিনি বিভিন্ন অংশে (কিছু মানুষের ভিতরে, কিছু মানুষের বাইরে) বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এ গুলো সবই বাতিল ও গোমরাহী।"– আল-হাভী লিল ফাতাভীঃ ২/ ৩০৪

এই সব বাতিল, গোমরাহী ও কুফরীকে দেওয়ানবাগী সাহেব দ্বীন ও ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রসার করছেন।

দেওয়ানবাগী সাহেব রিয়াযতের পর মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার হুলূলের উপমা দিয়েছেন চিনি ও দুধের দ্বারা। অথচ চিনি গলে শেষ হলেই কেবল দুধের সাথে মিশে থাকে। তাহলে তাঁর মতে আল্লাহ্ তা'আলা এমন যা নিঃশেষ হতে পারে। লয় হতে পারে। চিন্তা করার বিষয়, এর চাইতে বড় কাফের দুনিয়াতে আর কে হবে?

যদি কেউ কোন মানুষের ব্যাপারে এই আকীদা রাখে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে একাকার হয়ে গেছে, তাহলে তার সরল ও স্পষ্ট উদ্দেশ্য এই হয় যে, সে হয়তো ঐ মানুষটিকে আল্লাহ সাব্যস্ত করছে অথবা আল্লাহ্কে মানুষ সাব্যস্ত করছে। স্রষ্টাকে সৃষ্টি অথবা সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলছে।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের এই আকীদা ছিল এবং এখনও আছে যে, যে সত্তা খোদা ছিলেন তিনি খোদা সুলভ গুণাবলী পরিহার না করেই মানুষ (মাসীহ) বনে গেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের অস্তিত্বের ন্যায় অস্তিত্বের রূপ গ্রহণ করেন যা সময় ও স্থানের পরিধিতে বেষ্টিত এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে বর্তমান ছিলেন।[১]

খ্রীষ্টানদের উক্ত হুলূলের আকীদাই কুরআন মাজীদ কুফরী সাব্যস্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানদের উপর এ দাবী আরোপ করেছে যে, তারা ঈসা (আঃ)কে খোদা বলে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

১. *Studies in christian Doctrinc p. 28-* ঈসায়্যাত কিয়া হ্যায়? ঃ পৃষ্ঠা ৫৭

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে মাসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল যদি আল্লাহ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি, যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সব কিছুর উপর আল্লাহ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।”– সূরা মায়েদা ঃ ১৭

যাহোক সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি প্রত্যেকের সত্তা বজায় রেখে পরস্পরে বিলীন হওয়া কুরআন-হাদীস ও যুক্তি সর্বদিক থেকেই অসম্ভব। এ আকীদা রাখা, সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি বলা কিংবা সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তা বলা-সবগুলো একই অর্থবোধক। দেওয়ানবাগী সাহেব এসব সুস্পষ্ট ও নিকৃষ্টতম কুফরীকে তাঁর 'মুহাম্মদী ইসলাম' নামে প্রচার করছেন।

তাঁদের কথার স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করুন। একদিকে বলেছেন যে, রিয়াযত মুজাহাদা করে এক নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার মধ্যে হুলূল করেন। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে পৃথক ছিলেন। আবার তাঁরা একথাও বলেন যে, প্রত্যেক মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার আরশ, তার অবস্থানের ঠিকানা। সুতরাং, যদি আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মুমিনের অন্তরে থেকে থাকেন, তাহলে রিয়াযতের পর হুলুল করার কি অর্থ হতে পারে ?

নিজেদের পক্ষ থেকেই এই কুফরী আবিষ্কার করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। অতঃপর নিজেরাই আবার প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং নিজেরাই তার উত্তর দেন। তাঁরা বলেন ঃ

> “এখন প্রশ্ন–আল্লাহ এক অথচ তিনি কিভাবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আছেন ? একটি উদাহরণের সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একই উৎস থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুত বিভিন্ন আকারের এবং রং-এর বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিচিত্র

> প্রকার ও বর্ণের আলো দিচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন বাল্বের কারণে বিদ্যুতের বহিঃপ্রকাশ পৃথক হলেও এসবের উৎস একটাই। অনুরূপভাবে এক আল্লাহ্‌র সূক্ষ্মশক্তি বিভিন্ন দেহের মধ্যে অবস্থিত ক্বালবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। এসবের ফলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ মোটেও ক্ষুণ্ন হয় না, যা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তির বুঝার বিষয়।" – আল্লাহ কোন পথে? ঃ ৮৭

অথচ প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই জানে যে, বিদ্যুত এমন কোন জিনিস নয়, যার ব্যাপারে 'এক' ও 'একক' শব্দ ব্যবহার করা যায়। বরং তা একটি প্রবাহমান জিনিস, যার মাঝে আধিক্য বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বাল্বের মধ্যে বিদ্যুতের ক্রিয়া নয় কিংবা তার গুণ নয় বরং সরাসরি বিদ্যুত বা তার অংশ প্রবাহমান। আল্লাহ তা'আলাকে তার সাথে তুলনা করা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করা এবং বহু উপাদানে সংগঠিত বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদসত্ত্বেও তাঁদের দাবী যে, 'এসবের ফলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ মোটেও ক্ষুণ্ন হয় না। যা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তির বুঝার বিষয়।'

শত আফসোস! এ ধরণের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর। হুলূল ও ইত্তেহাদের ন্যায় নিকৃষ্টতম কুফরীকে ঢাকার জন্যে তাঁদের বহু কুফরী করতে হয়েছে। যেমনঃ বহু আয়াত এবং একাধিক হাদীসের অর্থগত বিকৃতি সাধন করেছেন। উপমাস্বরূপ শুধু একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা হল ঃ

কুরআন হাকীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وفي الأرض آيت للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ·

"এবং বিশ্বাসীদের জন্যে জমিনে বহু নিদর্শন রয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা দেখছ না।"

আয়াতের উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট যে, ভূমিতেও আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য, অগণিত নিদর্শন রয়েছে এবং খোদ মানুষের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বেশুমার আলামত ও নিদর্শন রয়েছে–যেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করা [illegible] জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য।

[illegible] ও প্রেক্ষিত থেকে এ [illegible]ও ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। এ [illegible] গ্রন্থগুলোতে সন্নিবেশিত আছে। সকল মুফাসসিরীনে কেরাম উক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যই বাতিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা উক্ত আয়াতের তরজমা লেখেন ঃ

"আমি তোমাদের দিলে (ক্বালবের ৭ম স্তর নফসীর মাকামে) অবস্থান করি,

হওয়ার ফলে তাঁর হাত আল্লাহর হাত হয়ে যায়। তাঁর মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায়, যা দ্বারা আল্লাহর বাণী প্রকাশ লাভ করে। আল্লাহ্ এরূপ বন্ধু তথা অলী আল্লাহ্র চোখ আল্লাহর চোখ হয়ে যায়, তাঁর কান আল্লাহর কানে পরিণত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জ্বীন মানুষের উপর ভর করে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। তখন মানুষের মুখ ব্যবহার করে জ্বীন কথা বলে, মানুষের হাত নিয়ে জ্বীন ধরে, মানুষের পা দিয়ে জ্বীন হাঁটে, মানুষের চোখ নিয়ে জ্বীন দেখে ও মানুষের কান দিয়ে জ্বীন শোনে। সে রকম আল্লাহ্ দয়া করে তাঁর বান্দার সাথে মিশে বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের করে নেন।" –(আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ২৫-২৬

এটা হাদীসের ব্যাখ্যা নয়, বরং হাদীস বিকৃত করা ।

হাদীসে বলা হয়েছে......... كنت سمعه الذي يسمع به وبصره যার শাব্দিক তরজমা হল ঃ "আমি তার কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, দেখে, ধরে ও চলে.......। আর আরবীর নিয়মনীতি এবং হাদীস ব্যাখ্যার নিয়মনীতি ও ধারা মোতাবেক তার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য হল ঃ "তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক সকল কাজ-কর্ম প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার বিধান ও সন্তুষ্টির বিপরীত সে কিছুই করে না। সব কিছু তাঁর বিধানের আওতায় থেকে পালন করে থাকে।"

কিন্তু দেওয়ানবাগী সাহেব তার ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সাধক আল্লাহর সাথে বন্ধু হয়ে মিশে গিয়ে তার হাত, পা, কান ও চোখ সবকিছু আল্লাহর হাত, পা, কান ও চোখ হয়ে যায়, যা দ্বারা আল্লাহ ধরে, হাঁটে, শোনে ও দেখে। তার দ্বারা আল্লাহর বাণী প্রকাশ পায়... ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হাদীসের ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কি?

যাহোক, কুফরী প্রমাণ করতে হলে আকল বা উপলব্ধি শক্তি হারাতে হয়, কুরআন-হাদীসে বিকৃতি সাধন করতে হয়, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে হয়। তখন এসব জঘণ্য কাজ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। এসব অপরাধমূলক কাজ ছাড়া কুফরীর প্রমাণ ও প্রচার-প্রসার ঘটানোই সম্ভব নয়।

মোটকথা, তাঁদের কুফরীর তালিকা সুদীর্ঘ। প্রত্যেকটি কুফরীর ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করতে গেলে আরো লম্বা হয়ে যাবে। বিষয়টি উপলব্ধির জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। অবশ্য তাঁদের মৌলিক কুফরী হল শরীয়তের পরিভাষাসমূহের স্বরূপ পাল্টিয়ে দেওয়া, বিকৃতি সাধন করা, যা আমরা পিছনে ২৪৮–২৫২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। এসম্পর্কে আরও সামান্য ব্যাখ্যা করতঃ দেওয়ানবাগী সাহেবের আলোচনার ইতি টানব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের আকীদা ও পরিভাষাসমূহের বিকৃতি সাধন

এ কাজ তাঁরা 'আল্লাহ কোন পথে?' নামক পুস্তকেই বেশী করেছেন। এ গ্রন্থে কিয়ামত, হাশর, মীযান, পুনরুত্থান, আরশ-কুরসী ও জাহান্নামের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ আকীদা ও দ্বীনী পরিভাষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী, আদম ও হাওয়া, নবী-রাসূল ও ফেরেশতা ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে আলোচিত প্রতিটি আকীদা, পরিভাষা ও বিষয়ের শুরুতে আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিপরীতে প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন নতুন কথার অবতারণা করা হয়েছে, যা সূফী সাধকদের রিয়াযত, মুজাহাদা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বলে দাবী করা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তাঁরা প্রতিটি আকীদা ও পরিভাষা সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করেছেন, যা তাঁদের মতে সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও ভুল। অতঃপর সূফী সাধকদের বরাতে আসল কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেটিই (তাঁদের মতে) কুরআন-হাদীসের মূল ও আসল উদ্দেশ্য।

অথচ তাঁরা যাকে প্রচলিত ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন সেটাই কুরআন-হাদীসের ভাষ্য এবং তার উপরেই মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস। আর তাঁরা নিজেরাও তাকে কুরআন-হাদীসের বরাতেই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা যাকে কুরআন-হাদীসের আসল উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন, সেটি মূলতঃ কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা।

এ সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকগণ প্রথমে ভূমিকায় তাঁদের কথাগুলো দেখবেন। তারপর উপমাস্বরূপ দু'একটি আলোচনা দেখলেই তাঁদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতার বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে ফুটে উঠবে।

'আল্লাহ কোন পথে?' –এর ভূমিকার ১৪২ ও ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় আছে ঃ

> "বর্তমান গ্রন্থটি কিছু প্রশ্ন-উত্তরের সমষ্টি। প্রশ্নসমূহ এবং উত্তর ধর্মানুরাগী এবং জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহী মানুষকে তাঁর মহান সৃষ্টি এবং উভয়ের সম্পর্কের উপর সঠিক জ্ঞান দেয়ার সরল প্রচেষ্টা। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং উপস্থাপনার উৎকর্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পদ্ধতি হিসেবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলতঃ আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অথবা কোরআন, হাদীসের অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা তথা অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন থেকে বিরত। এ অসম্পূর্ণতা দূর

করার উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদীসের সংশ্লিষ্ট আরো বিভিন্ন উক্তির সমাবেশ করা হয়েছে। তার উপর আল্লাহ প্রেমিক সাধকগণের নিকট কোরআন ও হাদীসের যে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, সেই আলোকে বিষয়সমূহ সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে স্পষ্টতঃই দেখা যাবে যে, প্রকৃত অর্থ প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্ন। এহিসেবে এখন যে ধারণা প্রকাশ করা হলো- তাকে বলা যাবে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা কি কোরআন ও হাদীসের অর্থের বাহিরে? না তা মোটেই নয়। বরং এটাই সত্য যে, কোরআন ও হাদীসের রহস্যময় (বাতেন) ব্যাখ্যা আমরা সাধারণ তাফসীরকারদের কাছ থেকে পাইনি অথবা যা পেয়েছি তা আংশিক, সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত এবং স্থুল ব্যাখ্যার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

উক্ত পুস্তকের ১৪৪ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে ঃ

"আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশংকা করতে পারি যে, প্রচলিত ধারণার বিরোধী বর্তমান গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাতে কারো কারো মনে অস্বস্তি বোধ হতে পারে। এটা একটা স্বাভাবিক সমস্যা বলে বিবেচিত হবে। কারণ যে ধারণা সাধারণ মানুষের মনে গাঁথা আছে তার উপর ভিন্ন ধরণের চিন্তা আরোপ করলে নতুনটা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে জটিলতা আসা অবশ্যই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও মানুষের ভুল ধারণার অবসান হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা আমাদের সকল শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরেই অবিলম্বে নেয়া দরকার, নতুবা মানুষ অন্ধকারেই থাকবে। মোজাদ্দেদগণ আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমেই মানুষকে পথ দেখিয়ে থাকেন অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য।" –আল্লাহ্ কোন পথে? ঃ ১৪৪

উদ্ধৃতি দু'টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় ঃ

১. [illegible] আকীদা ও পরিভাষা সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, [illegible]দের বক্তব্য অনুযায়ী আভিধানিক অর্থে সীমাবদ্ধ এবং শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ পর্যন্তই সীমিত।

২. প্রতিটি আকীদা ও পরিভাষা সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে যে ধারণা প্রচলিত, তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী তা ভুল।

৩. প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করার পর সূফী সাধকদের মুজাহাদালব্ধ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাঁদের কথা অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের আসল অর্থ এবং প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী।

৪. তাদের ভাষ্যানুযায়ী এ অর্থ সাধারণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে না থাকা মা'মূলী ব্যাপার। কেননা, মুফাসসিরীনে কেরাম তো শব্দ ও বাহ্যিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ। আর ঐ অর্থ কলবের ইল্‌ম থেকে উৎসারিত, যা থেকে সাধারণ তাফসীরকারগণ বঞ্চিত।

৫. তাঁদের কথামত এই অর্থ মুসলমানদের নিকট আশ্চার্যজনক মনে হবে এবং হওয়া উচিতও বটে।

গ্রন্থ সম্পর্কে এই পাঁচটি বিষয় তাঁরা নিজেরাই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। এতে জানা গেল যে, দ্বীন ইসলামের সেসব আকীদা ও পরিভাষার যে অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যে অর্থ বুঝে আসছে, এরা তার বিপরীতে ভিন্ন অর্থ মুসলমানদেরকে বুঝাতে চাচ্ছে। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা এবং এরই নাম কপটতা। স্পষ্টভাবে সরাসরি শরীয়ত অস্বীকারের চাইতে এটা আরো ভয়াবহ।

যাহোক তাঁদের বিকৃত অর্থকে কুরআনের রহস্য নাম প্রদানের দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শতসিদ্ধ ভাবে চলে আশা অর্থ এবং সর্বজন বিদিত ব্যাখ্যা, যার উপর পুরো উম্মত, উলামা মাশায়েখ এবং প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান ছিল এবং এখনও আছে–একে প্রচলিত ধারণা আখ্যা দেওয়ার কারণে মুসলমানদের ধোঁকা খাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ মুসলমানদের জানা আছে যে, এই প্রচলিত ধারণা যার প্রচলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এবং যার প্রচলন উম্মতের এমন ধারক বাহকদের মাঝে রয়েছে যাঁদের মাধ্যমে আমরা কুরআন হাদীস ও সমগ্র দ্বীন লাভ করেছি এবং যে প্রচলিত ধারণার ভিত্তিই হল সরাসরি কুরআন হাদীস–এধরণের প্রচলিত ধারণাই ঈমান। এগুলোর কোনটি অস্বীকার করা বা তাতে কোন প্রকার তা'বীল তথা অপব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা।

উল্লেখ্য, [illegible]ের এধরনের মৌলিক ধারণাকে পরিভাষায় 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলা হয়। এগুলোকে প্রচলি[illegible] বৈ [illegible]

আর পরিভাষায় প্রচ[illegible] ধারণা বলতে [illegible]ম-রে[illegible]য় যা [illegible] [illegible]ওয়ামের মাঝে প্রচলিত, যার ভিত্তি কুরআন হাদীসের [illegible] নয়, বরং কুস[illegible] বিদআতের উপর এবং উম্মতের ধারক-বাহকগণ যুগে যুগে যার খণ্ডন [illegible] আসছেন।

বলাবাহুল্য, এ প্রকার প্রচলিত ধারণা তাঁদের বইয়ের আলোচ্য বিষয় নয়, বরং তাঁদের আলোচনা হল প্রথম প্রকার সম্পর্কে। কাজেই, প্রথম প্রকার ধারণা, যার উপর ঈমানের ভিত্তি, তাকে প্রচলিত ধারণা বলার কারণে মুসলমানগণ ধোঁকা খাবেন না। আর এগুলোর বিপরীত ব্যাখ্যাসমূহ যা মূলতঃ বিকৃত ও কুফরী ধ্যান ধারণা, সেগুলোকে কুরআন হাদীসের ভেদ ও রহস্য বলার কারণেও মুসলমানগণ প্রতারিত হবেন না। কেননা, কুরআন মাজীদের ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের চাইতে অধিক আর কেউ জানে না। কাজেই কুরআন মাজীদের ভেদ ও রহস্য নামে যে ব্যক্তিই কোন কিছু পেশ করবে তাকে সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষার সামনে উপস্থাপন করা হবে। যদি তার পরিপন্থী প্রমাণিত হয় তাহলে সেগুলো রহস্য নয়, বরং উদ্ভট, ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে, যার উপর কুফীর, ইল্‌হাদ, বিদআত ও গোমরাহীর হুকুম বর্তাবে।

এই ভূমিকার পর এখন কতিপয় আকীদা ও পরিভাষা সম্পর্কে তাঁদের মতবাদের বিশ্লেষণ করছি। এতে আশা করি তাঁদের বিকৃতি সাধনের বাস্তব চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে।

* মুসলমানদের বিশ্বাস হল যে, মৃত্যুর পর কবরে দু'জন ফেরেশতা আসবে, যাদেরকে মুনকার ও নাকীর বলা হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবে যে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নিকট যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে?

সহীহ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত এই আকীদা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান।উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে ঃ

(সুনানে আবূ দাউদ ঃ ২/৬৫৪, হাদীস ঃ ৪৭৩৮, মুসনাদে আহমদ ঃ ৫/৩৬৪, হাদীস ১৮০৬৩ ; জামে তিরমিযী ১/২০৫, হাদীস ঃ ১০৭১ ; সহীহ বুখারী ঃ ১/১৮৩-১৮৪, হাদীস ১৩৭৪; সহীহ মুসলিম ঃ ২/৩৮৬, হাদীস ২৮৭১)

হাদীস শরীফের স্পষ্টভাষ্য এবং সকল মুসলমানের আকীদার বিপরীত এখন দেওয়ানবাগী সাহেবের কথা শুনুন ঃ

* 'আল্লাহ কোন পথে?' পৃষ্ঠা-৬৯ এ তারা লেখেন ঃ

> "মুনকার-নকীর বলতে কি বুঝায়? তারা কিভাবে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে থাকেন?
>
> 'মুনকার' আরবী শব্দ, যার অর্থ-অপরিচিত, আশ্চর্যজনক। আরবী 'নকীর' শব্দের অর্থ-বুদ্ধিমান (??)

প্রচলিত ধারণা মতে-মুনকার নকীর বলতে মৃত ব্যক্তির নিকট আগত ২জন ফেরেশতাকে বুঝায়, যারা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে থাকেন।

"হাদীসের বর্ণনানুসারে আরো জানা যায় যে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে ৩টি প্রশ্ন করা হবে-"তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এবং তোমার নবী কে?" অর্থাৎ-জীবদ্দশায় মানুষ কার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, কোন মতাদর্শে চরিত্র গঠন করেছিল এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য তাঁর প্রেরিত কোন্ মহামানবকে অনুসরণ করেছিল? কবরে এই বিষয়গুলো মৃত ব্যক্তির মুক্তি লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।"

"পবিত্র কোরআন ও হাদীসে ফেরেশতা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার বাস্তবতা খুঁজতে গিয়ে আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণ ব্যক্তি জীবনে এর যে মিল খুঁজে পান, তাহলো ঃ **মুনকার ও নকীর বলতে-কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ কর্ম বিবরণীকে বুঝায়।** মৃত্যুর পর যখন মানুষের আত্মার সামনে তার সারা জীবনের কর্ম বিবরণী প্রকাশ করা হয় তখন সেই বিবরণী তার কাছে আশ্চর্যজনক ও অপরিচিত বলে মনে হয়। অথচ এই বিবরণী অত্যন্ত যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ-কোন *ব্যক্তি, যখন যে কাজ করেছে* এর মধ্যে যতটুকু ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যে ঃ তার আত্মা দেহ ত্যাগ করার পর পূর্ব জীবনের কাজের পরিচয় ঠিক সেভাবেই পেয়ে থাকবে।"

"মুনকার-নকীর ফেরেশতা কর্তৃক ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করার বিষয়টি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্য'মান সুপ্ত আল্লাহর সত্তা উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী তাকে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত করে থাকে।" -আল্লাহ কোন পথে? ঃ ৬৯

এখানে আপনি দেখেছেন যে, তাঁরা হাদীস শরীফের ভাষ্য এবং মুসলমানদের ইজমাঈ আকীদাকে প্রচলিত ধারনা বলেছেন আর তাঁদের ঐ পুস্তকেরই ভূমিকার ভাষ্যমতে প্রচলিত ধারনার শিরোনামে তাঁরা যা কিছু উল্লেখ করবেন তা হবে ভুল ও বাহ্যিক। তার বিপরীতে সূফী সাধকদের বরাতে তাঁরা যা কিছু লিখেছেন, তাতে আপনি দেখেছেন যে, মুনকার-নকীর এবং কবরের প্রশ্নাবলীকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। আর এ অস্বীকারকে আড়াল করার জন্যে তার নাম দিয়েছেন ব্যাখ্যা, ক্বলবের ইল্‌ম এবং রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।

* 'আল্লাহ কোন পথে?' ঃ ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় লেখেন ঃ

"ইস্রাফিলের সিঙ্গার রহস্য কি? উহা কখন ফুঁক দেয়া হবে? 'ইস্রাফিল' বলতে প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজনকে বুঝায়।

প্রচলিত অর্থে–হস্তে সিঙ্গা ধারণকারী ফেরেশতাকে ইস্রাফিল বলা হয়। তাঁর সিঙ্গা ফুঁৎকারের সাথে সাথে দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ·

"সেদিন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, ফলে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, তবে তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরা জুমার, ৬ আয়াত।

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে সিঙ্গায় প্রথম ফুঁৎকারে কিয়ামতের প্রলয় সংঘটিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারে হাশরের মাঠে বিচার মোকাবেলার জন্য মানুষের পুনরুত্থান বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনামতে–হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে–একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাষণ দানকালে এই তথ্য প্রকাশ করলেন যে, সমস্ত মানুষ হাশর ময়দানে একত্রিত হবে, এ অবস্থায় যে, সকলেই খালি পা, বস্ত্রবিহীন, খাতনাবিহীন হবে। (বোখারী শরীফ)

অর্থাৎ– হাশরের মাঠে পুনরুত্থান পৃথিবীতে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনার অনুরূপ। পবিত্র কুরআনেও ইহার ইঙ্গিত রয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরো যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা হলো সূরা আনআম-৭৩ আয়াত; সূরা কাহাফ-৯৯ আয়াত; সূরা তোয়াহা-১০২ আয়াত; সূরা মু'মিন-১০১ আয়াত; সূরা নামল-৮৭ আয়াত; সূরা ইয়াসিন- ৫১

"ইস্রাফিলের সিঙ্গার রহস্য কি? উহা কখন ফুঁক দেয়া হবে? 'ইস্রাফিল' বলতে প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজনকে বুঝায়।

প্রচলিত অর্থে–হস্তে সিঙ্গা ধারণকারী ফেরেশতাকে ইস্রাফিল বলা হয়। তাঁর সিঙ্গা ফুঁৎকারের সাথে সাথে দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

"সেদিন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, ফলে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে, তবে তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরা জুমার, ৬ আয়াত।

পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে সিঙ্গায় প্রথম ফুঁৎকারে কিয়ামতের প্রলয় সংঘটিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারে হাশরের মাঠে বিচার মোকাবেলার জন্য মানুষের পুনরুত্থান বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনামতে–হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে–একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাষণ দানকালে এই তথ্য প্রকাশ করলেন যে, সমস্ত মানুষ হাশর ময়দানে একত্রিত হবে, এ অবস্থায় যে, সকলেই খালি পা, বস্ত্রবিহীন, খাতনাবিহীন হবে। (বোখারী শরীফ)

অর্থাৎ– হাশরের মাঠে পুনরুত্থান পৃথিবীতে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনার অনুরূপ। পবিত্র কুরআনেও ইহার ইঙ্গিত রয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরো যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে তা হলো সূরা আনআম-৭৩ আয়াত; সূরা কাহাফ-৯৯ আয়াত; সূরা তোয়াহা-১০২ আয়াত; সূরা মু'মিন-১০১ আয়াত; সূরা নামল-৮৭ আয়াত; সূরা ইয়াসিন- ৫১

আয়াত; সূরা জুমার- ৬৮ আয়াত; সূরা ক্বাফ-২০ আয়াত; সূরা হাক্কাহ -১৩ আয়াত; সূরা নাবা-১৮ আয়াত।

"এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহ্প্রাপ্ত সূফী সাধকগণ মানব জীবনেও এর অপূর্ব মিল খুঁজে পান। তাঁদের মতে- **মানুষের নিঃশ্বাস সংরক্ষণকারী সত্তাকে ইস্রাফিল বলা হয়েছে। আর মানুষের মৃত্যুর সময়ের সর্বশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাকে সিঙ্গায় ফুঁ বলা হয়েছে।** কেননা মানুষের শেষ নিঃশ্বাস নাসিকা থেকে ত্যাগ করার ফলে দেহের যাবতীয় কর্ম থেমে যায় এবং তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যেহেতু দেহের জন্য নাসিকা সিঙ্গাতুল্য, সেহেতু ইহার শেষ নিঃশ্বাসকে সিঙ্গার ফুঁ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে দেহের প্রলয় শুরু হয়। **অর্থাৎ-দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস সংরক্ষনের কাজ যে সূক্ষ্ম শক্তি বা ফেরেশতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাকে ইস্রাফিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।**"

"**প্রথম-সিঙ্গার ফুঁতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে দেহের প্রলয় অর্থাৎ-মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় সিঙ্গার ফুঁ বলতে সদ্যজাত শিশুর প্রথম নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নবজীবন শুরু হওয়াকে বুঝায়।** যেহেতু সদ্যজাত শিশু উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়ে আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিলিত হয়, এই মিলনকেই সূফী সাধকগণ সিঙ্গার ২য় ফুঁৎকারে হাশরের মাঠে উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হওয়াকে এক প্রকার হাশর বলে মনে করেন।"

-আল্লাহ কোন পথে ঃ ১০৯-১১০

প্রচলিত ধারণার শিরোনামে এখানেও ইস্রাফিল (আঃ) এবং সিঙ্গায় ফুঁৎকার সম্পর্কে ঐ কথাগুলোই লিখেছেন, যা মুসলমানদের ইজমাঈ আকীদা এবং কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য।

কুরআন- হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীতে তিনি ইস্রাফিল (আঃ)-এর আকীদা এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকারের আকীদার ব্যাখ্যাদান করেছেন, শুধু তাই নয়, বরং তার বিকৃতিসাধন করে তদস্থলে পরজন্মা কুফরী আকীদাকে ঈমানের আকীদা হিসেবে পেশ করেছেন।

অতঃপর এই বিকৃতি ও অস্বীকৃতিকে ঢাকার জন্যে একথা লিখেছেন যে, "এটাও এক প্রকারের হাশর।" যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, "আমরা প্রচলিত ধারণা এবং কুরআন হাদীসের বর্ণনাকে অস্বীকার করছি না, বরং তা স্বীকার করার পাশাপাশি উপদেশ ও উপমাস্বরূপ বলছি যে, ..."

স্মরণ রাখবেন এটা সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী ও দাজ্জালী। কেননা, তিনি যদি কুরআন হাদীসের বর্ণনা এবং মুসলমানদের ইজমাঈ আকীদা মানতেন তাহলে তাকে প্রচলিত ধারণা বলতেন না এবং পুস্তকের ভূমিকায় প্রচলিত ধারণার নিন্দা করতেন না। তাকে ভুল সাব্যস্ত করতে না। সুতরাং, এটা কুরআন মাজীদের বিকৃতি ও অস্বীকৃতিকে গোপন করার জন্যে চক্কর ও চালবাযী ছাড়া আর কিছুই নয়!

* 'আল্লাহ কোন পথে?' বইটিতেই 'হাশর কি ? উহাতে কিভাবে বিচার অনুষ্ঠিত হবে ?' শিরোনামে লিখেছেন ঃ

"হাশর' আরবী শব্দ, যার অর্থ একত্রিতকরণ। প্রচলিত অর্থে হাশর বলতে সমস্ত আত্মাকে শেষ বিচারের দিনে একত্রিত করাকে বুঝায়।" –আল্লাহ কোন পথে? ঃ ৫২

অথচ কুরআন-হাদীসের আলোকে মুসলমানদের ইজমাঈ আকীদা (যাকে তারা প্রচলিত ধারণা আখ্যা দিয়ে থাকেন) হল যে, রূহ ও শরীর উভয়ের হাশর হবে। দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর পুনরুত্থান হবে। ফলে শরীরসহ রূহ নিয়ে প্রত্যেকের হাশর হবে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ.

"তার কি সে সময় সম্পর্কে জানা নেই, যখন জীবিত করা হবে সমাধিস্থ মুর্দাদেরকে, আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন।" –সূরা আদিয়াত ঃ ৯-১১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. "তারা বলবে, আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে কবর থেকে উত্থিত করল ? (ফেরেশতারা বলবেন) করুণাময় আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৫২

অন্যত্র এই হাশর সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ، إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ

وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

"সেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়ায শুনতে পাবে, সে দিনই পুনরুত্থান দিবস। আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। যেদিন ভূমন্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে (কবর থেকে) বের হয়ে আসবে। এটা এমন হাশর যা আমার জন্যে অতি সহজ।" – সূরা ক্বাফ ঃ ৪২-৪৫

পুনরুত্থান সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.

"যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রীতিকর বস্তুর দিকে ডাকবে, তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সাদৃশ।"

–সূরা ক্বামার ঃ ৬-৭

সশরীরে পুনরুত্থান সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بين النفختين أربعون» قالوا : يا أبا هريرة ، أربعون يوما؟ قال : أبيت، قالوا: أربعون شهرا؟ قال : أبيت قالوا : أربعون سنة؟ قال : أبيت « ثم ينزل الله من السماء ، فينبتون كما ينبت البقل» قال :« وليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গার দুই ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে।" শ্রোতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ মানে চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর ? তিনি বললেন, আমি তা নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। (কেননা আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কিছু শুনিনি।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, এতে উদ্ভিদের ন্যায় মানুষ (কবর থেকে) গজাতে থাকবে।' তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'মানুষের একটি হাড় ব্যতীত সবকিছু মাটি হয়ে যাবে। সে হাড়টি হল মেরুদণ্ডের শেষাংশ, কিয়ামতের দিন তা থেকেই পুনরায় মানুষ বানানো হবে।" –সহীহ মুসলিম ঃ ২/৪০৬-৪০৭, হাদীস ২৯৫৫, সহীহ বুখারী ঃ ২/৭৩৫, হাদীস ৪৯৩৫

শরীরসহ রূহের হাশর সম্পর্কে অন্য হাদীসে আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ....فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূর্য (কিয়ামতের দিন) মানুষের অতি নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, এমনকি সূর্য তাদের মাত্র এক মাইল দূরত্বে থাকবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'মানুষ আমল মোতাবেক (হাশরের মাঠে) ঘামের মধ্যে অবস্থান করবে। কেউ হাটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত, কেউ মুখ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে থাকবে।" –সহীহ মুসলিম

যাহোক, শরীরসহ রূহের হাশর হওয়ার বিষয়টি অকাট্য ও সর্বজন বিদিত। কিন্তু দেওয়ানবাগীরা এ সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা ঘোষণা করেছেন যে, শরীর নয় বরং শুধু রূহের হাশর হবে।

তাঁরা এই মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং হাশর সম্পর্কিত বহু আয়াত ও হাদীস (যা মুসলমানদের ইজমাঈ আকীদার মূল ভিত্তি) উল্লেখ করার পর লেখেন ঃ

> "হাশর সম্পর্কে অন্যান্য হাদীস থেকেও জানা যায় যে, মানুষ হাশরের মাঠে নগ্নভাবে উপস্থিত হবে। কিন্তু তারা এমন অবস্থাপ্রাপ্ত হবে যে, এ নগ্নতা তাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে না। অর্থাৎ-এই নগ্নতা সদ্যজাত শিশুর জন্য প্রযোজ্য।[১]

---

১. বিবরটি এমন নয়। হাদীস শরীফে আছে ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله ! الرجال و النساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, "কিয়ামত দিবসে মানুষের হাশর হবে খালি পা, বিবস্ত্র ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আমি বললাম, নারী পুরুষ একত্রিত হলে একজন আরেকজনের প্রতি তাকাবে না? তিনি ইরশাদ করেন, পরস্পরে তাকানোর চাইতে (কিয়ামতের ভয়াবহতার) বিষয়টি আরো সুকঠিন হবে।" -সহীহ বুখারী ও মুসলিম - মিশকাত ঃ ৩/১৫৩৪, হাদীস ৫৫৩৬– লেখক

কারণ, শিশুর নগ্নতা তাকে লজ্জিত করে না এবং অন্যদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ ঘটায় না। তাছাড়া যেহেতু সদ্যজাত শিশু খাতনাবিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়ে থাকে, সুতরাং হাশরের ময়দানে মানুষ খাতনাবিহীন হবে বলতে সূফী সাধকগণ সদ্যজাত শিশুকেই বুঝিয়েছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, সূফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘঠিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে পরিণতি হিসাবে মানুষের আত্মিক উন্নতি বা অবনতি লাভ হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে উক্ত আত্মা উন্নতমানের বাহন বা নিম্নমানের বাহনে আরোহন করে হাশরে একত্রিত হয়। আল্লাহ্ প্রাপ্ত সাধকগণ হাশর সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি তাঁদের সাধনা লব্ধ জ্ঞান থেকে মানব জীবনেও এর একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মিল খুঁজে পান। তাদের মতে-আপনজনদের সাথে মানুষের পুনরায় একত্রিত হওয়াকে 'হাশর' বলে। অর্থাৎ 'হাশর' বলতে নির্দিষ্ট সময় শেষে আপন কর্মের বিনিময়ে প্রিয়জনদের সাথে পরকালে একত্রিত হওয়াকে বুঝায়।

মানুষের জন্যে এই পৃথিবীর জীবন-যাপনই হাশরতুল্য। খালি পা, বস্ত্রবিহীন ইত্যাদি অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া বলতে মাতৃগর্ভ হতে সদ্য ভূমিষ্ট হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। শিশু সন্তান মায়ের উদরে একাই থাকে। ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মাতা-পিতা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয়ের সঙ্গে একত্রিত হয়ে থাকে বিধায় উহাও এক প্রকার 'হাশর'।" —আল্লাহ কোন পথে ? ঃ ৫৪-৫৫

এখানেও তাঁরা হাশরের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন হিন্দুদের সেই 'পরজন্মা' আকীদার মাধ্যমে। এই আকীদা অতি নিকৃষ্ট একটি কুফরী। ইসলামী আকীদা হাশরের ব্যাখ্যা তাঁরা 'পরজন্মা' কুফরী আকীদার মাধ্যমে করেছেন এবং এখানেও সে কুফরীকে আড়াল করার জন্যে এক, 'প্রকার' এবং 'ইহাও' শব্দ বাড়িয়েছেন। যেন পাঠকদের বিশ্বাস করাতে চান যে, তাঁরা হাশরের মূলতত্ত্বও স্বীকার করেন। অথচ তাঁরা প্রথমতঃ হাশরের মূলতত্ত্ব নিয়ে এখানে মোটেও আলোচনা করেননি। প্রচলিত ধারণার নামে যে লিখেছেন ঃ শুধু রূহের হাশর হবে, তা সুস্পষ্ট কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট লিখেছেন যে, তাঁদের নিকট আসল কথা সেটিই যা সূফী সাধকদের উদ্ধৃতিতে লেখা হবে।

কাজেই যদি হাশর সম্পর্কে তাঁদের নিকট আসল মত সেটিই হয়ে থাকে যা সূফী সাধকদের বরাতে লেখেছেন, তাহলে কুরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হাশরের মূলতত্ত্ব, যার উপর মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস, তার উপর তাঁদের বিশ্বাস কিভাবে থাকবে ?

মোটকথা, তাঁরা এই ধোঁকাবাযীর পথ অবলম্বন করে এক এক করে আমল নামা, কিরামান কাতেবীন, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান, জিবরাঈল, লওহে মাহফূয, আরশ-কুরসী ও ওহী ইত্যাদি দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াবলীর মূলতত্ত্বের বিকৃতি সাধন করেছেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, কোন মূলতত্ত্বে বিকৃতি ঘটানো সে বিষয়টি অস্বীকারেরই নামান্তর।

যাহোক আমি আগেও লিখেছি যে, দেওয়ানবাগীদের চিন্তাধারা যা তাঁদের দু'গ্রন্থ "আল্লাহ কোন পথে? 'এবং' সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার'-এ সংকলিত হয়েছে, শুধু এগুলোর কুফরী, মিথ্যা ও উদ্ভট চিন্তাধারার তালিকাও অনেক দীর্ঘ। আমি শুধু তাঁদের কুফরীসমূহের মৌলিক দিকগুলো চিহ্নিত করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বিভ্রান্তি থেকে উম্মতকে নিরাপদ রাখুন। উম্মতকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন, যাতে অন্ততঃ এধরণের স্পষ্ট কুফরীর দাঈর দাওয়াতে ধোঁকা না খায়।

দেওয়ানবাগী সাহেব সম্পর্কে শেষ কথা হলঃ তিনি আগেকার যুগের দাজ্জালদের ন্যায় কুফরী, ধর্মহীনতা ও উদ্ভট চিন্তাধারার প্রচার-প্রসারের জন্যে তাসাওউফকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে তিনি ইসলামের অন্যান্য মূলতত্ত্বের ন্যায় তাসাওউফেরও বিকৃতিসাধন ঘটিয়েছেন।

শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনই ইসলামে তাসাওউফ নামে খ্যাত। কিন্তু তিনি যোগীদের ন্যায় কিছু রিয়াযত ও সাধনাকেই তাসাওউফের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন। ইসলামী তাসাওউফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীণ সংশোধন। আর দেওয়ানবাগী তাসাওউফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তাঁর আবিষ্কৃত কুফরী অর্থে কলব জারী করা এবং হুলূল তথা বান্দা আল্লাহ তা'আলার মাঝে একাকার হয়ে যাওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া। তাঁর সমস্ত গবেষণা ও সাধনার পুঁজি এসব কুফরী বিষয়বস্তু, যা তিনি তাসাওউফের নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান হেফাযত করুন। আমীন !!

هذا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

সমাপ্ত

১–আল–কুরআনুল কারীম ١–القرآن الكريم

তাফসীর ও উলূমে কুরআন التفسير وعلوم القرآن

২–তাফসীরে ইবনে কাসীর ٢–تفسير ابن كثير
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪হিঃ), দারুল খায়ের, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ–১৪১২ হিঃ, ১৯৯১ইং

৩–রুহুল মাআনী ٣–روح المعاني
মাহমূদ আলূসী (১২৭০হিঃ), এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

৪–মাআরেফুল কুরআন ٤–معارف القرآن
মুফতী শফী (১৩৯৬হিঃ), ইদারাতুল মাআরিফ, করাচী, পাকিস্তান, নতুন সংস্করণ–১৪১৬হিঃ, ১৯৯৬ইং

৫–কুরআন আপ ছে কিয়া কাহতা হে? ٥–قرآن آپ سے کیا کہتا ہے ؟
মনযূর নোমানী (১৪১৮হিঃ), আল ফুরকান বুক ডিপু, নাযিরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৭ তম সংস্করণ–১৯৯৭ইং

৬–উলূমুল কুরআন ٦–علوم القرآن
তকী উসমানী, দারুল উলূম করাচী, ৯ম সংস্করণ–মে ১৯৯২ইং, ১৪১২হিঃ

হাদীস, শরূহ ও উলূমে হাদীস الحديث وشروحه وعلومه

৭–সহীহ বুখারী ٧–صحيح البخاري
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল্ বুখারী (২৫৬হিঃ) মুখতার এণ্ড কোম্পানী, প্রকাশকাল–১৯৮৫ইং (হাদীস নং সহীহ বুখারীর ঐ কপি থেকে গৃহীত যা ফাতহুল বারীর সঙ্গে ছেপেছে)

৮–সহীহ মুসলিম ٨–صحيح مسلم
ইমাম মুসলিম (২৬১হিঃ), মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ইউ, পি, ইণ্ডিয়া, প্রকাশকাল–১৯৮৬ইং (হাদীস নং সহীহ মুসলিমের ঐ কপি থেকে নেওয়া হয়েছে যা ইকমালুল মু'লিম–র সাথে ছেপেছে। (কাযী ইয়ায (৫৪৪হিঃ), দারুল ওয়াফা, আল–মানসূরা, মিশর, ১ম সংস্করণ–১৪১৯হিঃ,১৯৯৮ইং)

৯–সুনানে আবু দাউদ
ইমাম আবূ দাউদ (২৭৫হিঃ) ঃ (ক) দারুল ইশাআত ইসলামিয়া, কোলকাতা, ভারত (খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররমা (ঘ) আওনুল মা'বূদসহ

٩–سنن أبي داود

১০–সুনানে নাসায়ী
ইমাম নাসায়ী (৩০৭হিঃ) ঃ (ক) আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত, প্রকাশকাল–১৩৫০হিঃ (খ) আল–মাতবূআতুল ইসলামিয়া, হালব, দারুল বাশায়ের আল্ ইসলামিয়া, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ–১৪১৪হিঃ, ১৯৯৪ইং

١٠–سنن النسائي

১১–জামে তিরমিযী
ইমাম তিরমিযী (২৭৯হিঃ) ঃ (ক) ইয়াসির–নাদীম এণ্ড কোম্পানী, ভারত, (খ) দারুল বায, মক্কা মুকাররামা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

١١–جامع الترمذي

১২–সুনানে ইবনে মাজা
ইমাম ইবনে মাজা (২৭৫হিঃ) ঃ (ক) আশরাফিয়া বুক ডিপু ইউ, পি, ভারত (খ) দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৩৯৫হিঃ, ১৯৭৫ইং

١٢–سنن ابن ماجه

১৩–মুয়াত্তা মালেক
ইমাম মালেক (১৭৯হিঃ) ঃ (ক) মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারত (খ) দারুল কিতাবিল আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ–১৯৯৮ইং, ১৪১৮হিঃ

١٣–الموطأ لمالك

১৪–মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক
ইমাম আব্দুর রাযযাক (২১১হিঃ), আল্ মাজলিসুল ইলমী, করাচী, ইদারাতুল কুরআন করাচী, পাকিস্তান, ২য় সংস্করণ–১৯৯৬ইং, ১৪১৬হিঃ

١٤–مصنف عبد الرزاق

১৫–সুনানে নাসায়ী, কুবরা
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১ম সংস্করণ–১৪১১হিঃ, ১৯৯১ইং

١٥–سنن النسائي الكبرى

১৬–আত্ তামহীদ
ইবনে আব্দিল বার (৪৬৩হিঃ), দারুল কুতাইবা, বৈরুত, দারুল ওয়াযী, কায়রো, ১ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ, ১৯৯৩ইং

١٦–التمهيد شرح الموطأ

১৭–তুহফাতুল আশরাফ
ইমাম মিযযী (৭৪২হিঃ), আদ্দারুল কায়্যিমা, বোম্বাই, আল্ মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত, ২য় সংস্করণ–১৪০৩হিঃ, ১৯৮৩ইং

١٧–تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

৩০–মাআরেফুল হাদীস — ٣٠–معارف الحديث
মনযূর নোমানী (১৪১৮হিঃ) দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান

৩১–আওনুল মা'বূদ — ٣١–عون المعبود شرح سنن أبي داود
শামসুল হক আযিমাবাদী (১৩২৯হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত

৩২–কানযুল উম্মাল — ٣٢–كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
আলী মুত্তাকী আল হিন্দী (৯৭৫হিঃ), মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০৯হিঃ, ১৯৮৯ইং

৩৩–মুকাদ্দমায়ে হিসনে হাসীন — ٣٣–مقدمه حصن حصين بترتيب جديد
মাওলানা ইদরীস মিরাঠী (১৪০৯হিঃ), করাচী

৩৪–তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম — ٣٤–تكملة فتح الملهم شرح صحيح مسلم
তকী উসমানী, দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

৩৫–আল্ আজভিবাতুল ফাযেলা — ٣٥–الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة
(আত্ তালীকাতুল হাফেলাসহ) — مع التعليقات الحافلة
ইমাম লাক্ষ্ণৌভী (১৩০৪হিঃ), মাকতাবাতু মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, ৩য় সংস্করণ-১৪১৪হিঃ, ১৯৯৪ইং

৩৬–আস্সুন্নাতুন নববিয়া — ٣٦–السنة النبوية ومدلولها الشرعي
আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (১৪১৭হিঃ), মাকতাবাতুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হলব, ১ম সংস্করণ-১৩১২হিঃ, ১৯৯২ইং

৩৭–মিরকাতুল মাফাতীহ — ٣٧–مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) কুতুবখানা ইশাআতে ইসলামী, দিল্লী

৩৮–আদ্দিআমা — ٣٨–الدعامة في أحاديث وآثار فضل العمامة
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, (পাণ্ডুলিপি)

৩৯–আল্ মাকাসিদুল হাসানা — ٣٩–المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
ইমাম সাখাভী (৯০২হিঃ) দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ৩য় সংস্করণ-১৪১৭হিঃ

৪০–ফায়যুল বারী — ٤٠–فيض الباري شرح صحيح البخاري
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২হিঃ), রব্বানী বুক ডিপু দিল্লী, ১৯৯২ইং

৪১–আত্ তা'লীকুল মুগনী — ٤١–التعليق المغني على سنن الدارقطني
শামসুল হক আযীমাবাদী (১৩২৯হিঃ), দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান

৪২–তাখরীজে ইহইয়া — ٤٢–تخريج إحياء علوم الدين
যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হিঃ), -(ইহইয়া উলূমিদ্দীনের সাথে)

ফিক্‌হ ,ফাতাওয়া ও উসূলে ফিক্‌হ الفقه والفتاوى وأصول الفقه

৪৩–মাবসূত ٤٣–المبسوط
শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (৪৮২হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ–১৪১৪হিঃ, ১৯৯৩ইং

৪৪–ফাতাওয়া শামী ٤٤–رد المحتار (الفتاوى الشامية)
ইবনে আবেদীন (১২৫২হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, (বোলাক মুদ্রণের ফটো)

৪৫–ফাতাওয়া আলমগীরী ٤٥–الفتاوى الهندية
দারু ইহইয়াইত তুরাস, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ

৪৬–আল্ মোওয়াফাকাত ٤٦–الموافقات في أصول الشريعة
আবূ ইসহাক শাতেবী (৭৯০হিঃ), দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ–১৪১৭হিঃ, ১৯৯৭ইং

৪৭–আল্ বাহরুর রায়িক ٤٧–البحر الرائق
যাইন ইবনে নুজাইম (৯৭০হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী

৪৮–আল্ হাভী লিল ফাতাভী ٤٨–الحاوي للفتاوي
ইমাম সুয়ূতী (৯১১হিঃ), দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

৪৯–মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ٤٩–مجموع فتاوى ابن تيمية
ইমাম ইবনে তাইমিয়া, (৭২৮হিঃ), বাদশা ফাহাদ প্রকাশনা কমপ্লেক্স, মদীনা, সউদী আরব, ১৪১৬হিঃ, ১৯৯৫ইং

৫০–রিসালাতুল হালাল ওয়াল হারাম ٥٠–رسالة الحلال والحرام
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ), দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৭হিঃ, ১৯৯৭ইং

৫১–ইমদাদুল ফাতাওয়া ٥١–إمداد الفتاوى
হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ), মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী

৫২–নফউল মুফতী ওয়াস সায়েল ٥٢–نفع المفتي والسائل
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ, কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

৫৩–ইসলাম আওর মূসীকী ٥٣–اسلام اور موسيقي
মুফতী মুহম্মাদ শফী (১৩৯৬হিঃ), মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী

৫৪–ফাতাওয়া রহীমিয়া — ٥٤–فتاوى رحيميه
আব্দুর রহীম লাজপুরী, ইদারায়ে দাওয়াতে ইসলামকরাচী, পাকিস্তান

তাসাওউফ — التصوف

৫৫–রিসালাতুল মুসতারশিদীন — ٥٥–رسالة المسترشدين
হারেস মুহাছেবী (২৪৩হিঃ), দারুল বাশাইর আল্ ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন, অষ্টম সংস্করণ–১৪১৬হিঃ, ১৯৯৫ইং

৫৬–ইহয়াউ উলূমিদ্দীন — ٥٦–إحياء علوم الدين
আবূ হামেদ গাযযালী (৫০৫হিঃ), মাকতাবাতুল ঈমান, মনসূরা, মিশর, প্রথম সংস্করণ–১৪১৭হিঃ, ১৯৯৬ইং

৫৭–আওয়ারিফুল মাআরিফ — ٥٧–عوارف المعارف
সোহরাওয়ারদী (৬৩২হিঃ), ইহয়াউ উলূমিদ্দীন–এর সাথে সংযোজিত, দারু ইহয়াইত তুরাস, বৈরুত

৫৮–ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন — ٥٨–إتحاف السادة المتقين
মুরতাযা যাবীদী (১২০৫হিঃ), দারুল ফিকর (কায়রো, ১৩১১হিঃ সংস্করণের ফটো)

৫৯–ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী — ٥٩–ارشادات مجدد الف ثاني
ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান, ১৪১৭হিঃ, ১৯৯৬ইং

৬০–আল্ কাওলুল জামীল — ٦٠–القول الجميل
শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (১৩৭৬হিঃ), মঞ্জুর বুক ডিপু, দিল্লী, ভারত

৬১–কুল্লিয়্যাতে ইমদাদিয়া — ٦١–كليات امداديه
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (১৩১৮হিঃ), মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ ভারত

৬২–আলী ইবনু আবী তালেব ইমামুল আরেফীন — ٦٢–علي بن أبي طالب إمام العارفين
আহমাদ ইবনে সিদ্দীক আল্ গুমারী (১৩৮০হিঃ)

৬৩–বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত — ٦٣–بصائر حكيم الامت
ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী (১৪০৭হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান, ১৪০৯হিঃ, ১৯৮৯ইং

৬৪–আত্ তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ — ٦٤–التكشف عن مهمات التصوف
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ), ইদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

৬৫–তরবিয়াতুস সালেক
থানভী, দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান, ১ম সংস্করণ
٦٥–تربية السالك

৬৬–কামালাতে আশরাফিয়া
সংকলন ঃ ঈসা সাহেব, ইদারাতে তালিফাতে আশরাফিয়া, থানা ভবন, ভারত, ১৪১২হিঃ
٦٦–كمالات اشرفيه

৬৭–আকাবির কা সুলূক
ইকবাল হুশিয়ারপুরী, করাচী, পাকিস্তান
٦٧–اکابر کا سلوك

৬৮–ইসলাহী নেসাব
মাজমূআয়ে রাসায়েলে থানভী, দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান
٦٨–اصلاحي نصاب (مجموعة طائفة من رسائل حكيم الأمة التهانوي)

৬৯–তাসহীলু কাস্‌দিস সাবীল
মুফতী শফী (রহঃ), দারুল ইশাআত, করাচী
٦٩–تسهيل قصد السبيل

৭০–তালীমুদ্দীন
থানভী, দারুল ইশাআত, করাচী, ১ম সংস্করণ
٧٠–تعليم الدين

৭১–আদাবুল মুআশারাত
থানভী, দারুল ইশাআত, করাচী, ১ম সংস্করণ
٧١–آداب معاشرات

৭২–মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত
থানভী, মাকতাবায়ে দানিশ, দেওবন্দ, ভারত, ১৪১০হিঃ, ১৯৯০ইং
٧٢–ملفوظات حكيم الامت

৭৩–শরীয়ত ও তরীকত
থানভী, মাসঊদ পাবলিশিং হাউজ, দেওবন্দ, ভারত
٧٣–شريعت وطريقت

৭৪–মাআরেফে হাকীমুল উম্মত
ডাঃ আব্দুল হাই (১৪০৭হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান, জুমাদাল উলা–১৪০৭হিঃ
٧٤–معارف حكيم الامت

৭৫–শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম
শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২হিঃ), কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, সাহারানপুর, ভারত, ১ম সংস্করণ–১৩৯৮হিঃ, ১৯৭৮ইং
٧٥–شريعت وطريقت كا تلازم

৭৬–হাশিয়াতু রিসালাতিল মুসতারশিদীন
আব্দুল ফাত্তাহ (১৪১৭হিঃ) দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন
٧٦–حاشية رسالة المسترشدين

৭৭–বেলায়েতে মুতলাকা
সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (১৯৮২ইং), সপ্তম সংস্করণ–জানুয়ারী/১৯৯৮ইং
٧٧–ولايت مطلقه

১০০–ঈসাইয়্যিত কিয়া হায়?
মাওলানা তকী উসমানী, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী

۱۰۰-عيسائيت كيا هے ؟

বিবিধ

المتفرقات

১০১–আল্ ইতিসাম
ইমাম শাতেবী (৭৯০হিঃ) দারু ইবনে আফফান, সৌদি, প্রথম সংস্করণ–১৪১৮হিঃ, ১৯৯৭ইং

۱۰۱-الاعتصام للشاطبي

১০২–আত্ তাফহীমাতুল ইলাহিয়া
শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১৭৬হিঃ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমী, হায়দারাবাদ, সিন্দ

۱۰۲-التفهيمات الإلهية

১০৩–ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দী তাওযীহিল বয়ান
সারফরাজ খান সফদর, মাকতাবায়ে সাফদারিয়া, গুজরাঁওয়ালা, পাকিস্তান, ৩য় সংস্করণ–১৪১৩হিঃ, ১৯৯৩ইং

۱۰۳-إتمام البرهان في رد توضيح البيان

১০৪–ঈযাহুল হাক্কিস সারীহ
শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬হিঃ), কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান

۱۰٤-إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح

১০৫–মাকতূবাতে শাইখুল ইসলাম মাদানী (১৩৭৭হিঃ), দেওবন্দ, ভারত

۱۰۵-مكتوبات شيخ الإسلام مدني

১০৬–মুনাজাতে মকবূল
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ)

۱۰٦-مناجات مقبول

১০৭–সাআদাতুদ দারাইন
ইউসুফ নাবহানী (১৩৫০হিঃ), মিশর

۱۰۷-سعادت الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين

১০৮–পান্দেনামা খাকী
মুফতী ফয়যুল্লাহ (১৩৯৬হিঃ), ফয়েযিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

۱۰۸-پند نامه خاكي

১০৯–দস্তূরে হায়াত
সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (১৪২০হিঃ), মজলিসে তাহকিকাত ও নাশারিয়াতে ইসলাম, লাক্ষ্ণৌ, ভারত, ৩য় প্রকাশ–১৪১৬হিঃ, ১৯৯৫ইং

۱۰۹-دستور حيات

১১০–ইসলাম কিয়া হায়?
মনযূর নোমানী (১৪১৮হিঃ), আল্ ফুরকান বুক ডিপু, লাক্ষ্ণৌ, ভারত

۱۱۰-اسلام كيا هے ؟

১১১–দ্বীন ও শরীয়ত — ١١١–دين وشريعت
মনযূর নোমানী (১৪১৮হিঃ), আল্ ফুরকান বুক ডিপু, লাক্ষ্ণৌ, ভারত, প্রকাশ–১৯৯০ইং

১১২–আল্ বালাগ — ١١٢–البلاغ (عارفي نمبر)
(আরেফী সংখ্যা), দারুল উলূম করাচীর মুখপাত্র।

১১৩–আটরশি দরবার শরীফের কাফেলা — ١١٣–آٹه رسى دربار شريف بر قافله
(পত্রিকা)

–ঃসংযোজিত ঃ– التذييل

১১৪–তাফসীরে কুরতুবী — ١١٤–تفسير القرطبي
আবূ আব্দুল্লাহ আল্ কুরতুবী (৬৭১হিঃ), দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

১১৫–বয়ানুল কুরআন — ١١٥–بيان القرآن
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

১১৬–ফাতাওয়া আযীযিয়া — ١١٦–فتاوى عزيزية
শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (১২৩৯হিঃ), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকটি কিতাব